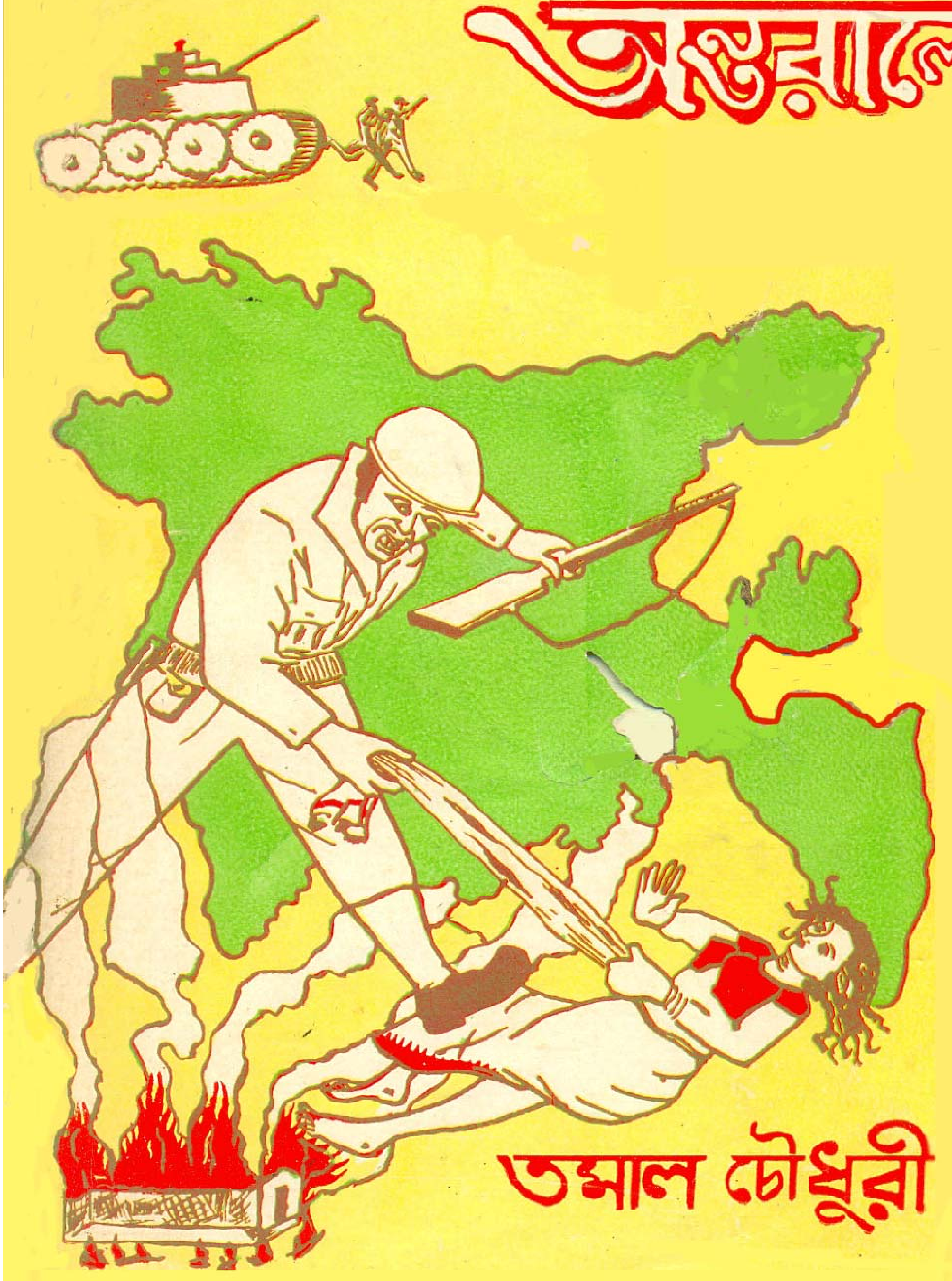
অন্তরালে



তমাল চৌধুরী

প্রকাশক:

শ্রী উৎপল চৌধুরী

৪২, সার্পেণ্টাইন লেন,

কলিকাতা -১৪

প্রচ্ছদ শিল্পী:

জহরলাল পাল

প্রচ্ছদ মুদ্রণে:
প্রোসেস সিণ্ডিকেট,
৫০, ভোলানাথ পাল লেন,
কলিকাতা - ৬

প্রথম সংস্করণ:
অগ্রহায়ণ – ১৩৭৯ সাল

পরিবেশক

কথা ও কাহিনী
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ৯

দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ৯

মুদ্রাকর:
প্রভাস দে
মহেন্দ্র প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং
২/১ শ্রীনাথ দাস লেন,
কলিকাতা - ১২

মূল্য: সাত টাকা মাত্র

এ পৃথিবী কত বিচিত্র। মানুষও কত বিচিত্র। তাই এখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে যুগ যুগ ধরে চলেছে হাসি আর কান্নার প্লাবন। ঐ যে কান্না, হৃদয় বিদারক কান্না – ওর কথা মানুষ কতটুকুই বা জানতে পারে? ১৯৭১'র মাঝামাঝি পূর্ব্ববঙ্গ হয়ে উঠেছিল যেন প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয়গিরি। দূর থেকে ঐ আগ্নেয়গিরিকে দেখা গেছে; দেখা যায় নাই ওর লাভাস্রোতের অন্তরালে একটি স্নেহময়ী মা তার সন্তানকে বুক দিয়ে ঢেকে বাঁচাতে চেয়েছিল, কিন্তু তা পারে নাই।

অন্তরালের নায়িকা লায়লা নিদারুণ প্রতিহিংসা আর প্রতিজ্ঞাকে সফল করতে গিয়ে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে টেনে ফেলে দিয়েছে সহজাত সংস্কার ও আবরণ। তেমনই বহু মুক্তি যোদ্ধাদের আত্মত্যাগও রয়ে গেছে লোকচক্ষুর আড়ালে।

মা-ভাই-বোনদের চোখের জল মানতে চায় না – গতি আর সঙ্গতির বাধা। তাই ঠিকেদারী জীবনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের স্বল্প অবকাশে আমার এই ক্যাম্প জীবনের প্রয়াস পাঠক মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। ভুল ত্রুটি মার্জনা করবেন।

– তমালকৃষ্ণ চৌধুরী

॥॥ উৎসর্গ ॥

মা ---

তোমার পায়ে এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করলাম।

--- তমাল

২৪।১১।১৯৭২

"মানুষের হীনচেতা,
তুমিই ক'রেছ হেথা,
তোমারই সৃজিত যত কাল-ফণীদল
আনন্দ নন্দনে আনে তীব্র হলাহল!
যত কিছু মহাপাপে কলঙ্কিত মানুষের মুখ –
সে তোমারই চুক!
ক্ষমা চাও মানুষের কাছে,
ক্ষমা করো দোষ তার যত কিছু আছে!"

এক

আগুণ জ্বলছে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশঃ আকাশ ছেয়ে ফেলছে। আগুনের শিখা লক্‌লকে জিব বার করে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় লোলুপ রাক্ষসের মত একধার থেকে সব গ্রাস করে চলেছে – জনপদের পর জনপদ। কিসের দাপাদাপি? নারকীয় পিশাচের। দোজখের অতি ঘৃণ্য কীট থেকে অতি জঘন্যতম কদাকার এক পশু জন্ম নিয়েছে – আর তারই নির্দ্দেশে তার সমগোত্রীয় অনুচরেরা মেতে উঠেছে এক বীভৎস পৈশাচিক ধ্বংসের মাতনে; স্নিগ্ধ শ্যামল গ্রাম নদী প্রান্তরের মনোহারিণী রূপ যেখানে বাঁশীর সুরের মত মধুর মূর্চ্ছনায় আপ্লুত।

এপ্রিল ১৯৭১ এর মাঝামাঝি। পূর্ব্ববঙ্গের ধলেশ্বরী ও মেঘনার সঙ্গমস্থল হতে অদূরে নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের কাছাকাছি মেঘনার অববাহিকায় একটি গণ্ডগ্রামের দুটি কচি প্রাণের এক রক্তাক্ত কাহিনী।

গ্রামটি যত নগণ্য এ কাহিনীও ততোধিক নগণ্য। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য জগতে মানবতার চূড়ান্ত অবমাননা এবং স্বাধিকারের প্রতি অবহেলা ও অত্যাচারের বিষয় না বললেও চলে না।

গোটা পূর্ব্ববঙ্গ জুড়ে পাকিস্থানী সৈন্যরা তাণ্ডব নৃত্য করে চলেছে। আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, ন্যায়-অন্যায়ের কোন বাছ-বিচার নাই। নির্ব্বিকারে হত্যা, লুণ্ঠন, নারী-ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ অবাধে চলছে। এক কথায় সর্বত্রই সন্ত্রাসের বিভীষিকা। মানুষ জানে না কখন যে তার কাঁচা প্রাণটা চলে যাবে, নয়ত বা সর্ব্বহারা হয়ে পথের ভিখারী হতে বাধ্য হবে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। পূব আকাশে এক ফালি চাঁদ নারকেল বাগানের ফাঁক দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে। ধরণী আবছা অন্ধকারের প্রলেপে যেন আড়িমুড়ি ছাড়ছে; সুপ্তোত্থিতা! দখিনা বাতাস কি যেন এক চাপা শোকের আর্ত্তনাদে মুরমুর শব্দে হিল্লোলিত হয়ে চলে গেল।

এত রাত্রে সহসা কবাটে মৃদু করাঘাত। লায়লার তখনও ঘুম আসে নাই, সারা রাত্রি বিছানায় ছটফট করছে, তখন সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে কি আসবার উপক্রম করছে। আতঙ্ক ও উত্তেজনার অবসাদে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে রয়েছে বালিশে মুখ গুঁজে। গত পরশু খবর এসেছিল তার সপ্তদশী বোন লুৎফাকে কলেজ হোষ্টেল থেকে পাকিস্থানী সৈন্যরা ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে ধরে নিয়ে গেছে – আরও অনেক ছাত্রীও তার সহগামিনী হয়েছে। এ সংবাদে তার বাবা ও মা পাগলের মত ছুটে গেছে ঢাকায়। তাঁরা আর ফেরেনি। শোক সন্তপ্ত অপমানিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে পাকিস্থানী সৈন্যরা ঐ দম্পতির বুকে অব্যর্থ নিশানায় দুটি গুলি খরচ করে।

লায়লা ও লুৎফা দুই বোন, বংশের দুই কন্যারত্ন, এক বৃন্তে দুটি অর্দ্ধোস্ফূট গোলাপ। লুৎফা আর ফিরবে কিনা কে জানে! যদিও ফেরে তার আর থাকবে কি? একটা শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না অভিজাত বংশীয়া নারীর পক্ষে দিনের পর দিন বলাৎকার সয়ে আবার ফিরে আসা এবং সমাজে মাথা উঁচু করে চলাটা অত সহজ হবে কি? লুৎফা তা পারবে?

লায়লা বালিশ হতে মাথা তুলে সভয়ে চিৎকার করে উঠল – কে?

আবার মৃদু করাঘাত।

লায়লার মুখ শুকিয়ে যেন আমচুর হয়ে গেল! ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলল-কে? এত রাত্রে দুয়োরে ধাক্কা দিচ্ছেন – কে আপনি? যেই হোন খুবই সাবধান কিন্তু!

আবার দুয়োরে করাঘাতের সঙ্গে ভেসে এল 'আমি বিপ্লব' –

বিপ্লব! এত রাত্রে তুমি কোথা থেকে এলে? কেনই বা এলে? তোমার কি জীবনের কোন মায়া মমতা নাই?

আছে! খুবই আছে! তুমি আগে দরজা খোল, তারপর সবই বলছি।

লায়লা আলুথালু বেশে দরজা খুলে শুখনো গলায় বলল, বিপ্লব তোমার কি হয়েছে বলতো? লুৎফার আর কোন খোঁজ খবর পেলে? তাকে উদ্ধার করবার আর কি কোন রাস্তাই নাই?

না।

দেখছি তুমিও কাপুরুষ হয়ে গেছ। আজ যেন গোটা বাংলাদেশটাই কাপুরুষতায় মলিন হয়ে গেছে। তোমার একটু লজ্জাও করল না? তুমি যাকে ভালবাস, তারই প্রাণের বোন আজ কি অবস্থায় রয়েছে – যা ভাবতেও গা রি রি করে।

তোমার কথা সবই সত্য লায়লা। কিন্তু আমরা কি করতে পারি বলতে পার? আমি অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টর কাছাকাছি গিয়েছিলাম। মুশ্লিম লীগের সভ্য বলে পরিচয় দিয়ে একজন সামরিক বড় অফিসারের পা ধরে চাকরি ভিক্ষাও করেছিলাম। ভণ্ডামী করতে কিছু বাকী রাখি নাই। তারপর ঐ খানেই – ঐ ছাত্রী হোষ্টেলের খবর পেলাম – এক অচেনা সুরূপা নয় – কুরূপা, অর্ধোন্নাদ, অর্দ্ধচেতন এক যুবতী ছাত্রীকে দেখে। চারজন পাঠান সৈন্য তাকে হাত পা ধরে বয়ে আনছিল। সেই মেয়েটি সম্পূর্ণ চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে হয়তো; বক্ষাবরণ নাই বললেও চলে, পরনের শাড়ীখানি কোনও রকমে কোমরে জড়ান – রক্তে ভেজা। আমি আর সেই অফিসারটি কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিলাম। সামনে আমাদের আসতে দেখে সৈন্যগুলো তার দেহটা পথের ধারে ফেলে দিয়ে পথের এক পাশে সরে গিয়ে তাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল। বুঝলাম বেশ হোমরা চোমরা অফিসারই বটে। সে তখন আমার কাছে দেশের ভেতরের গোপন খবরাখবর যোগাড়েই ব্যস্ত। এক নজরে ঐ ক্ষত বিক্ষত দেহটার দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল ঐ ঘরটায় নিয়ে গিয়ে রাখ। ঐ রকম আরও চার পাঁচটি লাশ আসতে দেখলাম, সকলেরই শরীরের সর্বত্র পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন। কেউ মৃত কেউ বা মুমূর্ষূ। সাহেব তাদের হুকুম দিল যারা মরে নাই তাদের গুলি করে হত্যা করে মৃতদেহগুলোকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে। আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। একটি ঘরে গিয়ে আমরা দু'জনে উঠলাম। মেজর সাহেব আমাকে বসতে দিয়ে চা বিস্কুট ইত্যাদি আনবার জন্যে আর্দ্দালিকে নির্দ্দেশ দিল। আমি তৃপ্তির হাসি মুখে টেনে এনে তা গলাধঃকরণ করছিলাম, এমন সময় পাশের ঘর থেকে গুলির আওয়াজ ও কাতর আর্ত্তনাদ ভেসে এল।

তারপর?

তারপর আমি কতকটা দিশেহারা হয়ে মেজর সাহেবকে কাতরভাবে অনুনয় করে বললাম স্যার; আমার বোন আর লুৎফাকেও হোষ্টেল থেকে আনা হয়েছে, দয়া করে ওদের ছেড়ে দেবার হুকুম দিন।

সাহেব তখন দেশের আভ্যন্তরীণ খবর এবং যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের আশায় আমাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে একজন বালুচ প্রহরীকে ডেকে নির্দ্দেশ দিল তাদের এজমালি হারেমে যে দু'জন মেয়েকে আমি দেখিয়ে দেব তাদের এখানে আনবার।

আমি সেই বালুচ সৈন্যের পিছনে পিছনে গিয়ে যা দেখলাম, তা তোমায় বর্ণনা করতে পারব না লায়লা। শুধু এইটুকু বলতে পারি অন্ততঃ তিনশো যুবতীকে কয়েদ করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘর থেকে মর্মন্তুদ আর্ত্তনাদ ভেসে আসছে, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! তোমাদের ঘরে কি মা বোন নাই – কুকুর! মরে গেলাম, কে আছ? বাঁচাও! বাঁচাও! –' আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না লায়লা, কানে আঙ্গুল দিয়ে বসে পড়লাম।

তারপর?

কিছুক্ষণ পরে যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে একে একে সবগুলো ঘরই খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলাম। আমার বোনের কোন সন্ধানই পেলাম না। একটা অন্ধকার মত ঘরে ঢুকে গিয়ে দেখলাম লুৎফা রক্তাপ্লুত সজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বুঝলাম বেশ কয়েকজন পশু তার উপর নির্মম অত্যাচার করেছে। তখন পাগলের মত ছুটে এসে সেই মেজরকে বললাম, স্যার, ঐ ঘরে আমার বোন রয়েছে, কিন্তু মৃত বলে মনে হচ্ছে। সাহেবের মুখে স্পষ্ট রসিকতার ভাব। বলল – সরি! যদি জানতাম ও আপনার বোন, তাহলে ওকে ছেড়ে দিতাম। আচ্ছা ঘাবড়াইয়ে মাৎ! ওর ট্রিট্‌মেন্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি

ব্যাকুলভাবে তার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বললাম – মেহের বাণী বহুৎ! ওকে ফেরৎ দিন, ওকে বাড়ী নিয়ে যাবার হুকুম দিন!

বিপ্লবের এ কথায় লায়লার মুখখানা নিমেষে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বল্‌ল – ইস্‌! তুমি এত বড় কাপুরুষ? তা তো আমি কোন দিন জানতে পারিনি।

ভুল করছ লায়লা। আধুনিক মারণাস্ত্রে-সুসজ্জিত, বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীর কাছে ধারকরা যাবতীয় সমরাস্ত্রের কাছে, তোমার আমার শক্তির কি দাম আছে? কিন্তু আমরা বাঙ্গালী! বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট বজায় রাখতেই হবে। গায়ের জোরে না পারি বুদ্ধির জোরে তা পারব। আর তারই জন্যে তো আমার এ ছলনা।

ছলনা?

হ্যাঁ – স্রেফ ছলনা।

সে কি রকম? তুমি কি করতে চাও? আমি ধৈর্য্য ধরতে পারছি না বিপ্লব। তুমি আমায় শিগ্‌গির সব খুলে বল। কেমন করে সেই পাষণ্ড দানবদের আমরা ধ্বংস করতে পারি।

তার জন্যেই তো তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসা।

বেশ বল, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি? বিপ্লব – আমি ছোটবেলা থেকে তোমায় ভালবাসি। আজও আমরা উত্তাল যৌবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজ ও সংস্কারের সমস্ত বেড়াজাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে উভয়ে উভয়কে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছি। আমার আব্বা, আম্মা শত চেষ্টা করেও আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে নাই। তোমার হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয় ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে-তা পূতঃ ও অনবদ্য। এখানে মন্দির আর মসজিদের আকর্ষণ ও তড়িতফাৎ কেঁদে মাথা কুটে ফিরে গেছে বিপ্লব। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তাই আশা করি তুমি আমায় মিথ্যা স্তোক বাক্য শোনাবে না। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন পাগল হয়ে যাব। এখন আমি কি করি – কোথায় যাই! এই বলে লায়লা ক্ষণেক ভেবে নিয়ে আবার বলল, তুমি যেন কি পরামর্শের কথা বলছিলে বিপ্লব?

বিপ্লবও যেন আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল – হ্যাঁ – লুৎফা মৃত। ওরা কোন মৃতদেহ কাউকেই ফেরৎ দেয় না।

ভালই হয়েছে। যা হয়ে গেছে – অতি চমৎকার। তুমি বলতে পার বিপ্লব, লুৎফা কি পারত না দু'একজন পাক বর্ব্বরের জান নিতে? লুৎফা কি পারত না একটা পাক পিশাচ অফিসারের সঙ্গে প্রণয়ের ভান করে তাকে মদ খাইয়ে তারই রিভলভারের গুলিতে তার বুকটা ঝাঁঝরা করে দিতে? ও পোড়ারমুখী অমন কাঁচা সোনার মত রং আর হুরীর মত রূপ যৌবন নিয়ে করল কি? শেষকালে কিনা কতকগুলো পিশাচের হাতে ধরা দিলে আর তার সব কিছু অবাধে লুট করে নিতে দিলে? কে সেই অফিসারটা – তার নাম কি? তাকে আমার চাইই-চাই। যে কোন মূল্যে সেই অফিসারটাকে আমার চাই-ই!

ভুল করছ লায়লা, লুৎফা যে বাধা দেয় নাই – একথা সত্যি নয়।

ভুল তুমি করছ বিপ্লব, লোলুপ হিংস্র বাঘের মুখে ছোট্ট ছাগ শিশু প্যাঁ প্যাঁ করলে কি রক্ষা পায়? – না বাঘ মমতাবশে তাকে ছেড়ে দেয়?

তা অবশ্য দেয় না –

ঠিক তেমনই। ঐ হিংস্র দানবরা নারীত্বের মর্য্যাদা, স্বাধিকারের মর্য্যাদা কি বুঝবে বলতো? ওরা কিছুই বোঝে না – বোঝার চেষ্টাও করে না! তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন 'টিট্‌ ফর ট্যাট্‌।' তুমি বলতে পারো অতগুলো মেয়ে কি পারত না, অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যে প্রণয়ের ভান করে নিজের দেহকে ঐ পশুদের খোরাকে পরিণত করে ওদের মায়া জালে

আবদ্ধ করে চোখে ধাঁধা লাগাতে? তারপর সুযোগমত ওদেরই অস্ত্রগুলোকে কাজে লাগাতে? যে ভাবে আজ ওরা আমাদের সাড়ে সাত কোটী বাঙ্গালীর উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে – তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে?

তোমার কথা ঠিক মেনে নিতে পারছি না লায়লা। পশ্চিম পাকিস্থানী পাঞ্জাবী, পাঠান, বালুচ সৈন্যরা অতর্কিতে ওদের হোষ্টেল আক্রমণ করে এবং সহর ও সহরতলীর অধিকাংশ জায়গা থেকে বেছে বেছে সুন্দরী ও যুবতী মেয়েগুলোকে মিলিটারী ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পে পুরে রাখে। তারপর ওদের ওপর একের পর এক পাশবিক অত্যাচার করতে থাকে বিনা বাক্য ব্যায়ে। সুতরাং ওরা সেভাবে সংগঠন করবার বা প্রণয়ের ভান করে প্রতিশোধ নেবার মত সময় ও সুযোগ পেল কোথায়? অত্যাচারী হিংস্র পশুদের সে ধৈর্য্য কোথায় যে তারা প্রেমের ফাঁদে পড়বে? তার আগেই তো মেয়েগুলোকে মেরে ফেলছে অথবা আধমরা করে ফেলছে।

ওরই মধ্যে সুযোগ করে নিতে হবে। এটা এ দুনিয়ার কোন আহাম্মক না জানে বলতো, যে পাক মিলিটারীরা যদি যুবতী মেয়ে আয়ত্বের মধ্যে পায় তবে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে না করবে? যাদের উপরতলার নির্দ্দেশই হ'ল ঐ রকম।

তুমি বলছ বটে, তবে আমার ধারণা ব্যাপারটা অত সহজ হত না। তবে হয়তো প্রতিশোধ কিছুটা নেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু ওদের মানসিক অবস্থার কথাও তো চিন্তা করতে হবে। কেননা ঐ রকম পরিস্থিতিতে অসহায় ভাবে ভেঙ্গে পড়াটাই স্বাভাবিক। মনের তেজ ও বুদ্ধি পঙ্গু ও অকেজো হয়ে পড়ে ঘটনার আকস্মিকতায়।

না-না-বিপ্লব, আমি তোমার কথা কোন মতেই মানতে চাই না। নিজে যখন মরলামই – তখন কেন আমি মরণকামড় দিয়ে মরব না?

তুমি ভুল করছ লায়লা, এক একটা বিরাট বপু পাঞ্জাবী, পাঠান বা বালুচ সৈন্যের কাছে আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা কতটুকু? ওরা একটা চাপ দিলে মেয়েগুলো গুঁড়িয়ে তালনাড়ু হয়ে যাবে – তা জান?

সব জানি – আমি সব জানি বিপ্লব। একদিনে না হোক, দুদিনে না হোক, দশদিনে তো হত? দশ দিনে একটা ষণ্ডকে বশ করে প্রতিশোধ নিতে পারত না?

না – পারত না।

কেন? কেন পারত না?

কি করে পারবে? পুরুষ কি একটা? তুমি একটু চিন্তা করে দেখ তো – প্রতিটি ক্যাম্প এবং ক্যান্টনমেণ্টে কত প্রচুর সংখ্যক সৈন্য রয়েছে – সে তুলনায় ওরা যে কটা মেয়ে ধরে নিয়ে গেল তা হয়তো প্রতি দশ পনের জনার ভাগে একটা করে মেয়ে পড়ল। তখন ঐ মেয়েটির ওসব ভাববার সময় এবং সুযোগ কোথায়? তখন তার উপর যে পাশবিক অত্যাচার, নির্য্যাতন ও বর্বরোচিত বলাৎকার একের পর এক চলতে লাগল – তাতে সে মৃত বা মুমূর্ষু না হওয়া পর্য্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। আমি নিজের চোখে যে বীভৎস অত্যাচারের চিহ্ন দেখেছি তাতে বুঝেছি দেহে একবিন্দু প্রাণ থাকতে ওরা কাউকে ছাড়ে না। এইবার বলতো যদি ওদের জায়গায় তুমি হতে – তবে তুমি কি করতে পারতে?

আমি? আমি হলে? কিছু পারি আর ছাই নাই পারি অন্ততঃ একজনার নাক আর কান দাঁত দিয়ে কেটে নিতাম। এই কথাগুলো বলে লায়লা ফুলতে লাগল এবং দাঁতে দাঁতে ঘষতে লাগল। প্রচণ্ড ক্রোধে ওর আরক্তিম সুষমামণ্ডিত মুখখানি নিমেষে এক ভয়ানক জিঘাংসায় নিষ্ঠুর হয়ে উঠল এবং থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে টলে পড়ে যাবার উপক্রম হতেই বিপ্লব ওকে ধরে ফেলল। বলল – লায়লা, তুমি অসুস্থ। অনর্থক একটা উৎকট চিন্তা করে বিপত্তি ঘটাবে। তুমি শোবে চল।

আমি অসুস্থ?

হ্যাঁ! তুমি অসুস্থ। তুমি আগে বিশ্রাম নাও, তারপর কথা হবে। এই বলে বিপ্লব তাকে বারান্দার একটা ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিল।

লায়লা ইশারায় বলল – একটু জল।

বিপ্লব তাড়াতাড়ি জল এনে লায়লাকে খাইয়ে দিল এবং বলল তুমি ঘরে শোবে চল।

বিপ্লব লায়লাকে ধরে নিয়ে তার বাবার বহুমূল্য পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে বারান্দার দিকে পা বাড়াতেই লায়লা তার হাতটা চেপে ধরল এবং বলল বিপ্লব, আর গিয়ে কোন লাভ নেই। গতকাল সন্ধ্যার সময় প্রায় পঞ্চাশ জন মিলিটারী এসে এ গ্রামের পশ্চিম পাড়াটা সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। আমাদের এ পাড়ায় ক'ঘর বেঁচে গেছে শুধু ঐ মাঝে খালটা থাকার জন্যে, আর খালের পাড়ে ঘন জঙ্গলের জন্যে। সম্ভবতঃ ওরা বুঝতে পারেনি যে এদিকে বসতি আছে। ও পাড়া থেকে আট দশটা মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে, যা কিছু পেয়েছে, সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। ডাক্তারকে তার বাড়ীতেই গুলি করে মেরেছে – তার মেয়ে মধুমিতাকে ধরে নিয়ে গেছে। এ পাড়ার প্রায় সবাই পালিয়ে গেছে, আমাদের বাড়ীর ঝি চাকররাও সব প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। আমি শুধু তোমারই পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

বিপ্লব যেন নিমেষে ষ্ট্যাচু হয়ে গেল। ধপাস করে পালঙ্কে বসে পড়ে লায়লাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বলল লায়লা, তাহলে তো সবই শেষ হয়ে গেল, আর তো কিছু বাকী নাই। এখন আমি কি করব তুমিই বল লায়লা।

লায়লা সস্নেহে বিপ্লবকে চেপে ধরে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল – বিপ্লব, তুমি স্থির হও, আমরা এখান থেকে যে ভাবেই হোক চলে যাব, আর যে ভাবেই হোক এর প্রতিশোধ নেবই-নেব। যদি মরি দু'জনাই মরব; আর যদি বাঁচি'তো দু'জনাতেই বাঁচব।

উদ্বেলিত অশ্রু দমন করে বিপ্লব উঠে বসল – লায়লাও। উভয়ে চোখের জল মুছে হাত ধরাধরি করে নিচে নেমে এল, যেন পরস্পর পরস্পরের একমাত্র অবলম্বন।

কোথায় কোন দূর হতে, হয়তো ধলেশ্বরী নদীর বুকে মুক্তি ফৌজ অথবা পাকিস্থানী সৈন্যের হাল্কা মেসিনগানের গোলার আওয়াজ ভেসে এল।

আকাশের ভাঙ্গা চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নার কয়েকটা টুকরো ঝির ঝিরে হাওয়ায় আন্দোলিত নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে পরিস্কার উঠোনে অবিরত নেচে চলেছে। জনহীন গ্রামের ও প্রান্ত হতে মৃতদেহ ছিঁড়ে খাওয়া শিয়াল কুকুরের দলের চেঁচামেচি ভেসে আসছে।

বিপ্লব আর লায়লা পরিস্কার উঠোনে নেমে এল। শরীরে ক্লান্তি-মনে অবসাদ, চোখে জিঘাংসার বারবাবহ্নি। চলচ্চিত্রের ছবির মত একের পর এক দৃশ্য ও সংলাপ বিপ্লবের মনের ভিতর দিয়ে দ্রুত ছুটে যেতে লাগল। তার স্নেহের বোন কাকলি ঐ লুৎফারই সহপাঠী – একই হোষ্টেলে থাকত। কাকলির উপরও ঠিক ঐ লুৎফার মতই অত্যাচার করেছে সেই পাষণ্ড মেজরটা, কি যেন তার নাম? জিয়াস খাঁ! হ্যাঁ, ঐ জিয়াস খাঁ-ই হচ্ছে সব কিছুর মূল। ও নিশ্চয় কাকলিকে অত্যাচার করে হত্যা করেছে! কাকলি যেন চিৎকার করে উঠল বাঁচাও! বাঁচাও! তারপর –? উঃ! আর চিন্তা করা যায় না। এর আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও হিন্দুদের উপর হিন্দু মেয়েদের উপর ঐ একই ভাবে অত্যাচার হয়েছে। অগ্নিসংযোগ – লুঠতরাজ, নরহত্যা – নারীধর্ষণ – ষ্টীমার ভর্ত্তি করে হিন্দু মেয়েদের অন্যত্র চালান করা, নিপীড়ন-নির্যাতন – উঃ! আর ভাবা যায় না! বিপ্লব তখন নাবালক। ওর মা বাবাকেও মুসলমানেরা খুন করেছিল – সব লুটপাট করেছিল – বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কচি মেয়ে কাকলি আর কিশোর বিপ্লবকে মানুষ করেছিল ডাক্তার। আর ঐ হিন্দু ক'ঘরকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছিল লায়লার বাবা। পরিণত বয়সে লায়লা হ'ল বিপ্লবের প্রণয়িনী। ওরা উভয়েই ধর্ম্মের বাঁধন মানত না। ওদের গোপন বিহারের প্রতিচ্ছবি ছুটে চলে মনের পর্দার উপর দিয়ে। হঠাৎ যেন ছবির রীল দৃশ্যান্তরে ঘুরে এল – ঢাকা

ক্যান্টনমেণ্ট – গ্রামগুলো জ্বলছে – নারীধর্ষণ – লুটপাট – খুনখারাপী-হত্যা – গোলাগুলি – ট্যাঙ্ক-মাইন – প্লেন-বোমাবর্ষণ; – বিপ্লব সেই মেজরটার গালে কষে এক চড় মেরে দিল – গুলি করে মেরে দিল কতকগুলো পাঞ্জাবী আর পাঠান সৈন্যকে। তারপর হঠাৎ যেন কিছুটা আত্মস্থ হয়ে উঠল বিপ্লব। লায়লার দিকে নজর পড়তেই দেখে, সে উঠান সংলগ্ন বারান্দাটায় বসে আছে ঝিম আর তার দু'কপোল বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ছে।

দুর ছাই – ভাল লাগে না! লায়লাটাও যেন কচি খুকী হয়ে উঠল, লুৎফা মরে গেছে তা অত অধৈর্য হলে চলবে কেন? মেয়েটা এম, এ, পড়ছে না মাথা মুণ্ডু! কি শিখেছে? শোক সইবার ক্ষমতা নাই একরত্তিও। লায়লা! ও লায়লা! লক্ষ্মীটি আমার, ওঠ। এই বলে বিপ্লব সস্নেহে লায়লার মাথায় হাত রাখল।

লায়লা উঠে বসল। অতি মৃদু কণ্ঠে বলল – বিপ্লব, লুৎফা বাঁচল না – নয়? চল আমরা আজই যেখানে হোক চলে যাব। কণ্ঠে তার নিদারুণ হতাশা, যেন ডুকরে কেঁদে উঠল।

তাই চল, রাতের পাতলা অন্ধকারে অনিশ্চিতের দিকে পা বাড়াল।

ওরা সুশিক্ষিত হলেও পুরোপুরি মোহমুক্ত হতে পারে নি এখনও। কিন্তু মানুষ যেখানে সর্বহারা, গৃহহারা, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয় সর্বোপরি ইজ্জত ও সম্ভ্রম ভুলুণ্ঠিত ও পদদলিত হয় সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত যে কোন আকর্ষণ থেকেও প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞায় নিজের শরীর ও প্রাণটাকে উপুড় করে ঢেলে না দিয়ে উপায়ই বা কি? তাই তারা দু'টি যুবক-যুবতী চলেছে অজানা পথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে – বিবেকের আহ্বানে। চাই প্রতিকার – প্রতিরোধ – প্রতিশোধ!

দুই

ওরা চলছে তো চলছেই, চলার যেন আর শেষ নাই। বিপ্লব উঠতি বয়সের জোয়ান ছেলে। গায়ে বল যত-মনের বল তার থেকেও হাজার গুণ বেশী। কিন্তু এ সংসারে অনেক সময় প্রচণ্ড বলও অকেজো হয়ে পড়ে, এমন নজির যে নাই তা নয়। বিপ্লব জল কাদা মেঠো পথে চলতে চলতে থমকে থমকে দাঁড়িয়ে বলে – লায়লা, এসো! আর তো এসে গেলাম বলে! ঐ তো দেখা যাচ্ছে মতলব বাজার। আর চলতে পারছ না নয়? নেহাত না পারতো আজকের মতো এই গাঁ-টায় রাত কাটালেও মন্দ হয় না। কে জানে এখানে আবার কোন্ দল! মুশ্লিম-লীগ না অলবদর! যা হয় হবে, চল আমরা কারোর অতিথি হই গা । এই বলে বিপ্লব আবার খানিকটা পিছিয়ে এসে লায়লার হাত ধরে বলল ইস! তুমি কি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছ – তোমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। অসুখ বিসুখ করে নাই তো? এই বলে বিপ্লব ওর কপালে ও গায়ে হাত দিয়ে বারংবার পরীক্ষা করে বলল, না! গা গরমের তেমন কিছু তো বুঝছি না। কিন্তু তোমার পা দুটো যেন কেমন ফুলো ফুলো লাগছে। এই বলেই বিপ্লব হাঁটু গেড়ে বসে লায়লার পায়ের পাতায় আঙ্গুলের ডগ দিয়ে টিপে বলল – দেখেছ মাংসটা এখনও কেমন গর্ত্ত হয়ে বসে রয়েছে। তোমার পা দুটো খুব ফুলেছে। সুতরাং আর হাঁটা ঠিক হবে না লায়লা, সন্ধ্যে হয়ে এল – চল আমরা এই গাঁয়েই রাত কাটাই।

লায়লা যেন টলছিল। সে দু হাতে বিপ্লবের কাঁধ ধরে বসে পড়ে তার বুকে মাথা গুঁজে বলল, আমি আর পারছি না বিপ্লব।

তোমার পারার তো আর কিছু দরকার নাই। কোন রকমে মতলব বাজার পর্য্যন্ত চল – তারপর যা করার আমি করব। যদি চলতে নাই পারতো তোমায় কোলে অথবা কাঁধে করে আমি নিয়ে যেতে পারব।

সে-কি কথা? তুমি যেন দিন দিন আরও ছেলে মানুষ হয়ে উঠছ বিপ্লব। আমি কি কচি খুকী যে আমায় কোলে নিয়ে রাস্তায় চলবে? লোকে দেখলে বলবে কি?

খুকী কি ধাড়ী অতশত জানি না, তবে প্রয়োজন হলে তোমায় কোলে কিংবা কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারব এবং যাবও –

ইস্! দেখো পা-টায় কিসে কামড়ে দিলে!

সে কি? কিসে কামড়াল? সাপ টাপ নয় তো?

না, কই সাপতো দেখছি না। বিপ্লব, ঐ দেখ পালাচ্ছে, একটা বিছে, মার-মার।

বিপ্লব বিছেটাকে মেরে দিল। বিছেয় কামড়ান জায়গাটায় বন তুলসী পাতা ঘষে দিয়ে লায়লার একগাছা চুল তুলে নিয়ে দুহাতে টান করে ঘোষে নিয়ে বলল – নাঃ – হুলটা ভাঙ্গে নাই মনে হচ্ছে।

লায়লা বলল, খুব একটা জ্বলে নাই তো! লোকে যে বলে বিছেয় কাটা আর সাপে কাটায় সমান জ্বালা।

বিপ্লব বলল, কে জানে বাপু! সাপে তো কখনও কাটে নাই যে সব কথা তোমায় বলে দেব। যাক্ এখন চলতে পারবে কি তুমি? যদি না পার তো আমার কাঁধে ওঠ, সাঁঝ হতে আর দেরী নাই।

লায়লা ম্লান হাসি হেসে বলল, ইস্! তোমার গায়ে তো খুব জোর দেখছি!

গ্রামটি বর্দ্ধিষ্ণু এবং হিন্দু প্রধান বলেই অনুমান হয়। ঢুকতেই প্রথমে রাস্তার পাশে বিরাট শিব মন্দির। মন্দির সংলগ্ন এক বিশাল দিঘীর স্বচ্ছ জল টলটল করছে।

বিপ্লব বলল, এখনও সন্ধ্যা হয় নাই – তবে গাঁ-টা এত নিঝ্ঝুম হয়ে পড়েছে কেন?

লায়লা বলল – দেখ, আমাদের মত সবাই আবার পালিয়ে যায় নাই তো?

তা-ও হতে পারে। ঐ দেখ, মন্দিরের মধ্যে একটা কুকুর ঢুকল কিন্তু! বাব্বা- – শিব লিঙ্গটা কত বড় গো! এই যাঃ! দেখেছ, কুকুরটা শিবঠাকুরের মাথায় ছ্যার্ ছ্যার্ করে পেচ্ছাপ করে দিলে গা – এ্যাঁ! করলে কি? শালা ওধারে খানদের অত্যাচার – আবার এধারে কুকুরের; ভালা মুস্কিল বটে তো!

লায়লা বলল, তাইতো? কুকুরটা ভয়ানক অসভ্য! এত জায়গা থাকতে ও পেচ্ছাপ করার আর জায়গা পেলে না?

ওটা কুকুরের ধর্ম্ম। ভুলো কুকুরগুলো উঁচু জায়গা ছাড়া পেচ্ছাব করে না কিছুতেই –

তাই বলে ঠাকুরের মাথায়?

আরে ঠাকুর কি আর ছাই এখন আছে? ইহাহিয়ার খানদের ভয়ে দেবতারাও প্রাণভয়ে মর্ত্তলোক ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছেন।

তাই হবে বোধ হয়। কিন্তু আমি যে আর চলতে পারছি না। দেখ না বিছেয় কামড়ানোর জন্যে পা-টাও কেমন চড়চড় করে ফুলে উঠল।

তাইতো! চল ঐ মন্দিরের দাওয়ায় গিয়ে খানিকটা বসা যাক।

লায়লা বিপ্লবের কোলে মাথা রেখে মন্দিরের খোলা চত্ত্বরে শুয়ে পড়েছিল। একটু পরে বলল-আমার ফুলো পাটা খুব চড়চড় করছে, তুমি পা-টায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না –

লায়লার পা-টার দিকে তাকিয়ে বিপ্লব বলে উঠল – তাইতো, খুব ফুলে উঠল যে! এখন কি করা যায়? এখানে কোন ডাক্তার আছে বলে তো আমার মনে হয় না – গাঁয়ের ভিতরে কোন লোক পাই কিনা খুঁজে দেখব?

লায়লা চোখ বুজেই আড়িমুড়ি ছেড়ে কাত হয়ে শু'ল এবং দুহাতে বিপ্লবের কোমরটা গায়ের জোরে জড়িয়ে ধরে বলল – না, তুমি একটু হাত বুলিয়ে দাও।

তা না হয় দিচ্ছি – কিন্তু তোমায় যে উঠতে হবে তাহলে –

নাঃ! তবে আর দিতে হবে না।

বিপ্লব ভেবে চিন্তে বলল-ঠিক আছে, তুমি হাঁটুটা আর একটু মুড়িয়ে শোও, তাহলে আমি তোমার পা-টা নাগাল পাব। তাতে তোমার শোওয়াও হবে – আমার হাত বুলোনও হবে।

লায়লা বিপ্লবকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে কাত হয়ে হাঁটু মুড়ে শুল আর বিপ্লব এক হাত বাড়িয়ে লায়লার ফুলো পা-টা আস্তে আস্তে টিপতে লাগল।

সামান্য একটু পরেই লায়লা উঠে বিপ্লবের গলাটা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মাথা রেখে বলল, আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না, বড্ড ভয় করছে – এখান থেকে পালিয়ে চল –

বিপ্লব সযত্নে তার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, দুর পাগলী! তাই কখনও হয় নাকি? ঐ ফুলো পা নিয়ে আজ আর এক পাও নড়া উচিত হবে না – আজ আমরা এখানে বিশ্রাম করি – কাল সকালে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

সেই ভাল। লায়লা বিপ্লবের বুক হতে মাথা না তুলেই বলল, আচ্ছা – তুমি আমায় খুব ভালবাস না? খু-উ-ব –?

খু-উ-ব –

আচ্ছা বিপ্লব – আমি খুব সুন্দরী না?

তাতো জানিনা।

আচ্ছা বিপ্লব – আমি যদি সেই মেজরটাকে বিয়ে করি – যে আমার এবং তোমার বোনকে অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে?

তা পারবে না।

কে বল্লে পারব না? তুমি বাজী রাখ, আমি তা নিশ্চয়ই পারব!

তাতে তোমার লাভ কি হবে?

লাভ? লাভ লোকসান – সেতো পরের কথা –

লাভ লোকসানের হিসেব নগ্‌দা-নগ্‌দিই হয়ে থাকে। মিলিটারী ক্যাম্পে ধার বাকীর কারবার নাই – আর চলেও না। যদি চলত তাহলে অনেক শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী মেয়ে ওখানে আজকে অত্যাচারে জর্জরিত হত না বুঝলে? তাদেরও মাথায় কিছু না কিছু ঘি আছে –

তা আবার নাই?

তবে ওসব হাবর হাটী ভাববার দরকার কি?

এমনি – এমনিই –

কখ্‌খনো নয়, মানুষ এমনি এমনিই একটা কিছু ভাবে না-তার পিছনে একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকেই-বিশেষ করে এই রকম প্রসঙ্গে; আমার যা ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে, তাতে তোমার ঐ সব ঘ্যান ঘ্যানানি শুনতে আর ভাল লাগছে না। বিপ্লব রাগত ভাবে অন্যধারে মুখ ঘুরিয়ে নিল। লায়লা ধড় ফড় করে উঠে বিপ্লবের কাঁধে হাত রেখে বলল – তাইতো! হে-ই মা! এখন জল কোথায় পাই! বলেই চত্বর থেকে নেমে পড়ল।

কোথায় আর যাবে? গোটা গ্রামটাই জনশূন্য। সব বাড়ীর সমস্ত ঘরের দরজাই খোলা – যেন সব হাঁ-হাঁ করছে। কয়েকটা নেড়ী কুকুর এধারে ওধারে ঘোরাঘুরি করছে, মানুষ দেখলেই লেজ গুটিয়ে পাঁদাড় দিয়ে লুকিয়ে পালানর চেষ্টা করছে; মনে হচ্ছে ওরা এখন মানুষকেও বড্ড ভয় করে –।

তখন সবেমাত্র কাল সাঁঝি। ওরা গা-টা ঘোরাঘুরি করতে করতে কোনলোক জনের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পেল না; লায়লা সহসা চিৎকার করে উঠল – পেয়েছি – পেয়েছি –

কি পেয়েছ?

ইঁদারা, ঐ দেখ – রাস্তার ধারে একটা ইঁদারা, চল, জল খেয়ে আসি – তেষ্টায় আমারও গলাটা কাঠ হয়ে গেছে। পাশেই একটা বাড়ী থেকে দড়ি এবং একটা কলসী জোগাড় করে নিয়ে লায়লা ইঁদারাটার কাছে প্রায় ছুটেই গেল। উঁকি দিয়েই মুখটা তার আরও শুকিয়ে গেল। মাছি ভন্ ভন্ করছে – একটা পচা দুর্গন্ধ আসছে – ইঁদারার ভেতরে কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। বিপ্লব উঁকি মেরে দেখে থমকে দাঁড়াল।

চল, পুকুরের জলই খেয়ে নিই।

তাই চল –, আমি আর একদম দাঁড়াতে পারছি না। ওরা কয়েকটা বাড়ী পেরিয়ে এসে একটা পুকুরের ধারে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকারে রাস্তাঘাট পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা যায়। পুকুরের ঘাটে এসে ওরা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা শিয়াল কুকুরে মড়া খাচ্ছে। কয়েকটাই মৃতদেহ পড়ে আছে। শিয়াল কুকুরে সব খেতে পারে নাই – তাদের মধ্যে দু'তিনটি কিশোর ও একটি তরুণী বধু রয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এদের গুলি করে বা অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে লায়লা ভয়ে শিউরে উঠল এবং বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। বিপ্লব তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে ছুটে আবার সেই মন্দিরে ফিরে এসে পাশের পুকুর হতে জল এনে নিজে খেল এবং লায়লাকে খাওয়াল।

লায়লা প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর একটু সুস্থ হয়ে বিপ্লবকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে বলল – বিপ্লব, আমায় বাড়ী নিয়ে চল – এখানে একদম ভাল লাগছে না।

বিপ্লব করুণভাবে তাকে বলল, ঘরে ফেরার পথ আমাদের বন্ধ – পথই আমাদের ঘরবাড়ী- – পথকেই যে আমরা বেছে নিয়েছি আমাদের সঙ্কল্পের সাধনা করে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যে। যতদিন সে উদ্দেশ্যে আমাদের সিদ্ধি না হয় ততদিন ওসব চিন্তা করাও পাপ।

লায়লা যেন নিজেকে খুব অক্ষম অসহায় মনে করল। হতাশার সুরে বলল – তবে কি হবে?

কি আবার হবে? তুমি আর আমি দু'জনায় চলব। চলতে চলতে যখন দেখব চলার পথ শেষ হয়ে গেছে – আমাদের যা-যা কিছু বলার সবই বলা হয়ে গেছে – যা কিছু দেখার সবই দেখা হয়ে গেছে – তখনই আমরা দু'জনায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যাব – হারিয়ে যাব এক অজানা মোহানায়। তখন কেউই আমাদের আর খুঁজে পাবে না – আমাদের চিন্‌তে পারবে না – তখন খালি তুমি আর আমি – আর আমাদের ভালবাসা – আমাদের বুকভরা ভালবাসা, আমাদের উজাড় করে দেওয়া ভালবাসা। সেখানে আর থাকবে না ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্য – নারীর লাঞ্ছনা – অত্যাচারিতের কান্না। সেখানে 'আল্লা', 'ভগবান', 'জেসাস' মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ কাকলি-লুৎফা, মা-বাবা, আত্মীয় পরিজনের যেন হাট বসে গেছে। জান লায়লা, সেখানে আমাদের যেতেই হবে – যেমন করেই হোক যেতেই-হবে।

বিপ্লব সেই মন্দিরের দাওয়ায় বসে আর লায়লা তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। সন্ধ্যাকাশের উজ্জ্বল তারাটার মত বিপ্লবের চোখ দুটোও যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

বিপ্লব আবার বলল – আচ্ছা লায়লা, তুমি আর আমি যদি মিলে মিশে একাকার হয়ে যাই – তাহলে কেমন হয় বলতো? আর যেন কিচ্ছু ভাববার থাকে না – তাই না? ইয়াহিয়ার সেই পাষণ্ড সৈন্যগুলো তখনতো তোমাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না; ইয়াহিয়া কেন, ভগবান বেটারও সাধ্য নাই যে তোমাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয় –

লায়লা তখনও ঠিক সুস্থ হতে পারে নাই। 'খান'দের নাম শুনে ভয়ে আঁৎকে উঠল, আরও জড়ো সড়ো হয়ে বিপ্লবের কোল ঘেঁষে বসে তাকে গায়ের জোরে আঁকড়ে ধরে কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল – হ্যাঁ বিপ্লব, আমাদের কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না – নয়?

বিপ্লব তখনও আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। তার বড় বড় চোখে তখনও দপদপে তারাটা জ্বল জ্বল করছে। সে চোখ নামিয়ে বলল, ঠিক বলেছ, আমাদের সবই তো গেছে; শেষ সম্বল কাকলি আর লুৎফাও চলে গেল – আর কি – আর কিসের মায়া? এই দেহটা? ও না-ই বা থাকল! তুমি আর আমি শেষ দেখা দেখে নেব- – সেই হৃদয়হীন ভগবানটা যা পারে নাই তা আমরা পারি কি-না।

লায়লা যেন বিপ্লবের বুকে ঘুমিয়ে পড়ল। সে জড়িত কণ্ঠে বলল – পারব, খুব পারব বিপ্লব, আমরা স-অ-ব পা-র-ব –।

লায়লা কি গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল! বিপ্লব তার কোল হ'তে লায়লার মাথাটা নামিয়ে দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে পায়চারি করতে পাগল। কখনও বা তার মাথাটা সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে বসল, লায়লাকে উঠানোর জন্য চেষ্টা করল অনেক। কিন্তু লায়লার ঘুম ভাঙার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বিপ্লব ভাবতে লাগল, আহা বড় লোকের বড্ড আদুরে মেয়ে। ও সইতে পারবে কেন এ শোক আর যন্ত্রণার বোঝা! ঘুমাক! যত পারে ঘুমাক!

তখন বোধ হয় মধ্য রাত্রি। পশ্চিম আকাশে একফালি চাঁদ পৃথিবীর চন্দ্রাতপে স্নিগ্ধ করতে গিয়ে হার মেনেছে। জ্যোৎস্না বড় ম্লান, অন্ধকার আর জ্যোৎস্নার মাখামাখিতে সবই যেন আবছা আবছা; খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায়, নইলে নয়। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একটানা রবের সঙ্গে কদাচিৎ দু'একবার শিয়ালের হুক্কা হুয়া রব ও কুকুর ভ্যাকানোর শব্দ। জোনাকী পোকাগুলো অবিরাম দীপ জ্বেলে হুড়ো-হুড়ি করছে। একটা টিকটিকি অন্য একটা টিকটিকিকে তাড়িয়ে নিয়ে মন্দিরের

দেওয়াল হতে নীচে নেমে এল। তাড়া খাওয়া টিকটিকিটা বোধ হয় স্ত্রী, সে পারবে কেন পুরুষের সঙ্গে! সে ছুটে এসে লায়লার গায়ে উঠে পড়ল এবং সেখান থেকে বিপ্লবের হাত বেয়ে মাথায় উঠে তড়াং করে লাফ মেরে নীচে পড়ে গেল। তখন হয়তো পুরুষটা তাকে না দেখতে পেয়ে টিক্ টিক্ টিক্ করতে করতে আবার মন্দিরের দেওয়ালে উঠে পড়ল। বিপ্লব কত কি ভাবছিল; সব চিন্তা জাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। ওর মনে পড়ে গেল ওর ছোট বেলাকার ঠাকুমার কথা। টিকটিকি মাথায় উঠে কোন ধারে পড়লে যেন কি হয়! রাজা-না ফকির, ঠিক মনে পড়ছে না। এই সব ভাবনা তরঙ্গ আবার ঘা খেল যেন এক কঠিন পাহাড়ে। হঠাৎ মাঠ হতে ভেসে এল গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। হয়তো হাল্কা মেসিনগানের আওয়াজ। বিপ্লব আঁৎকে উঠল, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, উঃ -! আজও হয়তো কোন গ্রাম আক্রমণ করেছে সেই পাষণ্ড খান সেনারা, হয়তো গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে, সব লুপটাট করবে, সব ধ্বংস করে দেবে। কাকলি আর লুৎফার মত মেয়েগুলোকে আবার সেই ক্যাণ্টনমেণ্টে ধরে নিয়ে যাবে, তরুণ, জোয়ান, প্রৌঢ় প্রত্যেককেই গুলি করে মারবে। তারপর? আবার সেই ক্যাণ্টনমেণ্ট -! না-! আর ভাবা যায় না – বিপ্লব দুহাতে রগ টিপে ধরল। কিছুক্ষণের জন্য যেন সে সম্বিত হারিয়ে ফেল্‌ল। সে উঠল, বসল, আবার পায়চারি করতে লাগল। তারপর কি যেন ভেবে মন্দির-চত্বরের ছাদে উঠা যায় কিনা দেখতে লাগল। দেখল, একটা কাঠের ভাঙা সিঁড়ি পড়ে রয়েছে-মন্দিরের পাশে। বিপ্লব সেই সিঁড়িটা এনে লাগাল, এবং লায়লাকে জাগিয়ে নিয়ে মন্দির-চত্বরের ছাদে উঠে পড়ল।

ওখানে গাছপালার আড়াল নেই। ম্লান জ্যোৎস্না লায়লার সমুন্নত বুকে ও সুন্দর মুখে পড়ে তাকে যেন আরও সুন্দরী করে তুলল।

লায়লা তো অপরূপ সুন্দরী, শিক্ষিতা যুবতী। তার প্রতিটি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে পূর্ণ যৌবনের জোয়ার খেলছে। নিটোল স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী, গায়ের রং যেন দুধে আলতায় গোলা, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি আজানুলম্বিত। সমুন্নত বক্ষ ক্ষীন কটি, ভারী নিতম্ব ও জঙ্ঘা। পদ্মকলি আঙ্গুলে পাথর সেটিঙের আংটি আর গলায় একটা চিকচিকে পাথর বসান সরু হার। বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত ঘুমন্ত লায়লা যেন স্বর্গের অপ্সরা। তার অঙ্গাবরণ হতে যৌবনের জোয়ার যেন জোর করে বেরিয়ে আসছে।

লায়লা বিপ্লবের প্রণয়িনী। এত ভালবাসা এত মেলামেশা তবু লায়লা যে এত সুন্দরী তা বিপ্লব যেন কোন দিনই অনুভব করতে পারে নাই। আজ লায়লাকে সে এমনভাবে দেখতে লাগল যেন এমন দেখা কখনও দেখে নাই। সে যেন মদিরাচ্ছন্ন হয়ে লায়লাকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে, নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল। সেই সময় গুড়ুম করে সামান্য দূরে যেন একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। বিপ্লব তখন লায়লাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল, কাঠের সিড়িটা উপরে তুলে নিল এবং উঁকি মেরে দেখতে লাগল, কেউ আসছে না যাচ্ছে।

যারা আসছিল তারা হয়তো অন্য রাস্তা দিয়ে চলে গেছে। তারা পাকিস্থানী সৈন্য অথবা মুক্তি ফৌজ। যেই হোক না কেন এধারে আর এল না। বিপ্লব কত কি ভাবতে ভাবতে লায়লার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তার অজ্ঞাতেই।

কিছুক্ষণ পরে লায়লার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে দেখল ঘুমন্ত বিপ্লবের একখানি হাত তাকে যেন আঁকড়ে ধরে রয়েছে। সহস্র বেদনার বোঝা, অজস্র চিন্তার জ্বালা তার বুকের মধ্যে যেন কাঁটা হয়ে বিঁধছিল। সেই যন্ত্রণা সে যেন আর সহ্য করতে পারছিল না। শত চেষ্টা করেও লায়লা ঐ দমবন্ধ হাওয়া চিন্তার বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরে উঠছিল না। তাই তার সমস্ত মন-প্রাণ এই সবকিছু ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে নতুন একটা কিছু পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। অতিবড় বিপদে পড়ে মানুষ যেমন অতি তুচ্ছ জিনিষকেই সামনে পেয়ে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়; ঠিক তেমনি লায়লাও বিপ্লবের অসাড় হাতটাকে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরল। এর মধ্যে সে যেন কতকি খুঁজে পেল! তার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের চমক খেলে গেল, সে হয়ে উঠল যেন বাঁধ ভাঙ্গা প্রবল জলস্রোত।

বিপ্লবের ঘুম ভাঙল লায়লার বাহু বন্ধনের নিষ্পেষণে। বিপ্লব তো তারই। বিপ্লবে পৃথিবীতে আর কারও অধিকার নাই। উভয়েই এম, এ, ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী। সুখে লালিত পালিত। বিপ্লব হিন্দু ঘরের ছেলে, সুশ্রী, শান্ত স্বভাব, উদারচেতা

ও বলিষ্ঠ তরুণ দেখে, লায়লার বাবা লায়লার সম্ভাব্য বর হিসাবে উভয়কে মেলামেশায় দিয়েছে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। যেখানে ধর্মের বাঁধ ও বাধা স্থান পায় নাই। উভয়েই উভয়ের জন্য পাগল। ওরা ছিল সুমার্জিত, সভ্য ও ন্যায়বাগীশ। তাই যৌবনের ভরা গাঙেও ওদের তরীর হাল ওরা ধরেছে শক্ত হাতে-অভিজ্ঞ নাবিকের মত। আজ লায়লার হাত হতে যেন সেই হালখানি খসে পড়ল। ভরা গাঙে তরী বেসামাল!

বিপ্লব লায়লাকে বুকে জড়িয়ে ধরল নিবিড় ভাবে। লায়লা বলল, বিপ্লব! আজ হতে আমরা আর এ পৃথিবীর মানুষ থাকব না, আমরা চলে যাব সেই আদিম যুগে – সেই আদি পিতা আদম আর ইভের কালে। আমি আর কিছু – এক রত্তিও ফেলে রাখতে চাই না বিপ্লব, তুমি আমার – আমি তোমাকে সবরকমভাবে পেতে চাই। ওরা তখন ইয়াহিয়ার বাংলা দেশে নয় – আদম আর ইভের রাজ্যে – পুলকিত হৃদয়ে উভয়ে উভয়ের বক্ষ পিঞ্জরে।

তখনও পূবের আকাশে ভুলকো তারাটা উঠে নাই। হয়তো রাত্রি তৃতীয় প্রহরই হবে বোধ হয়। একজন থুরথুরে বুড়ী লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে আসছে, আর প্রাণ ফাটান ডাক-ডাকছে – দাদা – অরু-রে! অ-রু! ও অ-রু – দাদা – ! ফিরে আয় ভাই! দ্যাখ তোর দাদু মরে গেল! কোথায় গেলি দাদা! আয় ফিরে আয় – দেখে যা, কারা এসে বাড়ী ঘর সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। আয় ফিরে আয়, মানুকেও সঙ্গে করে নিয়ে আয় –!

হায় বুড়ি! তুমি এখনও বেঁচে আছ? হয়তো পূর্ব জন্মে বহু পাপ করেছিলে; তাই শেষ জীবনে নব্বুই বছর বয়ে হয়তো তোমার নাতি-নাতনীদের এই কচি কচি প্রাণগুলোর আহুতি দেখার জন্য এখনও বেঁচে আছ। তোমার বুকফাটা কান্না আর ডকে তোমার অরুপ ও মানদা আর কোন দিনই ফিরবে না।

ওদের ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। তখন সূর্য্য রশ্মির মাদকতা নাই, প্রখরতা পরিস্ফুট।

লায়লা বিপ্লবকে উঠাল। বিপ্লব উঠে বসে চোখ রগড়ে বলল, লায়লা, বুড়িটা তো আর ফেরে নাই বোধ হয়? মনে হয় সে হৃদয় সর্বস্ব নাতি-নাতিনীকে খুঁজতে খুঁজতে নদীর দিকে চলে গেছে।

কোন বুড়ী, প্রশ্ন করল লায়লা।

বিপ্লব বলল, গত রাতে সেই বুড়িটার প্রাণ ফাটান ডাকের কথা।

লায়লা বলল, ওসব ভেবে আর কি হবে! অমন কত শত, কত হাজার হাজার বুড়ীর সর্বনাশ হয়েছে তার কি আর লেখা জোখা আছে? তা ওসব ভেবে লাভ কি? বরং এখন আমাদের হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে মতলব বাজারের দিকে চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে হবে।

বিপ্লব বলল, সেই ভাল।

উভয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে পাশাপাশি বসল। দু'জনে চোখাচোখি হতেই গতরাতের স্মৃতির টুকরোগুলো তাদের দু'জনকেই স্পর্শকাতর লজ্জাবতী পাতার মত যেন কুঁকড়ে দিল।

তারা বিভিন্ন সংঘাতে অবসন্ন, তাই একটু সুখ ও শান্তি খুঁজছিল, চাইছিল কিছু পেতে – আর কিছু দিতে।

লায়লা সহজ হয়ে ওঠার জন্য এবং বিপ্লবকে সহজ করে তোলার জন্য ভাবতে লাগল।

কিন্তু মন তো আর তৈরী করা ঠাসা কাদা নয় – যে, মূর্তি গড়তে গড়তে যেমন ইচ্ছে ভেঙে-চুরে রদবদল করা যাবে? ভেবে চিন্তে সে যতই যুক্তি খাড়া করতে চাইল তা যেন বারংবার নস্যাৎ হয়ে যেতে লাগল।

প্রচলিত সামাজিকতা ও রীতিনীতির বাইরেও লোক চক্ষুর অন্তরালে আর একটা নিয়মও তো রয়েছে। সে যে মন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে। ওখানে তো, আর আইন কানুনের বালাই বা দোহাই চলে না!

সে সস্নেহে বিপ্লবের মুখটা তুলে ধরে বলল, বড্ড ভাবনা ভাবছ দেখছি – উভয়েই হো হো করে হেসে উঠল। উভয়ের প্রাণখোলা হাসির উচ্ছাস ওদের কোঁকড়ান মন দুটোকে আবার সতেজ ও সজীব করে তুলল।

লায়লা বলল, এই সময় একটু চা পেলে বেশ ভাল হত না?

তা আবার হত না! খুব ভাল হ'ত। আর সে ভালটা করবার কিছু অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তার কারণ এ গাঁয়ে লোকজন তো একটিও নাই। এখন তো আমরাই এ গ্রামের রাজা আর রাণী।

লায়লা হেসে বলল, অন্ততঃ গ্রামবাসীরা যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ তো বটেই।

আবার উভয়ের সম্মিলিত হাসিতে মন্দির-প্রাঙ্গনটি মুখর হয়ে উঠল।

লায়লা বলল, চলনা, কার ভাঁড়ারে চা চিনি আছে একটু খুঁজে দেখি।

তাই চল – ।

ওরা চলে গেল গ্রামের ভিতরে । বাড়ী বাড়ী ঘুরে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে তাদের চা খাওয়ার নেশা মাথায় উঠল, সব দেখে শুনে মনে হয়, যেন এক প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে সবই লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেছে। সোনার সংসারগুলো ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। প্রতিটি বাড়ীর জিনিষপত্রগুলো সব তছনছ হয়ে রয়েছে। কোন বাড়ীতে অগ্নিসংযোগে অর্দ্ধদগ্ধ জিনিষপত্রগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে এক মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনার – কোন বাড়ীতে লুটপাটের সময় ভাঙাচোরা জিনিষের একাধিক নিদর্শন – কোন বাড়ীতে ভস্মীভূত ও তছনছ করা গার্হস্থ্য সামগ্রীর মধ্যে থোকা থোকা জমাটবাঁধা রক্ত শুকিয়ে কালিপাড়া হয়ে রয়েছে – দরজা জানালায় তখনও লেগে রয়েছে রক্তের ছিটে ফোঁটা দাগ। এসব দেখে বেশ বোঝা যায় পাকিস্থানী সৈন্যদের অত্যাচার ও লুটপাটের সময় সেখানে একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। হয়ত গৃহস্বামী স্বেচ্ছায় বর্ব্বর অত্যাচার সহ্য করতে পারে নাই। অত্যাচারের বদলা নিতে গিয়ে, আরও অত্যাচারিত – নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় ও মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এবং যারা বেঁচে ছিল তারা সর্বহারা হয়ে হয়তো ভারতভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে অথবা রাস্তায় নিহত হয়েছে।

এত বড় বর্দ্ধিষ্ণু গোটা গ্রামটা যেন খাঁ খাঁ করছে। যেন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। দেখে শুনে মনে হয় যেন প্রেতপুরী।

ক্রমে ওরা একটা দ্বিতল প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রবেশ করল। বাড়ীটি তিন মহলা। প্রথম মহলে বৈঠকখানা ও কাছারী বাড়ী বোধ হয়। তার পাশে সারিবন্দী ঘর হয়ত চাকর-বাকর নগদী অথবা গোমস্তা ও পদস্থ কর্মচারীদের আবারস। সুসজ্জিত ফুলের কেয়ারী, মাঝের ঘরগুলো সবিন্যস্ত ও বহুমূল্য আসবাবে সুসজ্জিত। দ্বিতীয় মহলে দেবদ্বিজের আবাসস্থল মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রকোষ্ঠে উপযুক্ত আসবাবের প্রাচুর্য্য যেন এক মত্ত হস্তী নষ্ট করে দিয়েছে। তৃতীয় মহলটি হয়তো অন্দর মহল। সুসজ্জিত প্রতিটি প্রকোষ্ঠে বহুমূল্য আসবাব ও অভিজাত তৈলচিত্র এবং দেওয়ালে ও ছাদে অমূল্য পৌরাণিক কারুকার্য্যের সমারোহ গৃহস্বামীর আভিজাত্য স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু কি যেন এক অভিশাপে দৈত্যের মরণকাঠির ছোঁয়ায় সবকিছু নির্জীব, প্রাণহীন। সব লুটপাট হলেও কিছু কিছু অর্দ্ধদগ্ধ ও অবিন্যস্ত সামগ্রীর মধ্যে যা রয়েছে, তাতে তাদের সংসারের ছবিটি যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এক একটি ঘরে এক এক জনার বহুমূল্য তৈলচিত্র বহুমূল্য সোনালী ফ্রেমে বাঁধান। কচি খোকা-খুকী থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ফটোগুলি দেখে যেন ওদের বর্ত্তমান বংশের একটা নিছক ছবি অনুভব করা যায়। চিন্তা করলে অন্তরের আয়নায় সব যেন উঁকি ঝুঁকি মারে।

ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গোটা বাড়ীটা দেখল, অবিন্যস্ত আসবাব পত্রের সমারোহ তাদের তাক লাগিয়ে দিল।

লায়লা যদিও ধনী কন্যা, তবু, এ সব যেন তাদের অনেক উর্দ্ধে।

লায়লা বললে, বিপ্লব এসব দেখে শুনে মনে হয় এরা বোধ হয় কোন ছোট-খাট রাজা।

বিপ্লব বলল, তাই-ই হবে বোধ হয়। তা না'হলে এত দামী দামী আসবাবপত্র ও সৌখিন সামগ্রী থাকত না।

ওরা সব দেখতে দেখতে অন্তঃপুরের দ্বিতল অলিন্দে এসে গেল। বিপ্লব তখন একটা ঘরের বহুমূল্য পালঙ্কে গদিপাতা বিছানায় ধবধপে সাদা চাদরে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখে কি যেন ভাবছিল। অন্তর্দ্বন্দে তখন তার সমস্ত মনটা

বিষিয়ে উঠেছিল। লায়লা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাঝের মহলের ফুলবাগানের একটা কৃত্রিম ফোয়ারার মাঝখানে বহুমূল্য শ্বেত পাথরের দুটি অর্দ্ধনগ্ন নর-নারীর দৈহিক মিলনের পূর্ব্বরাগ, ক্ষুধাতুর, আকাঙ্খা প্রণোদিত ষ্ট্যাচু দেখে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, বিপ্লব! বিপ্লব! ছুটে এস না! মজা দেখে যাও –

মজা? আচ্ছা যাচ্ছি । এই বলে বিপ্লব ছুটে এসে লায়লার পাশে দাঁড়াতেই লায়লাস সহসা আনন্দে আটখানা হয়ে উঠে তার কাঁধে একখানা হাত তুলে দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে সোহাগের সুরে বলল, ঐ দ্যাখ – দ্যাখ, ষ্ট্যাচুটা কি সুন্দর!

বিপ্লব ষ্ট্যাচুটা দেখে বলল, তাইতো খুব সুন্দর! দেখবার মত জিনিষ বটে তো?

লায়লা বলল, আচ্ছা বিপ্লব – আমি শুনেছি মানুষ মদ খেলে অথবা ভরা যৌবনে মনের মানুষ পেলে সে দুঃখ ভুলে যায়। তা আমার মনের মানুষ তুমি তো রয়েছ। তবু আমার মনের জ্বালাটা কমছে না কেন বলতো? তবে তুমি আমাকে একটু মদ এনে দিতে পার?

মদ? সেকি কথা? মেয়ে মানুষে কখনও মদ খায় নাকি?

কেন? মেয়ে মানুষ কি মানুষ নয়? মদ কি কেবল পুরুষদেরই ভোগ্যবস্তু – একথা তুমি কোন্ শাস্ত্রে পড়েছ?

কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। তবে, যতদূর জানি, আমাদের দেশে মদটা পুরুষরাই ব্যবহার করে। আর যে সমস্ত মেয়েরা ওটা ব্যবহার করে তারা সমাজ পরিত্যক্তা বেশ্যা, অথবা বাইজী।

বিপ্লবের কথায় লায়লা হেসে উঠল, তার মিষ্টি হাসির তরঙ্গে সমস্ত কড়িডোরগুলোতে এক অনাবিল আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। সে বিপ্লবকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললে, বিপ্লব, আমি মনে করতাম তুমি খব বোকা। ইউনিভারসিটির পড়া ছাড়া আর কিচ্ছু বোধ হয় জান না। এখন দেখছি তা নয়; তুমি অনেক – অ-নে-ক-কিছু জান। আচ্ছা বিপ্লব, আমি যদি মদ খাই – তাহলে তুমি আমায় ঐ সব কি যেন বল্লে – তা আমায় ভাবতে পারবে? এই বলে লায়লা বিপ্লবের মুখের দিকে উত্তরের আশায় চেয়ে রইল।

বিপ্লব বলল, ওতো আলাদা একটা লাইন। ও সব বৃত্তি গ্রহণ না করলে কখনও বলা যায় নাকি?

সে কি কথা? তুমি এইমাত্র তো বল্লে, যে মেয়ে মদ খায় সে বেউশ্যা অথবা বাঈজী –

বিপ্লব অপরাধীর মত বলে ফেলল, তা হলে ওটা আমার বলা ভুল হয়ে গেছে।

লায়লা সোহাগের সুরে বলল, ছেড়ে দাও ওসব আজে বাজে কথা। তুমি যেখান থেকে পার আমায় একটু মদ এনে দাও –

ইস্! বল কি? তুমি পাগল হয়ে যাও নাই তো?

লায়লা ওর মুখে থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে নিজেকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল – না তো!

তবে সহসা মদের কি দরকার হল শুনি?

তা শুনতে পার। একবার কেন, হাজারবার শুনতে পায়। তবে তুমি প্রথমে বলতো বিপ্লব, মানুষ মদ খায় কেন?

মানুষ মদ খায় – হয় শোক দুঃখ ভোলার জন্য, নয়তো স্ফূর্ত্তি করার জন্য – অথবা খেয়াল বশতঃ নেশা কেমন জিনিষ তা পরীক্ষা করার জন্য – নয়তো ক্লান্তি দূর করে এনার্জি পাবার জন্য।

বাব্বা! মদের এত গুণ? বিপ্লব, তবে আমায় মদ একটু এনে দিতেই হবে।

দূর পাগলি! ও পাব কোথায়? এখন পৈত্রিক প্রাণটা যে কি করে বাঁচাই তারই ঠিক-ঠিকানা নাই-

দরকার নাই ঠিক থাকার – এ প্রাণটার আর কি দাম আছে? আজ আছে – কাল নাই – কাল আছে তো পরশু নাই। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ একে কাজে লাগাও, যখন থাকবে না তখন একে আঁস্তাকুঁড়ের ময়লা ভেবে নিও।

বিপ্লব বলল, ভাবাটা সোজা কিন্তু কাজে খুব শক্ত–

বিপ্লবের কথায় লায়লা হেসে উঠল। বলল, তবে তুমি এখনও খুব আশাবাদী। তুমি কি ভুলে গেছ – এটা এখনও মুজিবের বাংলাদেশ নয় – ইয়াহিয়ার পাকিস্তান?

তা অবশ্য ভুলি নাই –

তা যদি না ভুলে থাক, তবে ঐ দ্যাখ ঐ ষ্ট্যাচুটা। ওতে আমরা সব পাব –

সব মানে?

মানে ফানে জানি না। যা মনে এল তাই বল্‌লাম।

বিপ্লব বলল – যার মানে নাই তা না বলাই ভাল –

লায়লা বিপ্লবের কথায় আবার হেসে উঠল। সহসা হাসি থামিয়ে বলল – আমাদের কোরাণ শরিফে অমন কথা কোথাও আছে তা তো দেখি নাই; তবে তোমাদের শাস্ত্রে কোনখানে এমন কিছু আছে কি না বলতে পারি না। তবে তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে এইটুকু জানি, তোমাদের কেষ্ট ঠাকুর যুদ্ধ করতে গিয়ে, না হয়তো বিহারে গিয়ে একটা না একটা সুন্দরী যুবতীর প্রেম পল্লবে কেলি করেছেন। এখন বলতো বিপ্লব, ওটা কত সুন্দর! এ সংসারে যা আছে তার একটা না একটা মানে আছেই আছে –

বিপ্লব বলল – তা হয়তো আছে –

তবে? এখন দেখছি তুমি খুবই নির্বোধ। তুমি কিচ্ছু জান না আর কিচ্ছু বোঝও না।

তার মানে?

আগেই তো বলেছি, আমি মানে ফানে কিচ্ছু জানি না –

বিপ্লব ভাবল, লায়লা যা বলছে তা যেন সংগতিহীন। যার না আছে কোন অর্থ – না আছে কোন যুক্তি। লায়লা সব হারিয়ে হয়তো হারানোর বেদনা সহ্য করতে না পেরে আধ পাগলা হয়ে পড়েছে। তখন বিপ্লবের মনেও সর্বহারার বারবাবহ্নি। সে বলল তুমি জা বলছ হয়তো তা-ই হবে। তাই বলে এত সাত সকালে মদের পিপাসা এবং ঐ ষ্ট্যাচুটা দেখবার মত কি যে এমন আছে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না –

লায়লা বিপ্লবের কথায় হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল – তুমি যেন কেমন পারা –

বিপ্লব শুধাল – কেমন পারা?

লায়লা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তা তো জানি না –

তবে বললে যে?

যা মনে এল তাই বললাম আর কি!

বিপ্লব যেন বারংবার সবকিছুর খেই হারিয়ে ফেলছিল। সে বলল, তা বেশ করেছ – এই বলে সে – ও একদৃষ্টে সেই ষ্ট্যাচুটার দিকে তাকিয়ে রইল।

লায়লা বলল – অত কি ভাবছ?

বিপ্লব বলল – ওতে যা আছে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। দেখতে দেখতে সে সহসা বলে বসল – আচ্ছা লায়লা, আমরা অমন হতে পারি না?

ইস! বল কি? তুমি পাগল হয়ে যাও নাই তো?

লায়লা ওর মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে নিজেকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল – না তো!

লায়লা বলল – খুব পারি-অমন হওয়াই তো ভাল। এ সংসারে যা দেখবার আছে তা দেখব – যা পাবার আছে তা পাব-যা নেবার আছে তার তলানিটুকুও নিয়ে নেব, যা খাবার আছে তা সব খাব – যা ছাড়বার তা নিঃশেষে ছেড়ে দেব; এখানে মানব না আমরা কোন বাধা-বিপত্তি – বিধিনিষেধ। এর জন্যে যদি আগুনেও ঝাঁপ দিতে হয় তা-ও দেব, জলে ডুবতে হয় তা – ও ডুবব। এ আমাদের জীবন মরণ পণ –

সেই ভাল লায়লা – যা বাস্তব তা চিরন্তন সত্য –

তা নয়তো কি? মানুষের চলার পথে যা চোখে পড়ে তাই-ই চরম সত্য – এর বাইরে যা কিছু তা সব সত্য হলেও তার জন্যে জমা খরচের খাতা দরকার হয়। আমরা পথিক – আমাদের ওসব খাতা খতেনের বালাই নাই – আমরা চলেছি – চলছি – চলব –

বিপ্লব বলল, ঠিক বলেছ –

তবে লক্ষীটি আমার! আমায় একটু মদ এনে দাও। তা আমি একা খাব না – তোমাকেও ভাগ দেব।

বিপ্লব বলল, কিন্তু এই জনমানবহীন পুরীতে মদ কোথায় পাব বলতো?

পাওয়া যাবে না – তবে আর কি করা যাবে? তাহলে এখন কি করা যায় বলতো? আমার এখানে একদম ভাল লাগছে না –

বিপ্লব বলল, ভাল না লাগলে আর উপায়ই বা কি? তুমি বরং ঐ ঘরে একটু জিরোও – আমি এদের ভাঁড়ারটা খুঁজে দেখে একটু চায়ের বন্দোবস্ত করি –

সেই ভাল – এই বলে লায়লা পাশের একটা ঘরের বহুমূল্য খাটের সুন্দর বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে কয়েকবার গড়াগড়ি দিয়ে আবার ধড়ফড় করে উঠে বসে একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে চিৎকার করতে লাগল বিপ্লব – বিপ্লব –!

বিপ্লব তখন ষ্টোভ জ্বেলে চা করছিল। লায়লার ভয়ার্ত্ত চিৎকার শুনে ছুটে এসে বলল – কি হয়েছে? এমন চেঁচাচ্ছ কেন?

লায়লা তখন কপালের উপর চোখ তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বিপ্লব –! দ্যাখ-দ্যাখ – এই বিছানাটায় কত রক্ত –!

বিপ্লব দেখল-অবিন্যস্ত বিছানার মাঝখানে বেশ খানিকটা রক্ত এবং আশে পাশে ছিটে ফোঁটা রক্তের দাগ। তাজা রক্ত বাশি হয়ে যেন একটু কালচে কালচে হয়ে গেছে। সে বলল তাতে আর কি হয়েছে –? অমন রক্ত আমি গাদা গাদা দেখেছি –

লায়লার চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বলল, তুমি এমন রক্ত দেখেছ –? এই রক্ত দেখেও তুমি এখনও চুপ করে রয়েছে বিপ্লব –? তুমি কেমন করে এখনও চুপ করে থাকতে পারলে? বল বিপ্লব – তুমি বল – বল – বল – এই বলে লায়লা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবং বিপ্লবের বুকে দুহাত দিয়ে বারংবার চাপড়াতে চাপড়াতে তার বুকে মাথা রেখে বলল, তুমি বল কেন তা করলে? কেন তুমি চুপ করে থাকলে? দেখছ না, ঐ রক্ত নিশ্চয়ই ঐ কচি বউটার – এই বলে সে পাগলের মত দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা সুন্দরী নববধুর তৈলচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বিপ্লবের বুকে যেন ভয়ে আঁৎকে উঠে লুকোতে চাইল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সহসা যেন নির্বাক হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বিপ্লবের বুকে। বিপ্লব তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সোহাগের সুরে বলল – দূর পাগলী! ও-কার না কার রক্ত তার ঠিক নাই।

তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। এই বলে বিপ্লব ওকে অনেক সোহাগ করে কত কথাই না বলল। কিন্তু লায়লা কোন কিচ্ছুরই জবাব না দিয়ে চোখ বুজে তার বুকে মাথা গুঁজে রইল। বিপ্লব তখন তাকে ডেকে বলল, লায়লা – ও লায়লা! লায়লা যেন ঘুম থেকে আড়ি-মুড়ি ছেড়ে উঠে বলল – উঁ! কি বলছ?

চল, চা খাই গে – শুয়ে আর কাজ নাই –

চল –! এই বলে লায়লা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বিপ্লব ভাবল লায়লার হয়ত ব্রেন ডিফেক্ট শুরু হয়েছে। তাই আর কিছু না বলে সেও বাইরে এসে লায়লার হাতে চায়ের কাপটা দিয়ে উঠিয়ে দুটো চেয়ারে বসে চা পান করতে লাগল। লায়লা চা খেয়ে আবার সেই ষ্ট্যাচুটা চোখে পড়তেই বলল, আচ্ছা বিপ্লব – ঐ পুরুষটা ঐ মেয়েটার কাপড়টা কেড়ে নিচ্ছে কেন?

বিপ্লব এর যেন সহসা কোন জবাব খুঁজে পেলো না। সে ষ্ট্যাচুটার দিকে একবার চেয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে আমতা আমতা করে বলল, তাই তো –!

লায়লা তখন তাকে জাপটে ধরে ফেলেছে – । সে বলল, বলনা-কেন কাপড়টা কেড়ে নিচ্ছে? দ্যাখ, মেয়েটাকে উলঙ্গ করে ফেলল বলে; পুরুষটার গায়ে যেন ষাঁড়ের বল –

বিপ্লব বলল – তাই বটে তো!

লায়লা বলল, বলনা – ও কেন অমন করছে?

বিপ্লব বলল, বোধ হয় মিলনের জন্যে –

মিলন? মিলন আবার কিসের? মেয়েটা মিলতে চায় না, তবে পুরুষটা কি জোর করে মিলবে না-কি? আচ্ছা বিপ্লব, না মিললেও কি জোর করে মেলান যায়?

বিপ্লব বলল, বোধ হয় যায় না –

তবে? তবে পুরুষটা মিলতে যাচ্ছে কেন?

আমার মনে হয় ওতে ঐ নারীর ও প্রচ্ছন্ন সম্মতি আছে। তা যদি না থাকত, তবে –

কি – তবে কি –?

পুরুষটা অমন করে ওর কাপড়টাকে ধরে টানাটানি করতে পারত না। আবার ওটা যদি আদি যুগের অবয়ব হয়, যখন নারী-পুরুষের মিলনের কোন বিধিনিষেধই ছিল না – । তাহলে হয়ত – উভয়েরই সম্মতি ও সম্ভোগের প্রবৃত্তি রয়েছে। আর যদি পরবর্তি যুগের হয়, তবে ঐ নারী হয়ত প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও নারী সুলভ লজ্জায় অঙ্গাবরণ স্খলিত হতে দিচ্ছে না –

ঠিক বলেছ, বিপ্লব! ওর আকাঙ্খা রয়েছে – অথচ লজ্জায় যেন কিন্তু কিন্তু করছে। যেমনি করে সবাই। পুরুষেরা বেপরোয়া, তাই তারা ভাঙ্গাগড়া দুহাতেই করে, মেয়েরা রক্ষণশীলা, তাই তারা রাখতে না চাইলেও রাখার ভান করে। ঐ নারীটার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, পুরুষটার হ্যাংলামিতে ও যেন বেশ আনন্দ ও তৃপ্তি পাচ্ছে –

সত্যিই তো – আসলে তাই-ই –

আচ্ছা বিপ্লব, তুমি ঐ পুরুষটার মত ষাঁড়ের শক্তি নিয়ে আমার এই কাপড়টা অমনি ভাবে কেড়ে নিতে পার না?

লায়লার এই নির্লজ্জ কথায় বিপ্লবের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি কি বলছ লায়লা?

লায়লা সহাস্যে তার হাত দুটো ধরে বলল, কি আবার বলব? যা বলার তাই-ই বলছি –

বিপ্লব চূড়ান্ত বিরক্তির সঙ্গে বলল, না – ওটা বলার মত কথা নয় –

কে বল্‌লে?

বিপ্লব বলল, আমি বলছি –

তুমি ছেলে মানুষ তাই ও কথা বলছ –

বা! চমৎকার! এ যুক্তি তুমি পেলে কোথায়? বিপ্লব বুঝেছিল লায়লা এখন শোকের ভারে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই আবার বলল, তা হয়তো হবে –

লায়লা বলল, তা যদি হবে তবে ঐ পুরুষটার মত তুমি কেড়ে নাও না আমার কাপড়খানা! আমি কিছুতেই দেব না – আর তুমিও কিছুতেই ছাড়বে না। তখন কেমন মজা হবে – নয়?

বিপ্লব বলল – ওসব চিন্তা এখন থাক –

নারকেল সুপারি গাছের ঝিরঝিরে পাতার ফাঁক দিয়ে রক্ত-রবির আবির মাখানো রোদের মাদকতা যেন ওদের পেয়ে বসেছে। মন্দ-মধুর মিষ্টি হাওয়া কাঁঠালিচাঁপার উগ্র গন্ধ বয়ে এনে ঐ দুটি তরুণ-তরুণীর মনে যেন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। নির্জন পরিবেশে আকাশে-বাতাসে সব যেন রঙের নেশা। কোথা থেকে একটা ফড়িং সহসা উড়তে উড়তে এসে আর একটা ফড়িংকে তাড়া করে নিয়ে ঘরে ঢুকে বারংবার ছাদে ও দেওয়ালে ধাক্কা খেতে লাগল। ঘরের কোণের দিকের দেওয়ালে একটা মস্ত বড় টিকটিকি এতক্ষণ চুপ করে যেন গুরুমন্ত্র জপ কর্‌ছিল। ফড়িং দুটোর ফর্‌র্‌ ফর্‌র্‌ শব্দ শুনে উনি এবার ওদের ধরার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বারংবার ছুটোছুটি করে ওদের ধরবার বহু চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু –ফড়িং দুটো খোলা জানালা দিয়ে ফর্‌র করে বেরিয়ে চলে যেতেই ও জানলার গরঙাদ পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে শিকার ফসকে গেছে দেখে রাগে যেন ফুলতে লাগল। এমন সময় আর একটি টিকটিকি জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই তাকে তাড়া করে গোটা ঘরটার দেওয়াল ও ছাদ যেন চোষে বেড়াতে লাগল।

ওধারে লায়লার কথা শুনে শুনে বিপ্লবের মনে তখন রীতিমত অন্তর্বিপ্লব শুরু হয়েছে। তার দ্বিধা বিভক্ত মনে শোক ও প্রতিহিংসার উন্মাদনা এবং নগ্নষ্ট্যাচুর ভাবাবেগ ও লায়লার বারংবার তাগাদা তাকে বিমূঢ় করে ফেলেছে। সে মন থেকে সবকিছু ঝড়ে ফেলে দিয়ে লায়লার মানসিক বিকারটুকু কাটানর জন্য তার প্রস্তাব মেনে নিল।

মধুময় পরিবেশে ওরা যখন আদিমতার দোর গোড়ায় তখন সেই টিকটিকিটা ছাদ হতে বিপ্লবের নাকের ডগায় পড়েই এক লাফ মেরে লায়লার হাতে এবং সেখান থেকে লাফিয়ে মেঝেয় পড়ে ছুটে গিয়ে আবার দেওয়ালে উঠে টিক টিক করে ডাকতে লাগল।

আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় উভয়েই চমকে উঠল। লায়লা তো হাতটা ঝাড়া দিয়ে ‘মা-গো’ বলে বিপ্লবের এপাশে সরে এলো এবং উভয়েই টিকটিকিটার নির্লজ্জ কাণ্ড দেখে নিরস্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বিপ্লবের মনটা আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে উঠল, সে যেন আবার একটা কি হারিয়ে ফেলল। এক কথায় ওদের ছন্দ পতন হয়ে গেল।

ওরা আবার নিজেদের তৈরী করার জন্য মনটাকে সুস্থ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু নীচে থেকে কার যেন গোঙানির আওয়াজ পেয়ে ওরা আবার নিশ্চল নিথর হয়ে পড়ল। উভয়ে কান পেতে শুনতে লাগল ও আওয়াজটা কি –

বাড়ীটি তিন মহলা। মাঝের মহলের অন্দরের একটা অন্ধকার ঘর হতে কার যেন মর্মন্তুদ আওয়াজ ভেসে আসছিল, ‘উঃ-! আঃ-! বাবাগো-! মা গো-!’

ওরা দু’জনে নিচে নেমে এসে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগল গোটা বাড়ীটা। অবশেষে ওরা মাঝের মহলে একটা ঘরের ভিতর দিয়ে ঘর এবং তার ভিতর দিয়ে গিয়ে একটা গোপন ঘরের সন্ধান পেলো। সেই অন্ধকার ঘর থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছিল। কিন্তু তার দরজায় খিল। ওরা কিছু শুখনো খড়ের মশাল করে তা জ্বালিয়ে নিয়ে তার দরজা

পর্য্যন্ত পৌঁছে দেখলো দরজার অর্গল বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেও তা খোলানো গেল না, কিন্তু সেই ঘর থেকে গোঙানির শব্দটি ভেসে আসছিল তখনও।

তখন ওরা ঐ ঘরের দরজা ভাঙার চিন্তা করে এবং একখণ্ড বড় লোহার এঙ্গেল যোগার করে তা দিয়ে বারংবার ঘা দিতে দিতে দরজা অর্গল মুক্ত হল। ওরা উভয়েই তখন ভিতরে ঢুকে খড়ের সেই মশালের আলোয় দেখল একটি সুন্দর যুবা ভু-লুণ্ঠিত। মৃত্যু যন্ত্রণায় তার মুখের বিকৃত চেহারা উভয়কে ভাবিয়ে তুলল। পাশেই পড়ে রয়েছে একটি মুমূর্ষু কিশোরী। লায়লা যুবকের মুখের কাছে গিয়ে বলল, জল খাবেন?

যুবক ইশারায় বলল – খাব!

বিপ্লব ছুটে গিয়ে জল এনে দিল – লায়লা যুবকের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে জল খাইয়ে দিল, তারপর উভয়ে ধরাধরি করে ঐ যুবা এবং কিশোরীটিকে উপরে নিয়ে এসে শুশ্রূষা করতে লাগল। ক্রমে কিশোরীটির জ্ঞান ফিরে এলো।

যুবকটি বলল – ওর নাম অবিনাশ। ওরা চার ভাই, সেইই সব থেকে ছোট। ওরা ওখানকার জমিদার ছিল, ধনী পরিবার। ওর বিয়েও হয়েছিল। সন্তানও একটি ছিল। প্রায় শ’ দুয়েক পাকিস্তানী ফৌজ এই গ্রামে ঢুকে গ্রামটি ঘিরে ফেলে। সকল গ্রামবাসীই তখন রান্নাবাড়া খাওয়া দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। তার পর প্রথমেই ওরা খড়ের ঘরগুলোয় আগুন লাগাতে আরম্ভ করে। গ্রামের লোক তখন ভয়ে পালাতে আরম্ভ করে – কিন্তু পালাবে কোথায়? যারাই পালাতে যায় তারাই গুলি খেয়ে সেই রাস্তার উপরই নেতিয়ে পড়ে যায় – মরে পড়ে থাকে। গ্রামের বহু লোক ভয়ে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু তা বেকার। সৈন্যদের কাছে ছিল মর্টার, হাল্কা মেশিনগান, অটোমেটিক ষ্ট্রেনগান, গ্রেনেড ইত্যাদি মারণ অস্ত্র। গ্রামের লোক পারবে কেন ওদের সঙ্গে? আমাদের মাত্র দুটি বন্দুক ছিল। বড়দা তা থেকে অবিশ্রান্ত গুলি ছুঁড়ে ছিলেন। আমি নিজে চোখে দেখেছি – অন্ততঃ বিশ জন সৈন্য তাতে মরেছে। তখন ওরা আরও ভয়ানক হয়ে উঠল। কমসে কম একশো সৈন্য আমাদের বাড়ী আক্রমণ করল। আমরা আর ঠেকাতে পারলাম না। ওরা লোহার গেট ভেঙ্গে আমাদের বাড়ী ঢুকে পড়ে সমস্ত লোককে পুকুরের ধারে নিয়ে গিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করল। নারী, শিশু,বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউই বাদ গেল না। আমার মেজদা ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী। ওর ঘরে ঢুকতে গিয়ে অন্ততঃ মেজদার হাতে দশ জন সৈন্য কচুকাটা হয়েছে। তখন ওরা মেজদার ঘরে পেট্রল স্প্রে করে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মেজদা, মেজবৌদি ও আমার মা বাবা সব ঐ ঘরে ছিলেন। তারা সব পুড়ে মরেছে। পাশের ঘরে ছিল আমার স্ত্রী আশালতা – এক বছরের ছেলে অরবিন্দ। ওরা সে ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে আশাকে তুলে নিয়ে গেল মিলিটারী ট্রাকে। আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি, আশার গায়ে তখন মাত্র ছেঁড়া সায়াটি ছিল, তাও রক্তে ভেজা। আমার মনে হয় ওরা আমার ঘরেই আশার উপর বলাৎকার করেছে। ছেলেটিকে মেঝেয় আছাড় মেরে মেরে দিয়েছিল তার আগেই। আমি আশাকে গুলি করে মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে গুলিতে আশা না মরে মরল একজন পাঠান সৈন্য। আমার এ লক্ষভ্রষ্ট – আমার জীবনের সব থেকে বড় ব্যর্থতা। আশা মরে গেলে আমার আর কোন আফশোষ থাকত না। তখন আমার ডান হাতে গুলি লেগেছে, তা না হলে আমি আরও আর দশ জন সৈন্যের প্রাণ নিতাম ও আশাকে অবশ্যই হত্যা করতাম। আমার – তবু একটু মঙ্গল হয়েছে, বোনটাকে বাঁচিয়েছি – বোনটাকে নিজে হাতে খুন করেছি। ভাইটিও গুলি খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। তার পর – ওরা আমাদের সব লুঠপাট করে এবং সবাইকে মেরে যখন ফিরে গেল তখন আমি কোন রকমে দরজায় খিল দিয়ে ওঘরে পড়েছিলাম। ওরা কমসে কম কুড়িটা মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। যুবকটি এই সমস্ত কথাগুলো বিপ্লব ও লায়লাকে শুনিয়ে বলল – আপনারা আমায় খুন করুন – আমি আর বাঁচতে চাই না, আমি আপনাদের পায়ে পড়ি আপনারা আমায় খুন করুন। এই বলে যুবাটি লায়লার হাত দুটি ধরে কেঁদে ফেলল এবং কাতর প্রার্থনা জানাল, দয়া করে আমায় খুন করুন,-তা হলে আমি আপনাদের কাছে পরজন্মে ঋণী হয়ে থাকব। আপনাদের দয়া কোন দিনই ভুলতে পারব না – পারব না।

লায়লা যুবাটির মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলল – দূর বোকা! আমরাও যে খুন হয়ে গেছি। আমরাও কি আর বেঁচে আছি না কি? খুনের বদলা খুন। আমরা বদলা নেব বলেই আজ রাস্তায় বেরিয়েছি। বদলা যদি না নিতে পারলাম তবে এ জীবনের দামই বা কি? আপনিও আশাকে উদ্ধার করে আনবেন এবং খুনের বদলা খুন করে তবে মরবেন। তার আগে যদি মরেন – তবে আপনি কাপুরুষ! এই জন্যেই তো আমি আর বিপ্লব আজ রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি – কোন বাধাই আমাদের আর ঠেকাতে পারবে না – । আমরা চলেছি – চলছি – চলব –; আজ পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, বন-জঙ্গল কোন কিছুই আমাদের রুখতে পারবে না – খুনের বদলে খুন, রক্তের বদলে রক্ত – অত্যাচারের বদলে অত্যাচার – এ আমাদের চাই-ই চাই।

লায়লা ওদের সেবা শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলল। নন্দিতা দিনরাত কাঁদে মা-বাবা ও আর সব আত্মীয় পরিজনের জন্যে। মাত্র এগার বছরের মেয়ে – তার কতটুকুই বা জ্ঞান হয়েছে যে এ হেন অত্যাচার ও বীভৎসতা সে সহ্য করতে পারবে? অতবড় ধনী পরিবার – যা ধনে-মানে-প্রাণে-গুলজার – সব যেন এক নিমেষে নস্যাৎ হয়ে গিয়ে প্রেতপুরী হয়ে উঠেছে। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেবল জীবিত একটি কাকা – অবিনাশ। অবশ্য লায়লা তাকে বোনের মত স্নেহ করে – প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সব দুঃখ ভুলিয়ে দিতে সব রকম চেষ্টা করে। লায়লা শিক্ষিতা, সুন্দরী আধুনিক। সে অন্ততঃ এটুকু জানে এমন অবস্থায় একজন শোকসন্তপ্তা বালিকাকে কেমন করে ভুলাতে হয় ও কোন কথা বললে তার মনের গতি বদলান যায়। এতে ঐ নন্দিতা কত উপকৃত হয়েছে। শোক-দুঃখ সব কিছু ভুলতে পেরেছে – কিন্তু অপর ধারে লায়লার হয়েছে মারাত্মক একটা পিছুটান। লায়লার অকপট বুকভরা স্নেহে নন্দিতা তাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভেবে – এবং তারই উপর ভরসা করে আবার সে বাঁচতে আগ্রহী হ'ল – শোক-দুঃখ ভুলে গেল। মুমূর্ষু ব্যক্তি অবিনাশ লায়লা ও বিপ্লবের সেবা যত্নে আবার খাড়া হয়ে উঠল – বুকে বল পেল। ওদের প্রতিটি যুক্তি ও চিন্তাধারার কথা শুনে বাঁচবার ইচ্ছা হ'ল। প্রতিশোধ নেবার আশায় সে আবার বাঁচতে চাইল। ঐ অবিনাশ আবার যেন ফিরে পেল তার নিজ হাতে হত্যা করা বোন অরুণাকে, আর সে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল হারান ভাইদের ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ বোধ। তাই অবিনাশ, লায়লা ও বিপ্লবকে বলেছিল, তোমরা যেন আমাদের ছেড়ে কোথাও কখনও যেয়ো না। তোমরা এখানেই থাকবে – আমাদের যা কিছু আছে – সবই তোমাদের। তোমরা আমার ভাই-বোন!

লায়লা ও বিপ্লব অবিনাশের এ কথা মেনে নিয়েছিল। সকলেই সর্ব্বহারা – নিঃস্ব এবং নির্যাতিত। সকলেরই লক্ষ্য এক – প্রতিশোধ। সকলেই একই পথের পথিক; এ যেন পান্থশালায় ক্ষণেকের জন্যে পথিকে-পথিকে মেলামেশা, আন্তরিকতা – তাই বলে ওদের চলার পথে যা-ই হ'ক না কেন, পথ চলা বন্ধ হয়নি।

অবিনাশ একদিন আব্দার করে লায়লাকে বলেছিল, দিদি যা কিছু করার তা – আমরাই করব, তোমাকে এর মধ্যে যেতে হবে না। তুমি আমাদের স্নেহের বোন হয়ে অন্তঃপুরে থাকবে। তুমি যা চাও তা আমরা প্রাণ দিয়েও করব।

এতে লায়লা হেসে বলেছিল, তাই কখনও হয় নাকি? দুধের স্বাদ কখনও ঘোলে মেটে কি? তোমরা তো সবই করবে – তা আমি জানি, তবু – আমি নিজ হাতে সেই বর্ব্বর অফিসারটাকে খুন না করা পর্য্যন্ত এবং আমাদের এই বাংলার মাটিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটাও পাকিস্থানী সৈন্য রয়েছে – ততক্ষণ আমি যে কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারব না ভাই – । এ আমাদের জীবনমরণ পণ। অবশ্য আমরা রাস্তায় যে দিন নেমেছি – সে দিন থেকেই জানি এ জীবন আর আমাদের নাই। এখন এ লায়লাকে যা দেখছ, এ যেন লায়লা নয়, এ লায়লা – এক অশরীরী প্রেতাত্মা। বাঙলা যদি আবার শত্রুমুক্ত করতে পারি তখন আবার নূতন লায়লা জন্মাবে –

অবিনাশ ও বিপ্লব লায়লার কথাগুলো সবই শুনছিল। অবিনাশ বলল, বেশ তো! ও খুব ভাল কথা – কিন্তু আমার মনে হয় – মেয়ে মানুষের আর ওসব ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।

অবিনাশের কথায় লায়লা হেসে উঠল। সে হাসি থামিয়ে বলল, ছিঃ! তোমরা মেয়ে মানুষকে এত ছোট ভাব, অসমর্থ ভাব কেন বুঝি না। তবে তোমরা যাই ভাব না কেন এ আমি হলফ করে বলতে পারি – তোমরা যা করবে আমি তা থেকে এক রত্তিও কম করব না।

তা অবশ্য হতে পারে – কম কেন, হয়ত অনেক বেশীই করতে পার। কিন্তু আমরা যে সর্বহারা হয়ে গেছি। আর কিছু হারানর কথা ভাবতেও পারছি না।

লায়লা বলল – তোমরা একদম পাগল হয়েছ। তা না হলে – যে সর্বহারা – সে কেমন করে বলে আর কিছু হারাতে চাই না –?

অবিনাশ বলল – দ্যাখ লায়লা, মানুষ যখন সর্বহারা হয়, তখন সে পায়ের তলার মাটিটাকেই ভাবে এই তো আমার সব। তেমনিই তুমিও আমাদের –

অবিনাশের কথায় লায়লা ক্রুদ্ধ ভাবে বলল, না –! আমি তোমাদের কেউ নই। আমি আগেই বলেছি না – আমি জীবিত নই। এ আমার ছায়া মাত্র। তোমরা যদি আর কখনও এমন সব কথা বল, তাহলে আমি তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াব। তোমরা পুরুষ না কাপুরুষ? যারা নিজের চোখে বর্ব্বর সৈন্যদের হাতে মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার দেখে – সোনার দেশকে শ্মশান হতে দেখে – এখনও স্নেহের কাঙাল, তারা পাগল, ভণ্ড, কাপুরুষ! ওদের সঙ্গে কথা কইতে লায়লা ঘেন্না করে। এই বলে লায়লা ঘৃণায় ঘরের মেঝেয় থুথু ফেলে নন্দিতার হাত ধরে অন্য ঘরে চলে গেল। পুনরায় ঘুরে এসে বলল, বিপ্লব – আজই তোমায় এখান থেকে চলে যেতে হবে। তোমায় যে কাজের ভার দিচ্ছি তা শেষ করে তবে আমার সামনে আসবে – তা যদি না পার, তা হলে আমি নিজে হাতে তোমায় খুন করব – মনে থাকে যেন – লুৎফা আর কাকলিকে ওরা যেমন করে মেরেছে – আমিও তোমাদের তেমনি সাজা দেব।

ওরা দেখছিল লায়লার চোখে তখন যেন আগুন জ্বলছিল।

কথাগুলো বলেই লায়লা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরে এসে বলল, যে ক'দিন বাঁচবে, বাঁচার মতই বাঁচবে, মরার মত বেঁচে কোন লাভ নাই – । বিপ্লব, তোমার কাজের ভার – দেশ জুড়ে সংগঠন ও সশস্ত্র বিপ্লবের নায়ক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া – আর অবিনাশ – তোমার উপর ভার, যোগাযোগ রাখা ও ওদের নির্দ্দেশ মত চলা।

তোমরা সংগঠন কর – লোককে বোঝাও অত্যাচারের বর্ব্বর কাহিনী – শুনিয়ে তাদের মনে আগুন জ্বেলে দাও। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় কর – অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের রণ শিক্ষা দাও – আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে একত্রিত করে রণোন্মাদে ঝাঁপিয়ে পড় ঐ পিশাচের দলের উপর। দেখা যাক, ইয়াহিয়ার – শক্তি কত। তোমরা সংগঠনে যদি কৃতকার্য না হও, তাহলে আমি গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যাব – লোককে বোঝাব – যুদ্ধ করব, প্রতিশোধ নেব, নেবই – এই কথাগুলো বলে লায়লা আবার বেরিয়ে গেল। ওরা দুজনেই যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলল।

তিন

বিপ্লব ও অবিনাশ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বুঝতে পেরেছিল-মেঘনা উপকূলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম হতে নোয়াখালি ও শায়েস্তাগঞ্জ পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লব করা প্রাকৃতিক দিক দিয়ে যত সুবিধা তেমনি আর একটা অসুবিধাও রয়েছে। পাকিস্থানী সৈন্যরা জলযানে মেঘনা ও পদ্মা এবং ওর উপনদীগুলো চষে বেড়াচ্ছে। এধারে চট্টগ্রাম হতে লাকসাম পর্য্যন্ত, নোয়াখালী হতে কুমিল্লা হয়ে শ্রীহট্ট ও লাতু পর্য্যন্ত এবং চাঁদপুর থেকে থেকে লাকসাম সব যোগাযোগের ও যাতায়াতের জন্যে রয়েছে রেলপথ, নদীপথ ও সড়ক। সুসজ্জিত মিলিটারীর যাতায়াতের অসুবিধা না করতে পারলে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান মুখের কথা নয়। ওরা ওই অঞ্চলগুলো ঘোরাঘুরি করে আর একটা বিপদের অঙ্কুর দেখতে পেলো। তা'হলে মুশ্লিম লিগের সমর্থক – (খাজা সাহেবের দল) ওরাও মিলিটারিদের থেকে কম ফেরোসাস নয়। ওরা মিলিটারির সঙ্গে যোগাযোগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দেখিয়ে দিচ্ছে, ইয়াহিয়া সরকারের কাছে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে – পাক ফৌজরা গ্রাম ও নগরের লোকজনদের হত্যা ও লুট পাট করে নিয়ে যাওয়ার পর যা কিছু পড়ে থাকছে ওরা তার ভাগ পাচ্ছে। বিপ্লব এটাও নিজ চোখে দেখেছে ঐ মির্জাফরের দল উল্লাসে উন্মত্ত, লুঠের মালের সঙ্গে সঙ্গে একাধিক হিন্দু মুসলমান বেগম যোগাড় করেছে ও করছে। এখন ওদের কাছে গোটা পূর্ববঙ্গটাই ভোগ্যবস্তু। এ যুদ্ধ শেষ না হওয়াই যেন ভাল। অবশ্য এর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা যে নাই তা নয় – তবে তা যেন খুবই সীমিত ও বিক্ষিপ্ত; শরতের ছেঁড়ামেঘের বৃষ্টি যেমন এ ঘরের চালে পড়ল অথচ ও ঘরের চালে পড়ল না এবং হঠাৎ এলো আর হঠাৎ চলে গেল, ও জলে গা-মাথা ভেজে কিন্তু মাটি ভেজে না – ঠিক তেমনই। একটা প্রবল পরাক্রান্ত মিলিটারী পাওয়ারের কাছে এ আর কতটুকু! রোখার মত রুখতে গেলে চাই গোটা দেশ জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লব এবং আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও সুপরিকল্পিত সংগঠন – সুষ্ঠু বন্দোবস্ত। তাই বিপ্লব ও অবিনাশ ঐ অঞ্চল থেকে খুব গোপনে বিপ্লবী যোগাড় করতে লাগল।

এধারে লায়লা ঐ বিশাল বাড়ীতে একা, নন্দিতাকে নিয়ে যেন কোন রকমে দিন কেটে যায় – ও হাঁপিয়ে উঠেছে। নন্দিতা না থাকলে ও বোধ হয় পাগল হয়ে যেতো। মাঝে মাঝে নন্দিতার হাত ধরে ও গ্রামে বেড়াতে বেরোত। পাড়াগাঁয়ের গেঁয়ো পরিবেশে বেড়াতে মন্দ লাগে না। কিন্তু জনমানবশূন্য দুপাশের আধপোড়া ও লুটপাট করা বাড়ী ঘরগুলোর মাঝ দিয়ে চলতে চলতে ওদের কি যেন এক আতঙ্কে গা ছম্ ছম্ করত। নির্জন পরিবেশের সুন্দরতা ওদের মনের কোণে যেন ম্লান ছায়াপাত করত।

সেদিন বিকালে একটু কালবৈশাখীর মত ঝড় জল হয়ে গেছে। রাস্তা গুলোর কোথাও কোথাও জল জমেছে। কোথাও বা কাদা। তাই লায়লা কিছুদূর গিয়ে নন্দিতার হাত ধরে আবার ফিরে এলো। বৃষ্টির ফলে ভিজে মাটির কেমন যেন একটা সোঁদা গন্ধের মিষ্টতা লায়লা অনুভব করছিল, আর তাতে ওর মনেপ্রাণে কি যেন এক অজ্ঞাত অনুভূতির সন্ধান হচ্ছিল।

লায়লা নন্দিতার হাত ধরে ফিরে এসে ওদের বেড়া ঘেরা ফুলের বাগানের খিড়কিটার বাঁধান ঘাটের দুধারের উঁচু রকে বসে পড়ল। ও যেন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

বৃষ্টিটা একটু আগেই হয়ে গেছে। হাওয়ায় দোদুল্যমান বাগানের সুন্দর সুন্দর ফুল ও কুঁড়ি হতে তখনও দু এক টুকরো জলের কণা ছিটকে ছিটকে পড়ছিল। সুন্দর শ্বেত পাথরের বাঁধান ঘাটের প্রশস্ত সোপানের উপর ঝরে উড়ে পড়া খড়কুটোর সঙ্গে কি যেন খাদ্যবস্তু আছে মনে করে তিন-চারটি কাঠবিড়ালি চিক্ চিক্ করতে করতে খড়কুটোগুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে কি যেন পাচ্ছিল আর দু'হাতে বেশ মজা করে খাচ্ছিল, কখনও কখনও বা তারা পরস্পর ঝগড়াঝাটিও করছিল। নন্দিতা ঘরে কি যেন খেতে গেছে। লায়লা তখন আধভিজে রকটায় সটান শুয়ে নিঃশব্দে মড়ার মত পড়ে থেকে কাঠবিড়ালিগুলোকে দেখছিল। আবার একটু যেন মদিরাচ্ছন্ন হাওয়ার জোয়ার বয়ে গেল। তাতে ঘাটের বকুল ফুল গাছটা

হতে কয়েকটা ফুল আর জলের কণা লায়লার গায়ের উপর পড়ল। এই দমকা হাওয়াটায় কাঠবিড়ালিগুলো ভাবল – হয়ত তাদের কেউ ধরতে আসছে। তাই তারা – ছুটে এধারে ওধারে পালাল ও আশপাশ থেকে চিক্ চিক্ করে ডাকতে লাগল।

লায়লা যেন আবার একা হয়ে পড়ল। সে আড়িমুড়ি ছেড়ে চিৎ হয়ে যেন গাছের পাতা গুনতে লাগল। তারপর চোখ বুজে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে দু চারটে বকুল ফুল যা পেল তা শুঁকতে লাগল এবং আবার চোখ খুলে মাথার উপর গাছটায় কাঠবিড়ালি উঠেছে কিনা দেখতে লাগল।

তখন সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন কিনা পশ্চিম আকাশে পাতলা ছেঁড়া মেঘের জন্যে তার আর বোঝার উপায় নাই। লায়লা তখনও ঠিক তেমনি ভাবেই শুয়ে। সে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে কি যেন একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে শুকতে লাগল। কোই এ পাতাটায় যেন কিছু গন্ধ নাই। লায়লার মাথার উপর একটা ডাল হতে একটা মাকড়শা সুতো কেটে কেটে নামছিল আর উঠছিল। ঝড়ে ওর জালটা বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে। মাকড়সাটা ওঠা নামা করতে করতে খপ করে লায়লার গায়ে পড়ল। লায়লা তখন ধড়ফড় করে উঠে – দাঁড়িয়ে কাপড় ঝাড়া দিতে লাগল। কিন্তু সে মাকড়শাটাকে আর দেখতে না পেয়ে ভাবল ও হয়ত তার কাপড়ে ঢুকেছে। তাই সে তৎক্ষণাৎ কাপড়টা খুলে ঝাড়া দিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে খুঁজতে লাগল। পরনের শায়াটাও ঝাড়া দিতে দিতে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আবার কাপড়টাকে উল্টোপাল্টে দেখে নিয়ে একটু পাশে সরে গিয়ে কাপড় পরতে লাগল। তার মনটা তখন খালি খচ্ খচ্ করতে লাগল, মাকড়শাটা গেল কোথায় –

নন্দিতা তখন ফিরে এসেছে। লায়লাকে ওভাবে খোঁজাখুঁজি করতে দেখে বলল, পিসীমা তুমি কি খুঁজছ?

একটা মাকড়শা গায়ে পড়ল তাই –

মাকড়শা? ওর রস গায়ে লাগলে গরল হয়। এই বলে নন্দিতাও খুঁজতে লাগল। নন্দিতা খুঁজতে খুঁজতে বলল, ঐ তো! ঐ মাকড়শাটা কি –?

লায়লা দেখে বলল, ঐটাই হবে বোধ হয় – এখানে তো একটা মাকড়শাই ছিল –

নন্দিতা বলল, এখানে আর থাকতে হবে না, হাতটা ধুয়ে নিয়ে ঘরে চল –

লায়লা বলল, সেই ভাল। এই বলে সে ঘাটে হাত পা মুখ ভাল করে ধুয়ে নিয়ে কাপড়ের খুট দিয়ে গা হাত পা মুছতে মুছতে বলল, কিন্তু এখন থেকে ঘরে গিয়ে করবই বা কি? একটা বইও নাই যে একটু পড়ব –

তা না থাক, আমায় গল্প বলবে। এই বলে নন্দিতা লায়লার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। লায়লাও উপরে গিয়ে খাবার-দাবার তৈরী করে নিয়ে উভয়ের খাওয়া-দাওয়া সেরে নন্দিতাকে গল্প বলতে বলতে ঘুম পাড়াতে লাগল- নিজেও শুয়ে পড়ল। ক্রমশঃ নন্দিতা তার গলাটা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। লায়লা লক্ষ্য করল, নন্দিতা তাকে ভাবে যেন সেই-ই তার জীবনের সব কিছু আশা ভরসা – যেমনি শিশু মাত্রেই তার মাকে মনে করে। সুখ-দুঃখ, আব্দার, স্নেহ, তাচ্ছিল্য সবই যেন মায়ের কাছে পাওনা। স্নিগ্ধ ফুলের মত সুন্দর নন্দিতা লায়লাকে পেয়ে যেন সব হারানোর ব্যথা ভুলে গেছে। তার পবিত্র মুখমণ্ডলে যেন এক কমনীয়তার দীপ্তি।

লায়লার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। নানা প্রকার ভাবনা চিন্তা ভারী জগদ্দল পাথরের মত তার বুকে যেন শত মন ভারী বোঝা হয়ে চেপে বসেছিল, তা সে শত চেষ্টা করেও যেন সরাতে পারছিল না। সে বারংবার নড়াচড়া করে ঘুরে ফিরে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সে চেষ্টা তার বৃথা। কিছুতেই ঘুম এলো না। মনে হতে লাগল এসময় বিপ্লব থাকলে বড় ভাল হ'ত। দুজনে পাশের ঘরের সেই বিছানাটায় শুতাম। বিপ্লব যদি কাছে শুত তাহলে সে নিশ্চয়ই এতক্ষণ লায়লাকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিত। খুব মজা লাগত তা হলে। আমি তখন যেন লজ্জা করে বলতাম, ছিঃ! বিপ্লব – একি করছ? তুমি কি ভুলে গেছ আমি এখনও তোমার বিবাহিত স্ত্রী নই? বিপ্লব তখন বলত, নাই বা হলে – তবু তুমি আমার জীবন সর্বস্ব।

আবার তখনই তার মনের গতি বদলে যায়। সে লজ্জায় আধখানা হয়ে পড়ে, এই সব অসংলগ্ন চিন্তার জন্য শত ধিক্কার দেয় নিজেকে। মনে মনে বলে – ইস্ আমি কি সাংঘাতিক ইতর হয়ে গেছি। এই কি আমার প্রকৃত রূপ! ভাবতেও যেন ঘেন্না লাগে! আর বিপ্লবের সম্বন্ধেও আমি ঐ সব কথা ভাবলাম কেমন করে? বিপ্লব কি সেই ছেলে যে – যৌবনের উত্তেজনায় যা করবার নয় তাই-ই করে বসবে? কখ্খনো না। বিপ্লব যদি আমার মনের কথা জানতে পারে – তাহলে আমায় কি ভাববে? না-আর ভাবা যায় না। ছি! আমি কত নীচে নেমে গেছি। তাহলে ইয়াহিয়ার সৈন্যগুলো থেকে আমাদের তফাৎটা কিসের? ওরা পশুশক্তির সুযোগ নিয়ে করে বর্বরতা – আর আমি খেয়ালের বশে মনে প্রাণে করি অন্যায়-অনাচার – ইস্ ঘেন্নার কথা!

লায়লা আবার তখনই ভাবে – নাঃ – এমন অন্যায় চিন্তা আমি আর কখ্খনো করব না। আমায় প্রতিশোধ নিতেই হবে। লুৎফা – আমার বাবা-মা-কাকলি-ডাক্তার – এদের কথাতো ভুললে চলবে না। ওদের রক্তের ঋণ শোধ করতেই তো আমার এখনও বেঁচে থাকা। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে লায়লার ঘুম পায়। সে ঘুমের ঘোরে দেখতে পায় এক সশস্ত্র বিপ্লব। তাতে লক্ষ লক্ষ বাঙালী তরুণ-তরুণী আধুনিক অস্ত্র নিয়ে ইয়াহিয়ার সৈন্যদের আক্রমণ করছে, তাদের মেরে শেষ করে দিচ্ছে। বিপ্লব সেই মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা করছে। তারপর রণাঙ্গন থেকে সেই মেজরটাকে ধরে বিপ্লব লায়লার কাছে নিয়ে এলো। লায়লা ক্যান্টনমেন্টের সব তাঁবু ও ঘরগুলো হতে সব বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিল।

কোথা থেকে কাকলি ছুটে এসে বিপ্লবকে জড়িয়ে ধরল – তারপর ওরা একটা জিপগাড়ী করে যেতে যেতে জিপটা একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা মারল – আবার সবাই জ্ঞান হারালো – রক্তে জায়গাটা ভেসে গেল – কে যেন বিপ্লবকে জিপের তলা থেকে তুলে নিয়ে এলো – সে তখন গায়ের ধূলো ঝাড়ছে – ।

এইব অসংলগ্ন স্বপ্নের মাঝখানে কারা যেন দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল – লায়লা – ও লায়লা –

স্বপ্নের ঘোর কাটতেই লায়লার বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল। সে খুব ভয়ে ভয়ে বিছানায় উঠে বসে চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে লুৎফা ও কাকলিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

তার মনে তখন নানারূপ চিন্তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সে যেন বেশ পরিস্কার শুনতে পেল কারা তার নাম ধরে ডাকল এবং দরজায় ধাক্কা দিল। এক অজানা আতঙ্ক ও অনুভূতিতে তার সর্বশরীরে যেন এক তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল, ঘামে কাপড় জামা ভিজে উঠল এবং উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, তার নাম ধরে ডাকাটা এবং দরজায় টোকা মারাটা সত্যি কিনা পরখ করার জন্যে। কিন্তু আর কোন সাড়াশব্দ না হওয়ায় ভাবল হয়তো ওর মনের ভুল, আসলে তাকে কেউ ডাকেই নাই বা দরজায় ধাক্কা মারে নাই। তাই হাতে মুখে জল দিয়ে এক গেলাস জল খেয়ে আলো কমিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

তবু কিছুতেই ওর ঘুম আসছিল না। অনেক চেষ্টা করল ঘুমোবার – মনে থেকে সব ভাবনা চিন্তা দূর করে দিতে হাজার বার চেষ্টা করল। কিন্তু যে ভাবনা ওর ভাবরাজ্যে দুষ্টক্ষতের মত দাগ কেটে বসে রয়েছে তা ধোয়া মোছা অত সহজ নয়। লায়লা ভাবল এই সময় একটু ব্রাণ্ডি অথবা ব্রোমাইড পেলে সে খাসা ঘুমোতে পারত। কিন্তু তা আর পাবে কোথায়? সব নাগালের বাইরে –

আবার তার মাথায় নানা প্রকার জটিল চিন্তা জঞ্জাল স্তুপের মত যেন গজ-গজ করতে লাগল। আবার তার ভরা যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ তাকে দুর্নিবার আকাঙ্খার বারবাবহ্নিতে নিক্ষিপ্ত করল। সে ভুলে যেতে চাইল সব কিছু, একমাত্র তার প্রবল কামনার মদিরাচ্ছন্ন আবেশে সে তখন মাতাল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। লায়লারও যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল। বিপ্লব ও অবিনাশ দুজনেই কয়েকটি লোকজন নিয়ে লায়লাকে ডাকতে লাগল এবং দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

লায়লা ঘুমের ঘোরেই ভাবতে লাগল, এও হয়ত তার মনের ভুল। কিন্তু ডাকাডাকি ক্রমশঃ উচ্চরোলে উঠতে ও আওয়াজ চিনতে পারল – বিপ্লবের গলাই বটে। তখন সে দরজা খুলে দিল।

বিপ্লব কয়েকটি লুঙ্গি পরা যুবাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, লায়লা তুমি এখন শুয়ে পড় গে, আমরাও খুবই ক্লান্ত – শুয়ে পড়ছি, কাল সব কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হবে।

অবিনাশদের একটি বড় হল ঘরে একটা আধপোড়া শতরঞ্চি পেতে প্রায় আট দশটি যুবক – অবিনাশ ও বিপ্লব এক গোপন পরামর্শ সভা আরম্ভ করল। লায়লা চাট্টি চাল ভেজে নুন লঙ্কা দিয়ে ওদের খেতে দিল এবং চা দিল।

তখন খানিকটা বেলা হয়ে গেছে।

ওরা সবাই গ্রাম্য যুবক, কেউ শিক্ষিত – কেউ বা অর্দ্ধশিক্ষিত, আবার কেউ বা নিরেট মূর্খ – চাষী। এদের মধ্যে একটি যুবা ছিল তাকে দেখে মনে হয় যেন সহর ঘেঁষা চৌকস ছেলে, চোখে মুখে বুদ্ধির সঙ্গে যেন আর একটু কি মেশানো ছাপ রয়েছে। ছেলেটির নাম জব্বর খাঁ – পরনে ফিকে সবুজের টাইট প্যান্ট, গায়ে লতাকাটা টি শার্ট। ছেলেটি বলিষ্ঠ যুবক, শ্যামবর্ণ, তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে – লম্বা জুলফির সংযোগ। সে বেশ স্মার্ট – কথায় যেন খই ফোটে। কোন বিষয় আলোচনার আগেই সে দুমদাম কথা বলে ফেলে – তার অর্থ যেন, সে সব পারে এবং সব জানে। সে ইচ্ছা করলে ইয়াহিয়ার সৈন্যগুলোকে একদিনে মেরে ধরে শেষ করে দিতে পারে – ।

ওদের গোপন সভার কাজ শুরু হয়ে গেল। লায়লার গত রাতে ভাল ঘুম না হওয়ার জন্যে একেবারে স্নানটা সেরে নিয়েই ভিজে চুলগুলো পিঠে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। তার পরণের কাপড়টা ক'দিন ধরেই কাচা হয় নাই। তাই সেটি কেচে দিয়ে পরবার আর কিছু না থাকায় একটা ছোট আধপোড়া ও ময়লা শাড়ী বোধ হয় অবিনাশদের ঝিএর কাপড় হবে পরে এসে বসেছিল। ওর ব্লাউজ শায়া আর না থাকায় এবং অবিনাশদের বাড়ীতেও আর না পাওয়ায় ওকে বাধ্য হয়েই ঐ বেশে সভায় যোগদান করতে হয়েছিল। তার শাড়ীটা এত ছোট যে হাঁটুর নিচেয় নামে না–আর একবার মাত্র টেনেটুনে বুকের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পিছনের কোমরে গোঁজা চলে। তাও কাপড়টা বড় জ্যালজেলে। কিন্তু এই সামান্য শাড়ীটা পরেও লায়লাকে যেন আরও বেশী মানাচ্ছিল। ওর মত সুন্দরী, তিলোত্তমাকান্তি নারী – তার নয়নাভিরাম কান্তি হতে ওর পূর্ণ যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ যেন ওর দেহ–মন ছাপিয়ে বেরিয়ে আসছে – তখন ঐ লায়লাকে ঐ বেশে দেখতে ঠিক যেন স্বর্গের মেনকার মতই দেখাচ্ছিল। ওকে দেখে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, দেবরাজ ইন্দ্রেরও মতিভ্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মানুষতো থো চিরকালই সুন্দরের পূজারী। এ পৃথিবীতে সুন্দরতর যা কিছুই আছে তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ দুর্নিবার। এ নিয়ম যে স্বর্গে–মর্ত্তে–পাতালে সর্বত্রই প্রচলিত। তাই ধ্যানমগ্ন মহামুনিদের হয়েছে পতন, দেবাদিদেব ইন্দ্রের হয়েছে পদস্খলন, যুগ যুগান্ত ধরে গড়ে উঠেছে আনন্দ ও কান্নার স্মৃতিসৌধ – উত্থান পতনের ভিত, ন্যায় অন্যায়ের ঘাত–প্রতিঘাত – শক্তিমান ও দুর্বলের ঘাত সংঘাত। এ যেন অমোঘ বিধান।

লায়লা ও বেশে – ঐ সভায় আসতে একটু কিন্তু কিন্তু করছিল। কিন্তু না এসে উপায়ই বা কি? আজ ও যে পথে নেমে এসেছে ও–পথে অত বাছবিচার করা উচিত তো নয়ই বরং অন্যায়। তাছাড়া আসল লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে রাস্তা যত দুর্গমই হোকনা কেন – গায়ে যতই কাদাই লাগুক না কেন – বন ও কাঁটা–ঝাড়ে গা–হাত পা যতই ছিঁড়ে রক্তারক্তি হোক না কেন, আকাঙ্ক্ষিত যায়গায় পৌঁছাতে পারলেই হ'ল। ওর একমাত্র লক্ষ্য প্রতিশোধ! যতক্ষণ না ও প্রতিশোধ নিতে পারছে ততক্ষণ ওর শান্তি নাই, আর তার জন্যে যদি এ দেহটা শিয়াল কুকুরের মুখে বিলিয়ে দিতে হয়, তাও দেবে – ও দিতে প্রস্তুত; এই বেশে সভায় আসা তো তুচ্ছ কথা।

লায়লা আসন গ্রহণ করে আসন গেড়ে বসল একপাশে। শাড়ীটা বড্ড ছোট – টান্‌টান্‌। তাই সে বারংবার দুই হাঁটুর মাঝখানের কাপড়টা নামিয়ে দিতে দিতে বলল, সুরু করুন আপনারা – আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই বলে ও যেন আরও কিছু বলতে চাইছিল – কিন্তু ওর মনটা বারংবার খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল – শাড়ীটা আর একটু বড় হলে যেন খুবই ভাল হত। তাই সে আর একবার নড়ে চরে বসে যখন দেখল ঐ ছোট্ট কাপড়টায় লজ্জা সরম ঢাকা পুরোপুরি সম্ভবপর নয়, তখন সহসা উঠে গিয়ে নিজের ভিজে জামা কাপড়গুলো পড়ে এসে সভায় যোগদান করল।

তখন ওদের আলোচনা পুরোপুরি চলছে। বিপ্লব একটা বক্তৃতা দিয়েছিল বাংলার বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থা বর্ণনা করে – মিলিটারীদের অমানুষিক অত্যাচার বর্ণনা করে – ও কি করতে হবে না হবে এবং উচিৎ অনুচিৎ সব ব্যাখ্যা করে। তাতে প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, সকলেরই তাজা রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠেছিল প্রতিশোধ নেবার লালসায়। এরপর লায়লা উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, প্রতিটি অত্যাচারের কাহিনী; উদাহরণ দিয়ে। ও বলেছিল, ভাই সব – আমরা এ অত্যাচার কোন মতেই সইব না – আমরা প্রতিশোধ নেবই নেব, মরে যাব – মাটির সঙ্গে মিশে যাব – সেও ভাল তবু প্রতিশোধ আমাদের চাইই-চাই; আপনারা সর্বত্র, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে, প্রতিরোধ সভা গড়ে তুলুন, মুক্তিফৌজ গড়ে তুলুন, পাশবিক বর্ব্বরতার প্রতিবিধান করুন – অন্যায়ের সমুচিত জবাব দিন। প্রতিটি গ্রামে গোপন সংগঠন গড়ে তুলুন। মানুষ জন্মালে তাকে মরতেই হবে – সুতরাং প্রতিটি মরণের পিছনে যেন সার্থকতা থাকে, আমাদের কুকুর-শিয়ালের মত মরলে চলবে না – আমরা বাঙালী, আমরা বীর – 'চির উন্নত শির – ।' আপনারা ভুলবেন না – আমাদের বঙ্গ জননী আজ শৃঙ্খলিতা – ধর্ষিতা – আমরা তারই ছেলে-মেয়ে হয়ে এ অপমান কিছুতেই সইব না – তার শৃঙ্খল মোচন করবই – করব; এ আমাদের জীবন মরণ পণ – আমরা আজ এ সভায় পণ করলাম – দেশ মাতৃকার জন্য – আজই এইক্ষণে এই জীবন উৎসর্গ করলাম – ।

লায়লার বক্তৃতার শেষে প্রত্যেকেই হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করল, সমস্বরে চিৎকার করে উঠল – পণ করলাম, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিলাম –; জয় বাংলা মাঈ কি-জয় –।

লায়লা শেষে বলেছিল, আমরা শীঘ্রই – অস্ত্র শস্ত্র ও লোকজন ঠিক করে নেব এবং কি ভাবে আমরা যুদ্ধ করব ও কি কি করব – তা গোপন বৈঠক ডেকে ঠিক করে নেব এবং আর আর যা করণীয় আছে তাও করব। আপনারা কেবল সংগঠনের দিকে জোর দিন। কারণ, একতাই একমাত্র বল। যদি আমাদের একতা থাকে তাহলে সমগ্র পৃথিবী আমাদের পদদলিত করতে চাইলেও তা পারবে না, আমরা জিতবই জিতব।

সেদিনকার মত ওদের সভা ভেঙ্গে গেল। যে যার বাড়ী চলে গেল। কেবলমাত্র জব্বর যেতে পারল না – সে বলল, তার শরীর খুব খারাপ, আজ সে এখানেই থাকবে।

বিপ্লব লায়লাকে বলেছিল, জব্বর খুব বুদ্ধিমান ও কর্মঠ। ও থাকলে তাদের বিপ্লব সফল করার ও প্রতিশোধ নেওয়ার অনেক সুবিধা হবে।

লায়লা জব্বরকে দেখে মনে মনে কি যেন ভেবে নিল। তারপর বলল, বেশতো থাকুক না –

বাঙলাদেশের দিন দিন অবনতি ঘটছে। পশ্চিম পাকিস্থান থেকে প্রচুর সমরাস্ত্র – আকাশ যান – জলযান – স্থলযান – মায় ট্যাঙ্ক, মাইন, কামান, গোলাগুলি সবকিছু প্রচুর পরিমাণে এসেছে এখানে, আরও আসছে। বালুচ ও পাঞ্জাবী সৈন্য নেমেছে কয়েক ডিভিশন। পশ্চিমী সমর-নায়কদের ধারণা ছিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা গোটা পূর্ব্ববঙ্গটাকে আওতায় আনতে পারবে এবং ওখানকার বিপ্লবও বিপ্লবীদের ধ্বংস করে আগেকার মতই রাজ্য চালাতে পারবে। কিন্তু কয়েক দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়েও যখন দেখা গেল, 'পুলিশ', 'East Bengal rifles' এবং 'আন্সার' বাহিনী সকলেই সরকার পক্ষ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে যুদ্ধে প্রস্তুত হয়েছে – এবং মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেও কোন ফল হ'ল না, যেন লক্ষ লক্ষ মুজিবুরের কণ্ঠ জীমূত মন্দ্রে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল, তখন ইয়াহিয়ার বাহিনী ব্যাপক ভাবে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, পাশবিক বর্বরতায় মেতে উঠল। কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল, এই ধ্বংসলীলা দেখে হয়ত সাধারণ মানুষ ভড়কে যাবে এবং মুজিবের পক্ষ ত্যাগ করে তাদের পক্ষ গ্রহণ করবে। শুধু তাই নয়, ওরা বাছা বাছা নেতাগুলোকেও ধরবার চেষ্টা করতে লাগল এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উপর আরও সীমাহীন অত্যাচার চালাতে লাগল। যে অত্যাচারের বর্ণনা করবার ভাষা মানুষের জানা নাই, পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় এই অত্যাচারের নারকীয় কাহিনী গোটা ইতিহাসকে পৃথিবীর মনুষ্য সমাজ ও সভ্যতাকে কালো করে রেখে দেবে চিরদিন।

সেনাবাহিনীর অত্যাচার যতই প্রবল হতে প্রবলতর হতে লাগল, জনসাধারণও ততই সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাতে লাগল, প্রাণ বাঁচানর তাগিদে আশ্রয় নিতে লাগল ভারতভূমিতে। ওরা তখন সর্বহারা – স্বজনহারা, ভবিষ্যৎ হারা – । হাজারে হাজারে – কাতারে কাতারে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানুষ চলেছে বাঁচার আশায়।

জব্বরের খুব জ্বর। তার জ্বর কমার কোন লক্ষণ না দেখে বিপ্লব অবিনাশকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় লায়লাকে বলে গেল, জব্বরের সেবা শুশ্রুষা করে সারিয়ে তুলতে। সে দু-তিন দিনের মধ্যেই ফিরবে।

লায়লা যথা সম্ভব জব্বরের সেবা শুশ্রুষা করতে লাগল অকপটে। ও দেশে তখন ডাক্তার ছিল না, তাই – সে শিউলি ও বেলপাতার রস করে এনে ওকে রোজ সকালে খাওয়াত। এতে তিন দিনের দিন জব্বরের জ্বর ছেড়ে গেল।

লায়লা ঠাণ্ডা জল এনে ওর মাথা ধুয়ে দিল, গরম জলে গামছা ভিজিয়ে ওর গা স্পঞ্জ করে দিল এবং সাগু খাইয়ে দিল।

জব্বর একটা ড্রেন পাইপ প্যান্ট ও টি সার্ট পরে এসেছিল। কিন্তু জ্বর অবস্থায় ঐ পোষাক পরে থাকা মুস্কিল। লায়লা-সেই ছোট্ট শাড়ীটা ওকে পরতে দিয়েছিল। ঘরে আর এমন কোন কাপড় ছিল না যে ওকে কাপড় বদলে দেওয়া যায়।

ভর্ত্তি দুপুর বেলা, সেদিন রোদটাও যেন প্রচণ্ড। আগের দিন বৃষ্টি হওয়ার জন্যে বাইরে যেন একটা ভ্যাপসা গরম, ঘরেও তাই, হাওয়ার নাম গন্ধ নাই। লায়লা নিটোল স্বাস্থ্যবতী তরুণী, সাগু করতে করতে ঘামে নেয়ে উঠেছে। কয়েকটা কুঞ্চিত কেশ কপালের উপর ঘামের সঙ্গে বসে গেছে। ব্লাউজের বগল দুটো ঘামে ভিজে গেছে, কোমর হতে অনেকটা নিচের দিকে সায়া ভিজে কাপড় ফুঁড়ে ঘামের দাপট বোঝা যাচ্ছে, গলায় তখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝড়ে পড়ছে।

লায়লা সাগু নিয়ে জব্বরের ঘরে ঢুকে ওকে উঠাল। বলল, নিন্ উঠুন – সাগু খেয়ে নিন। এখন দেখে মনে হচ্ছে যেন জ্বরটা ছেড়ে গেছে। এই বলে লায়লা ওর গায়ে আঙুলের উল্টো দিকগুলো রেখে দিয়ে জ্বর পরখ করতে লাগল। জব্বরের তখন জ্বর বড় একটা ছিল না, তবে – ধাতে যেন একটু জ্বর জ্বর ভাব হয়ত ছিল। জব্বর সহসা লায়লার হাতটা টেনে ধরে বলল, আপনি আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন, বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।

লায়লা আর কোন কথা না বলে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগল। একটু পরেই জব্বর বল্লে, দেখুন, আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না! আপনি এখান থেকে চলে গেলে আমি মরে যাব – আপনি দয়া করে যাবেন না – আপনাকে কিছুতেই আমি যেতে দেব না – । এই বলে জব্বর লায়লার হাতখানা তার নিজের বুকে চেপে ধরল।

লায়লা বলল, না-না, আমি আবার যাব কোথায়? আপনি সাগুটা খেয়ে নিন – নন্দিতা ভাত না খেয়েই ঘুমিয়েছে। ওকে উঠিয়ে খাইয়ে দিয়ে নিজেও খাব। তারপর আবার আমরা আসব – তার আর কি আছে!

কিন্তু জব্বর লায়লার এ সমস্ত কথা বোধ হয় শোনে নাই। সে সহসা লায়লার হাত দুটো ধরে – জোরে টান দিয়ে তাকে বুকের উপর টেনে নিল। লায়লা ঐ খাটে পা ঝুলিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এমন অবস্থায় ছোট ছেলেতে টানলেও মানুষ পড়ে যায়। লায়লা তাই জব্বরের বুকের উপর পড়ে গেল। জব্বর তার সবল বাহুর বন্ধনে তাকে বুকের সঙ্গে গায়ের জোরে ধরে রইল এবং তার মুখে মুখে লাগানর জন্য চেষ্টা করতে লাগল। লায়লার সমুন্নত বক্ষের নিষ্পেষণে জব্বরের ধমনিতে তাজা রক্তে যেন আগুন ধরে গেল। সে লায়লাকে খাটে তুলে নেবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল – কিন্তু লায়লার গায়েও শক্তি কম নয়। লায়লা তাকে এক ধাক্কায় ছাড়িয়ে দিয়ে মেঝেয় দাঁড়াতেই সাগুটা পা লেগে পড়ে গেল। সে বলল, এখন তো বেশি জ্বর নাই, এ সময় মাথার গোলমাল হওয়া তো অনুচিৎ। সাগুটা পড়ে গেল তো! এইবার কি খাবেন? আমি আর পারছি না –! লায়লা আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না। লজ্জায় তার যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল। তার থেকেও বেশি লজ্জিত হয়েছিল জব্বর।

লায়লা সারাদিন আর ও ঘরে যায় নাই। সে ভেবেছিল জব্বর একটা ইতর প্রকৃতির ছেলে। কিন্তু ও মনে মনে অনুভব করল, যৌবনের ভরা জোয়ারে মানুষ জ্ঞান-গম্যি স্থানকাল অনেক সময় ভুলে যায়। তাই বলে জব্বর পরনারীর উপর এমন ধারা অনধিকার নির্লজ্জ ব্যবহার করে কেমন করে? ঐ ছেলে দেশের কাজ কি করবে? এসব ওর ভাঁওতা – ভিতরে ওর ঐ রূপ – উপরে লোক দেখান দেশ সেবা।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নন্দিতা বলল, জব্বর কাকার গাটা খুব গরম।

লায়লা ওর ঘরে গিয়ে দেখল, জব্বর অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সাগুটা মেঝেয় খানিকটা পড়ে আছে – আর সামান্য একটুখানি বাটীতে যা আগে লেগে ছিল ঠিক তেমনটিই রয়েছে। জব্বর আর ওঠেও নাই, খায়ও নাই। তখন লায়লার মনটা যেন একটু স্নেহার্দ্র হয়ে উঠল। সে নন্দিতার হাত ধরে ওর বিছানার কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখল – গা-টা যেন একটু গরম গরম মনে হচ্ছে, তখন ওর মনে হল – ও যেন ওর উপর বড্ড অবিচার করেছে। আহা – বেচারা সারাদিন কিছু খায় নাই। যতই হোক, ও তো একটা রুগী! ওর কি এখন আর কোন জ্ঞান-গম্যি আছে?

লায়লা তখন ওকে ওঠাতে লাগল। বলল, উঠুন যাই হোক একটু কিছু মুখে না দিলে বাঁচবেন কি করে? শরীর যে শুকিয়ে তালপাতা হয়ে যাবে-।

জব্বর ঘুরে শুয়ে একটু তাকাল। তখন তার চোখ দুটো যেন লাল হয়ে উঠেছে। ও বলল, আমি কিছু খাব না। আমার একদম খিদে নাই।

কিন্তু লায়লা কিছুতেই ছাড়ে নাই। আবার নতুন করে সাগু তৈরী করে ওকে খাইয়েছে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সেবা শুশ্রূষা করেছে – ।

খানিক রাতে জব্বরের জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর ওর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আর কিছুতেই ঘুম আসে নাই। ওর মাথায় তখন দুনিয়ার ভাবনা জট পাকাচ্ছিল। লায়লাকে ও কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। ও জানত লায়লা বিপ্লবের বাগদত্তা স্ত্রী। কিন্তু তা হতে দিলে হবে না। লায়লাকে তার চাই-ই – । যতই হোক লায়লা তো মুসলমান কন্যা। – ওকি বিপ্লবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছে, না পারবে? এ হয় না। লায়লা তা কখনও পারবে না। সময়ের দোষে ও এখন মোহান্ধ হয়ে বিপ্লবকে ভাল বেসেছে। কিন্তু ও ভালবাসার কি দাম আছে? লায়লা তো তাকেও ভাল বেসেছে! তা যদি না বাসত তাহলে ও লায়লার উপর আজ যা করেছে – তাতে লায়লা তার জুতো দিয়ে ওর মুখটা ভেঙ্গে দিত। অতএব এটা জলের মত পরিষ্কার – লায়লা তাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে ভাল বাসেই বাসে। মেয়েছেলেদের অমন একটু লজ্জার ভান না দেখালে চলে না, নাকঝাড়া একটু দিতেই হয়।

কয়েকদিন পরে জব্বর সুস্থ হয়ে লায়লাকে বলেছিল – সে সংগঠন আরও জোরদার করে সশস্ত্র তরুণ বিপ্লবী সংগ্রহ করে তবে লায়লার কাছে ফিরবে। পাকিস্থানী ফৌজের হাতে দেশ ও দশের যা ক্ষতি হয়েছে – বিশেষ করে লায়লাদের, সে ক্ষতির পুরোপুরি উসুল না তোলা পর্য্যন্ত জব্বর কঠিন হস্তে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে – এ তার জীবন মরণ পণ, তাতে যদি মরতে হয় সেও আচ্ছা –। এই কথাগুলো বলে জব্বর চলে গেল।

লায়লা ভাবছিল, ছেলেটি অদ্ভুত তো! ঐ রকম না হলে কখনও দেশের কাজ হয় না কি? ইয়াহিয়া সৈন্যদের ঠিক ঠিক জবাব দিতে গেলে ঐ রকম তেজস্বী তরুণের দলই তো চাই। কিন্তু সেদিন ও অমন ধারা অসভ্যপনা করল কেন? ও মনে হয় জ্বরের ঘোরের জন্যে। যারা দেশকে ভালবাসে যাদের মান-অপমান জ্ঞান আছে – তারা ঐ ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটাকে কখনই প্রাধান্য দিতে পারে না, আর যদি অমন ধারা কোন ঘটনা ঘটেই যায় – তা নেহাতই সাময়িক – ; তা দিয়ে তার চরিত্র এবং প্রকৃতির বিচার করা যায় না, যেতে পারে না –। এটা নেহাতই মামুলি ব্যাপার, যেমনি পরিস্কার মানুষের গায়ে ধুলো কাদা লাগা –। তাই জব্বর যাবার পর হতে – তার কৃষ রুগ্ন মুখখানি লায়লার হৃদয়ে বারংবার উঁকি-ঝুঁকি মারতে

লাগল, ওর মনে হতে লাগল – আহা যদি আর একটু সেবা শুশ্রুষা করতাম – তাহলে হয়ত ছেলেটি এত দুর্ব্বল হ'ত না –; আমি আমার কর্ত্তব্যে ত্রুটি করেছি – এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে লায়লার মনটা অবিরত খচ্ খচ্ করতে লাগল।

বিপ্লবরা ফিরেছিল অনেক রাত্রে। ঘরে ঢুকেই একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তির কাঁধে হাত দিয়ে লায়লাকে দেখিয়ে বলেছিল, লায়লা – এ আমার বন্ধু নুরুল ইসলাম। মৌলানা ভাসানীর দলের লোক। এরা মুজিবের ঐ আইন সিদ্ধ ভোট আর তার জয় পরাজয়ের ধার ধারে না – নুরুল ইসলাম বলেছিল, ভাসানী সাহেব বলেছিলেন তোমরা জান না- – ঐ পশ্চিম-পাকিস্থানী কর্ত্তারা কোন দিনই আমাদের হাতে ক্ষমতা দেবে না; – ওরা আমেরিকার দালাল, আমেরিকা গোষ্ঠীর কাছে ধার করা অস্ত্রে ওরা গুদাম ভর্তি করে রেখেছে, তা নির্বিচারে চালাবে সাড়ে সাত কোটী বাঙ্গালীর উপর। তোমরা তৈরী হও, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু মুজিব গোষ্ঠী পৃথিবীর লোককে দেখাতে গেল, 'দ্যাখ আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ।' কিন্তু আজ এ পৃথিবীর কোন্ মানুষ দেখল মুজিবের এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা? বরং নানান দেশ ঐ বর্বর পশু নর-খাদক ঘৃণ্য কুকুর ইয়াহিয়াটাকেই অস্ত্র দিল, জাহাজ দিল, সব কিছু দিয়ে তার হাত আরও শক্তিশালী করে দিল এই সাড়ে সাত কোটী বাঙালীকে নিঃশেষ করে দেবার জন্যে। কোথায় এ পৃথিবীর বিবেক? কোথায় মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য? কোথায় ন্যায়ের প্রতি সমর্থন? তাই বলছি আপনারা নিজেদের শক্তি দিয়ে যদি নিজেদের রক্ষা করতে না পারেন, তবে আপনি মরুন, আপনি কুকুর শিয়ালের মতই মরুন – আপনার মরণে কেউ একবিন্দুও চোখের জল ফেলবে না। তাই আমরা নিজের বাহুর বলে বলীয়ান হতে চাই – নিজের শক্তি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চাই – আপনারা তৈরী হ'ন।

নুরুল ইসলাম এইসব কথাগুলো তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলে লায়লাকে বলল, বোন, তুমি ভাবতেও পারবে না – আমাদের উপর কি ভয়ানক অত্যাচার হয়েছিল – এখনও হচ্ছে। সে সব যদি তুমি নিজ চোখে দেখ তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা যাবে। এস আমরা সকলে মিলে বলি – 'জয় বাংলা' – 'বাংলার বাঙ্গালী এক হও' – 'ইয়াহিয়ার বর্বর হাত গুঁড়িয়ে দাও – গুঁড়িয়ে দাও।'

নুরুল ইসলামের বজ্র হুঙ্কারে গোটা ঘরটা যেন থর থর করে কাঁপতে লাগল।

লায়লা বলল – ভাইজান, আপনি বড় ক্লান্ত – আগে একটু সুস্থ হ'ন, কিছু খেয়ে দেয়ে নিন, তারপর সব শুনব – যা করতে বলবেন – করব। খালি আমাদের লক্ষ্য হবে প্রতিশোধ – যেমন করেই হোক সেই নরখাদক ইয়াহিয়ার হাত গুঁড়িয়ে দিতেই হবে।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। নন্দিতাকে খাইয়ে দাইয়ে লায়লা ঘুম পাড়িয়েছে। ওরাও খেয়ে দেয়ে বারান্দায় একটা মাদুর পেতে দু'জনার বসে গল্প শুরু করল। বিপ্লব ভাবল, লায়লা এখন যেন বেশ খানিকটা প্রকৃতিস্থ হতে পেরেছে, ওর মনটা যেন আর ততটা উড়ু উড়ু করে না – ততটা আর যেন অস্থিরতা নাই। ওর আধখানা মুখে রেলিং এর ফাঁক দিয়ে আসা জ্যোৎস্নার টুকরোগুলো পড়ে বেশ আবছা আবছা দেখাচ্ছিল।

লায়লা বলল,তাহলে অবিনাশদা কবে ফিরবে?

বিপ্লব একটা সিগারেট ধরিয়ে আরামে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল – তা কি বলা যায়? অস্ত্র-শস্ত্র পেয়ে গেলেই চলে আসবে।

কি অস্ত্র?

রাইফেল, ষ্টেনগান, মেসিনগান, মর্টার, গোলাগুলি – যা কিছু পাবে সবই নিয়ে আসবে।

পাবে তো আবার –?

তা-তো বলতে পারি না, তবে পাবার চেষ্টা করতে হবে-এই পর্য্যন্ত। আমার ধারণা – বিশ্ববিবেক ক্রমশঃ জাগ্রত হচ্ছে। যারা মানুষ, তারা চাইবে আমাদের সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে। তাই, বোধ হয় পেতে পারে।

কি করে গেল? কোন দিকে গেল –? কে কে সঙ্গে গেল?

গিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ জন। কথা তো ছিল যে ভাবেই হোক ওরা সাতক্ষীরা ও রায়মঙ্গল নদী ধরে যাবে। তবে রাস্তায় যদি অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন এবং বিপদ দেখে – তাহলে ওরা ওদের প্রোগ্রাম বদলে নেবে। যাই হোক – যেমন করেই হোক – ওরা সীমান্ত পেরিয়ে যাবে এবং ভারতে গিয়ে সেখানে থেকে অস্ত্র-শস্ত্র আনবেই।

লায়লা সানন্দে বলে উঠল, তাই না কি? তা হলে তো খুব ভাল হবে। এই বলে লায়লা বিপ্লবের আর একটু কাছে সরে এসে ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, আচ্ছা বিপ্লব, আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র গুলো এসে গেলে আমরা জিতে যাব না?

বিপ্লব সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে বলল, তা আবার যাব না? নিশ্চয়ই জিতব। একটা গোটা দেশের সঙ্গে ঐ পাকিস্থানী সৈন্যরা যুদ্ধ করে এঁটে উঠতেই পারবে না।

লায়লা যেন আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল। বলল, তাহলে তো খুব মজা হবে।

তাতো হবেই। এই তো কাল রাত্রেই – আমরা ছিলাম প্রায় একশো জন। সশস্ত্র দল – পনের কুড়িটা বন্দুকও ছিল –; আসতে আসতে দেখলাম একটা গাঁয়ে আগুন জ্বলছে, চিৎকারের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নুরুল ইসলাম সকলকে এক জায়গায় জড় করে বললে – ভাই সব, আমাদের প্রোগ্রাম আজ বাতিল। মনে হচ্ছে-ঐ গাঁটায় পাকিস্থানী সৈন্যরা আক্রমণ করেছে। সবাই চল, আমরা যুদ্ধ করে সেই বেটাদের খতম করে নিরীহ গ্রামবাসীদের রক্ষা করি।

তারপর আমরা রাতের অন্ধকারে গেলাম, গিয়ে দেখলাম, অন্ধকারে যে যেখানে পারছে পালাচ্ছে, গোটা গাঁটা প্রায় ফাঁকা। অনেকগুলো ঘর বাড়ী তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমরা গাঁয়ে ঢোকবার সাহস করলাম না। চারিধারে কড়া নজর রাখলাম। নুরুল আমাকে চারজন বন্দুকধারী ও পাঁচজন বর্ষাধারী লোক দিয়ে বলেছিল, গ্রামের দক্ষিণ ধারে সড়কের পাশে লুকিয়ে দেখতে এবং সুযোগ পেলেই যেন শত্রু সৈন্যদের খতম করা হয়। আমি নিজেও একটা বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম। নানা রকম আর্তনাদ ও বন্দুকের আওয়াজ আমাদের কানে ভেসে আসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তিন চারটে টর্চের আলো গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলো। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওরা যেন কয়েকটা মহিলাকে ধরে আনছে। টর্চগুলো একটা বাগানের মধ্যে গেল। সেখান থেকে ভেসে আসতে লাগল নারী কণ্ঠের চাপা আর্তনাদ। আর্তনাদ উঠেই আবার তা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে হয় ওরা ঐ নারীদের মুখ হাত পা বেঁধে ফেলেছিল, যাতে চেঁচাতে না পারে বা পালাতে না পারে।

লায়লা যেন ভয়ে শিউরে উঠল। বিপ্লবের গা ঘেঁসে বসে বলল, তারপর?

আমি বন্দুকধারী চারজনকে নিয়ে ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে জঙ্গলের ধারে ধারে ওদের আরও কাছে হ'লাম। অন্ধকারে আমরা ঠিক ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে পারছিলাম না, কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, ওরা কয়েকটা মহিলাকে ধরে এনেছে, এখুনই অত্যাচার করবে।

তারপর –?

তারপর লাইট চারটে সামান্য দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ল। আমার সঙ্গীগুলো বলল, গুলি ছুঁড়ি –? আর কেন –?

আমি বললাম – না, ওতে ওঁরা না মরে-অবলা মেয়েগুলোও মরতে পারে। তাতে ফল আরও খারাপ হবে। আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে হবে না। ওদের মারতেই হবে। কিন্তু আমি নিজেও স্থির থাকতে পারলাম না একটা কিশোরী কণ্ঠের আর্ত্তনাদে। যেন একটা তের চৌদ্দ বছরের বালিকা চীৎকার করছে – আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও; তোমাদের পায়ে পড়ি আমাদের ছেড়ে দাও –; উঃ-! মরে গেলাম। তখন একটা মোটা গলার আওয়াজ ভেসে এলো। 'রুখ-যা নেহিতো গোলি মার দেগা –।'

বিপ্লব সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে বলল, আবার আওয়াজ এলো দু'তিন জায়গা থেকে, উঃ –! আঃ-বাঁচাও! বাঁচাও!

তখন আমাদের মাথায় রক্ত উঠে গেছে। নিজেদের আর সংযত রাখা গেল না। একটা করে বন্দুকধারীর সঙ্গে একজন বর্শাধারী লোক দিয়ে বললাম, ওদের মেরে অস্ত্র কেড়ে নাও। আমি নিজেও ঐ ভাবে তৈরী হয়ে নিলাম। বললাম, প্রত্যেকেই ঝাঁপিয়ে পড় এক এক জনার উপর।

সৈন্যগুলি তখন বলাৎকারে নিমগ্ন। আমি একটিকে ধরলাম। তখন সে একটি বালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার করছে। আমি সেই সৈন্যটির কোমরে লাথি মেরে দিতেই সে উঠে বসতে গেল। তখন তার মাথায় গুলি করে দিয়ে – বালিকাকে হাত ধরে তুললাম, তখন তার জ্ঞান ছিল না। তার রক্ত আর সৈন্যটির রক্তে একাকার হয়ে গেছে। এইভাবে সেদিন আমরা প্রায় কুড়িজন সৈন্যকে মেরেছিলাম। লুঠের মাল নিয়ে যারা পালাচ্ছিল, তাদের মধ্যেও কিছু মারা পড়েছিল। ওদের অস্ত্রশস্ত্র আমরা হস্তগত করেছিলাম এবং ধর্ষিতাদের শুশ্রুষার ব্যবস্থা করেছিলাম। লুঠের মালও বেশ কিছু আমাদের হস্তগত হয়েছিল। শেষকালে আমরা সব একত্রিত হয়ে 'জয় বাংলা' – বলে ফিরে এসেছিলাম। ঐ আমার প্রথম সাফল্য ও প্রতিশোধ!

লায়লা বলল, খুব ভাল করেছ –! আচ্ছা বিপ্লব, তোমরা না থাকলে সেই সৈন্যগুলো ঐ মেয়েগুলোকে তুলে নিয়ে চলে যেতো?

নিশ্চয় যেতো। ওদের নিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টে রাখত – তারপর দিনের পর দিন ওদের ওপর অত্যাচার করত, যতক্ষণ বেঁচে থাকত ততক্ষণ ছাড়ত না – । মরে গেলে ফেলে দিত নদীর জলে। তুমি বুঝে দ্যাখ না কেন, আমি যে মেয়েটিকে রক্ষা করলাম তার বয়েস বড় জোর – বার তের হবে। তাকে একটা মোষের মত পুরুষ বলাৎকার করছে, ঐ অত্যাচারে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, রক্তে ভেসে গেছে – । এই বলে বিপ্লব বলল, তুমি আর ঐসব আমাকে জিজ্ঞাসা কর না, কারণ ওসব ভাবতে গেলে, বলতে গেলে, মানুষ পাগল হয়ে যায় – মাথায় খুন উঠে পড়ে। মনে হয় এখুনই ছুটে গিয়ে ঐ পশু শক্তিটাকে একেবারে নির্মূল করে ফেলি।

লায়লার মুখ যেন থম্ থম্ করছিল। সে ধীরে ধীরে ভরাট গলায় বলল, নির্মূল করতে তো হবেই।

তা হবে। তারই জন্যই তো চাই অস্ত্র-শস্ত্র, শক্তি, একতা, সুষ্ঠু পরিচালনা। এ সবের একটিও বাদ গেলে আমরা আর জয়ী হতে পারব না, এ দেশটাও শ্মশান হয়ে যাবে। তবে আমার সব থেকে আনন্দ যে – সে দিন আমরা অনেকগুলো শত্রু সৈন্যকে খতম করেছিলাম।

বিপ্লবের এই কথায় বিমর্ষ লায়লা বিদ্যুৎপৃষ্টের মত যেন তড়াং করে লাফিয়ে উঠল, সে সহসা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিপ্লবকে জড়িয়ে ধরল।

বিপ্লবের হাতে তখনও সিগারেটের টুকরোটা জ্বলছে। বিপ্লব তাড়াতাড়ি সিগারেটটা কোন রকমে পাশে ফেলে দিয়ে বলল, ইস্ – এখনই তোমায় ছেঁকা লাগতো।

লায়লা অভিমানের সুরে বলল, লাগতো – লাগতো! তাতে আর এমন কি হ'ত? একটু না হয় পুড়ে যেতো এই তো! কিন্তু তা থেকে যে অনেক বেশী পুড়ছি – তোমাকে সব দিন কাছে না পেয়ে। এই বলে লায়লা ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে ওর কোলের উপর বসে তার বলিষ্ঠ বুকে মাথাটা রেখে চোখ বুজল।

বিপ্লব তখন ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আচ্ছা তুমি আমাদের এই দলের নেতৃত্ব নিতে পারবে?

লায়লা এ কথার কোন উত্তরই করতে পারল না। সে কিছুক্ষণ পরে যখন মুখ তুলল তখন সেই আধা জ্যোৎস্নায় বিপ্লব দেখতে পেলো ওর দু চোখের জল গাল পর্য্যন্ত গড়িয়ে পড়েছে। লায়লার চোখে জল দেখে বিপ্লবের অবিন্যস্ত

চিন্তাজাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। সেও যেন নতুন করে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের মনটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সুস্থ হয়ে উঠল। সে সস্নেহে লায়লার চোখের জল মুছে দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপোলে একটা চুম্বন দিয়ে বলল, কই – আমার কথার জবাব দিলে না তো?

লায়লা যেন একটু স্নেহের ভিখারিণী। সে করুণ মুখখানা তুলে বলল, তুমি আমার পাশে থাকলে আমি সব পারব।

বিপ্লব বললে – তুমি আর আমি এক, কোনদিনই দুই হতে পারি না।

লায়লা ওকে যেন আর একটু জোরে আঁকড়ে ধরল, সে যেন কোন কথাই কইবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

তখন উভয়ের মনে অন্তর্বিপ্লব চলছে। লায়লার আজ সব থেকে বড় আনন্দ অতগুলো শত্রুসৈন্য মরেছে। কাকলি আর লুৎফার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তারা শুরু করতে পেরেছে। আর বিভিন্ন অভাবনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বিপ্লবের অন্তের যেন হাহাকারের বন্যা বয়ে চলেছে। একাধারে লায়লার অর্ধবিকৃত মস্তিষ্ক ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রেম-ভালবাসা, যা তার একমাত্র ভরসা, অপর ধারে সংঘাত আর সংঘাত-মুক্তির পিপাসা, প্রতিশোধের নেশা। এই সব ভাবতে ভাবতে ও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল, ক্ষতবিক্ষত হ'ল আপনমনে। সে সজোরে লায়লাকে বুকে টেনে নিয়ে আত্মহারা হয়ে পড়ল।

লায়লাও সবকিছু ভুলে যেতে চায়। বিরাট কর্তব্যের বোঝা তো সামনে পড়ে রয়েছে। ছোটবেলা থেকে দিনে দিনে গড়া, তিল তিল করে জমিয়ে তোলা ভালবাসা উভয়কে করেছে মহান, উভয়কে দিয়েছে আনন্দের উৎস, উভয়ে উভয়ের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে ওতঃপ্রোত ভাবে। তাই কর্তব্যের মাপকাছি দিয়ে চলতে চলতে ওদের আলাদা হলে চলবে না – ওরা তো ওদের মধুর মিলনের জন্যেই। তখন ওরা দু'জনায় যৌবনের জোয়ারে মিলনের মধুর তরঙ্গে হারিয়ে গেল যেন।

চার

পাকিস্থানী সৈন্যদের বর্বরতা যত বেড়েছে – মুক্তিফৌজের তৎপরতাও তত বেড়ে চলেছে – অবশ্য মুক্তিফৌজ বলতে যা বোঝায় এরা কিন্তু তা নয়। এদের ফৌজ বললে ভুল হবে। এরা চাষী-ভুষি সাধারণ গ্রামবাসী, ছাত্রদল-তরুণদল এই সব মিলে কিছু গেরিলা শিক্ষা নিয়ে, কিছু অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সব থেকে বড় কথা এরা আত্মরক্ষার জন্য আরও বেশী তৎপর হতে বাধ্য হয়েছে। নিয়ম কানুন যে কিছু নাই তা নয়, তবে ফৌজী নিয়ম কানুনের কায়দায় কেতাদুরস্ত নয়। নায়ক অধিনায়ক সবই রয়েছে এদের – তবে আইনের কড়াকড়ি বড় একটা নাই, শাসনও শিথিল। প্রকৃত মুক্তিফৌজ হতে গেলে এদের আরও কিছু জানতে, শিখতে এবং করতে হবে। তবে এদের এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা, ছোট খাট যুদ্ধ, সমাজসেবা, সর্বোপরি মুক্তির জন্য সংগ্রাম – এই সব মিলিয়ে এদের মুক্তি ফৌজও বলা চলে। পরে এই সমস্ত ঘটটা পরম্পরায় যদি কোন দিন কোন ইতিহাস রচনা হয়, তবে এরা সে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে কি না সেটা ভবিষ্যতের কথা, তাই বলে এরা যা করেছে ও করছে – তা ঐতিহাসিক ঘটনা না বললে বড় অবিচার করা হয়।

এ বিশ্ব সংসারে ইতিহাস সৃষ্টির এও যেন একটা অনিবার্য নিয়ম। মানুষের চোখের আড়ালে যে অঘটন ঘটে গেল, বা যে মহত্ব সম্পন্ন হ'ল, বা যদি কেউ মহত্বের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিল – তার ইতিহাস লেখা হয় না; লেখা হয় তাদেরই, যারা ছলে বলে কৌশলে নিজেকে দেশ ও দশের সামনে জাহির করতে পারে অথবা কেউ আত্মত্যাগের মহান নিদর্শন রেখে যেতে পারে। যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের দেশের জন্য প্রাণ দেয়, বীরত্ব ও মহত্ব দেখাতে গিয়ে শত্রু সৈন্য যদি তার হাত পা বা গলা কেটে দেয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সেই পরিত্যক্ত অঙ্গের মতই সেও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে, তার গোরস্থানে স্মৃতিফলক দেখা যায় না; যেমন দেখা যায় একজন ভীরু কাপুরুষ দুশ্চরিত্র মেজর অথবা লেফটেন্যাণ্টের কবরের উপর।

নুরুল ইসলাম লায়লার উপর ভার দিয়েছে সংগঠনের। আর বিপ্লব নিয়েছে – অপারেশনের সক্রিয় ব্যবস্থাপনার। অবিনাশের উপর ভার অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা ও তা বণ্টনের। ওদের কাজ মন্দ চলছিল না। লায়লা ও বিপ্লব গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে মিটিং করে – জনসাধারণকে বোঝায়, যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে দেশ সেবার আদর্শে দীক্ষিত করে। যারা এ দলে ঢুকতে চায় তাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করে দেয়। এদের অফিস-টফিস বিশেষ কিছু ছিল না, সবই চলত গোপনে এবং যেখানে সেখানে। বিশ্বস্ত লোক মারফত যোগাযোগ ও সংগঠনের কাজ চলত।

এরমধ্যে লায়লার অনেক সঙ্গী জুটেছিল। ওদের মধ্যে রোসেনারা ও সাবিত্রী – দুটি তরুণী ছাত্রী প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং লায়লার সহকর্মী হতে পেরেছিল। সাবিত্রী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কন্যা, শিক্ষিতা – সুরুচিসম্পন্না – সাহসী। আর রোসেনারা সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের মেয়ে বটে, শিক্ষিতা – সুন্দরীও, তবে ভীতু ও অস্থিরমতি। রোসেনারা আধুনিকা, বিড়াল-চোখী, সুন্দরী। দেখলেই মনে হয় যেন বিদেশিনী। ফ্যাসানেবল চুজস্প্যাণ্ট আর সিল্কের বুস শার্ট তার পরিধেয়, তার উপরে নামমাত্র একটা ফিন্‌ফিনে সিফনের ওড়না, সেটা প্রয়োজনের চাইতে ভব্যতা রক্ষার প্রতীক বললেও অত্যুক্তি হয় না। রোসেনারার ছিপছিপে চেহারার সব থেকে আকর্ষণীয় তার অতি উর্ব্বর, সুবিন্যস্ত পীনপয়োধর যুগল। যেন আঁটসাঁট আবরণী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চায়। তাই ও রাস্তা দিয়ে গেলে ওকে দেখে যে কোন পথিক ওকে মনে রাখতে বাধ্য হয়, যুব সম্প্রদায়ের আহারে অরুচি ধরে, ও অনিদ্রা রোগ হয়।

রোসেনারাকে ওর বন্ধুরা আদর করে বলত রশ্মি। রশ্মি তুই যার চোখে পড়বি – তার চোখ ঝলসে যাবে। ঐ রশ্মি যে কেমন করে, আর কি জন্যে এই দলে এসেছিল তা ভাবা শক্ত।

লায়লা ওকে দলে নিতে চায় নাই। কিন্তু সাবিত্রীর অনুরোধে ওকে যেন উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতই গিলতে হয়েছিল। লায়লা বলেছিল – রশ্মি – আমাদের পথ বড় বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ, কদর্মাক্ত ও পিচ্ছিল। মানুষ এ পথে চলতে গিয়ে পদে পদে বাধা পায়, পড়ে যায়, গা হাত পা ছিঁড়ে রক্তারক্তি হয়। তোমার মত সুখী মেয়ের এ পথে না আসাই ভাল। কিন্তু রশ্মি ও কথা শুনে নাই, লায়লার পায়ে ধরে বলেছিল, এ জীবনটাই তো নশ্বর। মরে গেলেই ফুরিয়ে গেল। দাওনা বুবু আমায় কিছু দেশের কাজ করতে – তা হলে বেহেস্তে গিয়ে তবু তো বলতে পারব, আমি কিছু না কিছু করেছি।

লায়লা ওর অনুরোধ ভুলতে পারে নাই। তাই ও যেখানে গেছে সাবিত্রী ও রশ্মিকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

বিপ্লব একদিন লায়লাকে বলেছিল, লায়লা তুমি খুব সাবধান। আমরা যেখানে যাই, যাদের নিয়ে কাজ করি – যাদের আপনজন ভেবে মনের কথা খুলে বলি, তাদেরই মধ্যে আমাদের শত্রু আছে। পাকিস্থানী সৈন্যদের কাছে আমাদের গোপন খবর পাচার করে- – তুমি খুব কড়া নজর রাখবে।

লায়লা বলেছিল, এ তোমার বাজে কথা। আমি শুনতে চাই না, মানতে চাই না তোমার ওসব কথা। যারা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে চায়, নিজের দেশবাসী মা-ভাই-বোনদের প্রাণে বাঁচাতে চায়, তাদের ইজ্জত রক্ষা করতে চায় – তারা কি কখনও এ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? অসম্ভব – শত্রুসৈন্যরা কোন ‘সি আই ডি’ লাগিয়েছে কিনা তা তুমি খুঁজে দ্যাখ। তাছাড়া তুমি এটা কি করে জানলে যে আমাদের পিছনে ফেউ লেগেছে?

বিপ্লব বলল, আমাদের দু’তিনটে গোপন আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। সহসা শত্রুসৈন্য এসে পড়েছে যাদের আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণও ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের গোপন আড্ডার সন্ধান ওরা কি করে পেল? তৃতীয়তঃ ওরা এখন আর বিশ পঞ্চাশ জন আসে না, অন্ততঃ একশো দুশো জন আসেই। এই সব কারণে অন্ততঃ বিশ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছে।

লায়লা বলল, তা হতে পারে। এটা খুবই সাধারণ ঘটনা – । ওরা যখন দেখল এদেশে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে – তখন ওরাও সাবধান হয়েছে। এর মানে এই নয় যে – আমাদের মধ্যে বিশ্বাসহন্তা আছে।

বিপ্লব বলল, কি জানি বাপু, নুরুল বলেছে এ ধারে কড়া নজর রাখতে – এবং সে ভারটা তোমার উপরই ন্যস্ত। এই তো সেদিন নুরুল নিজে একজন পাকিস্তানী চরকে গুলি করে মারল। আরও আট দশটা মারা পড়েছে।

লায়লা কপালের উপর চোখ তুলে বলেছিস – ইস –! বল কি? এমন ধারা দেশের শত্রুতা কেউ কখনও করতে পারে না কি?

তা আবার পারে না? মিরজাফরের জাত চিরকালই আছে, ও যে রক্তবীজের ঝাড়, সহসা নষ্ট হয় না।

লায়লা বলেছিল, তবে তো খুব সাবধান হতে হবে।

শুধু সাবধান নয়, খুবই সাবধান হতে হবে, উপরুন্তু ঐ গুপ্তচরকে ধরতে হবে। সে ভার তোমার উপর।

লায়লা বলেছিল, ইস্ –! আমি তা কি করে পারব –!

বিপ্লব বলেছিল, তা তুমি যেমন করেই পার পারবে, আর যদি না পার, তা হলে জানবে আমাদের সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে, আমরা বাঙালী জাতটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাব।

বিপ্লবের কথায় লায়লা যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে নিজেকে সংযত করে একটু চাঙ্গা করে নিতে চাইল – এবং সুস্থির হয়ে বলল, তবে তো আমায় গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

তা হবে বই কি!

আচ্ছা বিপ্লব – তুমি এ বিষয়ে আমায় একটু সাহায্য কর না। এই বলে লায়লা আর্ত্তের মত বিপ্লবের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বিপ্লব বলল – বল, আমি তোমায় কি সাহায্য করতে পারি?

লায়লা বলল, তোমাদের যাকে যাকে সন্দেহ হয় তাদের নামের একটা লিস্ট আমায় দিতে হবে।

বিপ্লব সঙ্গে সঙ্গে একটা লিস্ট পকেট হতে বার করে লায়লার হাতে দিল।

লায়লা ও লিস্টটা পড়তে পড়তে দেখল, ওতে জব্বর আর রশ্মির নামটাই বড় বড় করে লেখা।

এই লিস্টটা দেখে লায়লার মাথায় যেন সহসা আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তার পায়ের তলা হতে মাটি সরে যেতে লাগল। তখনই যেন সে শুনতে পেল ঢাকার সেই ক্যান্টনমেন্টে লুৎফা আর কাকলির কান্না। লায়লা যেন পাগল হয়ে যাবে! সে সহসা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবং বিপ্লবের পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

বিপ্লব লায়লার এই আকস্মিক কান্নায় যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। সে এ কান্নার কি অর্থ হতে পারে – তার মাথা মুণ্ডু কিছুই ভেবে পেল না। সে লায়লাকে তুলে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বলল – এ কি! তুমি কাঁদছ কেন? আমায় খুলে বল না, কি হয়েছে –? এর প্রতিকার করবার জন্যে আমরা তো রয়েছিই।

লায়লা বলল, না না- – ওর জন্যে আমার দুঃখ নাই। আমার হাতে নুরুল ইসলাম যেদিন একটি রিভলভার দিয়ে বললে, তুমি বাঙলার মেয়ে, তাই তুমি আজ থেকে আমাদের বোন – বিপ্লবী। লায়লা এই কথাগুলো বলে একটু যেন দেখে নিতে চাইল। সে আবার বলল, নুরুলের কথা – আমি রাখতে পারি নাই। আমি এ দলের অনুপযুক্ত। অযোগ্য! এর জন্যে তোমাদের উচিৎ আমায় কঠিন শাস্তি দেওয়া – গুলি করে মেরে ফেলা। কারণ, আমার অসবধানতার জন্যেই তো সোনার-চাঁদ ছেলেগুলো মরেছে।

বিপ্লব বলল, তোমাকে অত ভাবনা ভাবতে হবে না। তুমি যদি দোষী হতে তাহলে আমি নিজে হাতেই তোমায় গুলি করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতাম।

লায়লা যেন একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। সে বলল, তা হলে আমারও তো আর কোন আফশোষ থাকত না, যেমন কর্ম তেমনি ফল পেতাম।

বিপ্লব বলল – যাক, এখন যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এবার তুমি সাবধান হয়ে চল এবং যে কোন উপায়ে ঐ সূত্রের সন্ধান তোমায় করতেই হবে – এবং চরম প্রতিশোধ নেবার রাস্তা তোমাকেই বলে দিতে হবে।

লায়লা বলল, তাই হবে। আমি যেমন করেই পারি এর বিহিত করবই করব। তা যদি না পারি আমার নাম লায়লা নয় – আর তোমাকেও আমি এ কালা মুখ কোন দিনই দেখাব না।

লায়লার এ কথায় বিপ্লব চাপা আনন্দে একবার চারিধারে তাকিয়ে নির্জন দেখে, লায়লাকে টেনে নিয়ে একটা চুমু খেতে চেয়েছিল – কিন্তু লায়লা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিল – 'চেক আপ ইউরসেল্‌ফ্‌! আই এ্যাম নট ইওর আনটিল এ্যাণ্ড আনলেস আই মে ক্যাচ আপ দি কালপ্রিট এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডওভার টু নুরুল টু টেক রিভেঞ্জ –'! এই কথাগুলো বলে লায়লা, দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম।

লায়লার তো জ্ঞান হারাবারই কথা। ওর আর আছে কি? ও সব পেয়েছিল, কিন্তু সবই হারিয়ে গেছে। জীবনের শেষ সহায় শেষ সম্বল বিপ্লব – তা সেও যেন আজ হারাতে বসেছে! ও আর কি নিয়ে বাঁচবে? মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার নিয়ে বাঁচার জন্যই ও দেশ উদ্ধারে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল। তাও যেন শেষ হয়ে গেল! ওর ভুলের জন্যই অতবড় একটা সর্বনাশ হয়ে গেল। তবে আর ও কি নিয়ে বাঁচবে? নুরুল নিশ্চয়ই ভাববে – লায়লার এতে হয়তো কোন গোপন হাত আছে।

বিপ্লব বলেছিল, লায়লা – তোমার এ ছেলেমানুষী সাজে না। তোমাকে আরও – আরও অনেক শক্ত হতে হবে। এর প্রতিবিধান তোমাকেই করতে হবে। তুমি ওঠ, আমার দিকে একটু তাকিয়ে দ্যাখ, তুমি যদি ওমন কর তাহলে আমিই বা কি নিয়ে বাঁচব লায়লা!

বিপ্লবের এ কথায় লায়লা উঠেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে বিপ্লবের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, বিপ্লব আজ তুমি চলে যাও! আমার নুরুল ভাইকে বলবে – হয় আমি এর প্রতিকার করব, নয়ত মেঘনার জলে ডুবে মরব, আমার এ কথার নড়চড় হবার নয়; পৃথিবী উল্টে গেলেও লায়লার কথা উল্টাবে না – না –!

পাঁচ

বিপ্লবের মনটা একদম ভাল ছিল না। বেগমগঞ্জ হতে নৌকায় উজান বেয়ে কয়েকটি সঙ্গী নিয়ে ওকে মুরাদনগর ও ত্রিপুরেশ্বরী নদীর ধার পর্য্যন্ত আসতে হয়েছে – । শরীর যত ক্লান্ত, মনও তত বিমর্ষ। যে সব কাজের দায়িত্ব নিয়ে ও এসেছিল তা যেন ঠিক ঠিক হচ্ছিল না। কয়েক দিন ধরে একটানা নৌকো যাত্রা এবং দিন রাত পরিশ্রমের ফলে ও বড় ক্লান্তহয়ে পড়েছিল। নুরুল ইসলাম বলেছিল, মুরাদনগর ছোট্ট টাউন হলেও ওর গুরুত্ব আছে। ওখানে আমাদের একটা শক্ত ঘাঁটি করা দরকার। ওখানে মফিজ রহমানের বাড়ীতে থেকে সব ব্যবস্থা করতে হবে। মফিজ নুরুলের ক্লাসফ্রেণ্ড। বিপ্লব দলবল নিয়ে ওখানে উঠেই বিপদে পড়ল – মফিজ বাড়ীতে ছিল না।

মফিজের বুড়িমা সব শুনে বলল, তার বাড়ীতে ওসব ঝামেলা করা চলবে না। মফিজ ওসব দলে-টলে নাই। তখন মফিজের বিবি, ঘরের ভিতর থেকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বলল, আমার শ্বাশুড়ীর কথা শুনে আপনারা ঘাবড়াবেন না – ও আজ দুপুরেই ফিরবে।

বিপ্লব বলেছিল – ঠিক আছে, আমরা এখন যাই – বিকালে আবার আসব। এই বলে বিপ্লব ফিরে এসে নদীর ধারে একটা গাছতলায় গোটা দিনটা কাটিয়ে দিয়েছিল। ওর সঙ্গীরা বলে গিয়েছিল সন্ধ্যার সময় মফিজের বাড়ীতে দেখা হবে।

বিপ্লবের যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা হতে বড় একটা দেরি নাই। ও নদীর জলে হাত মুখ ধুয়ে – একটু ঐ জল খেয়ে বেশ খানিকটা সুস্থ হ'ল যেন। তারপর গজগমনে চলতে লাগল নদীর ধার ধরেই। বিপ্লবের আগে আগে চলছিল দুটি ছেলে। বয়স হবে বোধ হয় – পনের ষোল। অনেক লোকই ও ধারটা দিয়ে যাতায়াত করছিল। ঐ নদীর একটা ঘাটে মেয়েরা সান্ধ্য স্নান করে জল নিতে আসে। মেয়েদের দেখে বিপ্লব মাথাটা নিচু করে একটু তাড়াতাড়ি চলছিল যাতে মেয়েদের স্নানের কোন অসুবিধা না হয়। ও তখন ঘাটটা পেরিয়ে গিয়েছিল। ছেলে দুটির মধ্যে একটির পরণে হাফপ্যাণ্ট – আর গেরুয়া রঙের টি-শার্ট। আর অন্যটির পরণে চুজস প্যাণ্ট আর রঙ বেরঙের ছাপা ছাপা কাপড়ের হাওয়াই শার্ট। হঠাৎ ওর যেন কানে এলো একটি ছেলে বললে – ইস্! ঐটুকুনি মেয়ের বুকের বহর দ্যাখ! ছেলে দুটি তখন দাঁড়িয়ে গেছে। ঘাট থেকে স্নান করে উঠছিল একটা ছোট্ট মেয়ে – বয়স বোধ হয় হবে এগার কি বার। তেমন কিছু ভোরকোলো চেহারা নয়, সে প্যাণ্ট ও ফ্রক পরেই স্নান করছিল – এবং সেই ভিজে ফ্রকটা বুকে চাপা দিয়েই বাড়ীর রাস্তা ধরল।

অন্য ছেলেটি বলল, বাবাঃ – তাই বটে তো! আচ্ছা মাইরি – ঐ টুকুনি মেয়ের কি করে এমন হ'ল বল দিকিনি?

অপর বন্ধুটি উত্তর দিলে – দূর শালা – ঐ টুকুনি কিরে? মেঘে মেঘে ওর বেলা হয়েছে।

অন্য বন্ধুটি বলল, কখ্খনো না! ওর বয়স বড় জোর এ্যাগার কি বার। তার বেশি হতেই পারে না।

তুই শালা একটা ইডিয়ট্।

তুই শালা ভারী পণ্ডিত! মেয়েছেলে যত ছোটই হোক না কেন, মন ডেভলপড্ হলেই শরীরও ডেভলপড্ হবেই।

তুই কি করে জানলি?

আমি জেনেছি বলেই তো বলছি। ঐ টুকুনি মেয়ে হলে কি হবে – ও এখন তৈরী।

তখন অন্য বন্ধুটি বলল – ধ্যাৎ! এসব তোর একদম বাজে কথা।

বেট –!

বেট! একসের রসগোল্লা।

ঠিক আছে। আর আমি যদি প্রমাণ করতে না পারি তবে আমি দু'সের রসগোল্লা দেব।

ঠিক আছে, চল তবে পরীক্ষা করে দেখা যাক। এই বলে দুই বন্ধুতেই মেয়েটির পিছন নিল।

বিপ্লব রাস্তা চলা তখন প্রায় বন্ধ করে দিয়ে নদীর সৌন্দর্য্য দেখার ভান করে ঐ দিকে হাঁ করে তাকিয়ে যেন তন্ময় হয়ে পড়েছিল। আড়চোখে দেখল ছেলে দুটি মেয়েটির পিছন নিয়ে একটা জঙলা পুকুরের পাড়ে উঠল। বিপ্লবও দূরে দূরে থেকে ওদের সব কিছু লক্ষ্য করতে পাগল। ক্রমে ঐ মেয়েটি একটা বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল।

বাড়ীটা খুব ঘেরাবেড়া নয়। আবার ফাঁকাও বলা যায় না। মেয়েটি ভিজে জামা প্যান্ট ছেড়ে পিঁড়েয় দাঁড়াতেই চুজ প্যান্ট ওয়ালা ছেলেটি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলল – এই রুবী, তোকে আজ আমাদের একটা কথা রাখতে হবে – তাহলে তোকে পেট ভরে মিষ্টি খাইয়ে দোব।

মেয়েটি হাসতে হাসতে তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল – কি?

তোর বয়সটা কত একবার বলতো –

মেয়েটি বলল উঁ! ফচ্‌কে ছোঁড়া! অত সস্তা নয়।

ছেলেটা অনুনয়ের সুরে বলল – রুবী, প্লীজ্!

রুবি এবার হেসে ওকে ভেঙচাল –

ছেলেটা তখন পিঁড়ের উপরে উঠে পড়েছে। বিপ্লব একবার ঘাড় উঁচু করে অনুন্নত পাঁচিলের উপর দিয়ে দেখল। সে যেন ধৈর্য্যচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রাগে সে গস্ গস্ করতে করতে ভাবছিল এখনই ছুটে গিয়ে ঐ ছেলেটার গালে কষে তিন থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু ওরও কৌতুহল হচ্ছিল কতদূর গড়ায় তা দেখার জন্যে।

কিন্তু দেখার আর কিছু ছিল না। বিপ্লব ভাবছিল যে দেশের মানুষ আজ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে প্রাণ আর ইজ্জত বাঁচানর জন্য ব্যাকুল – সেই দেশেই এত নোংরা ছেলে জন্মাল কি করে? এরাই বড় হয়ে হয়তো হবে রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি শ্রেণীর দেশদ্রোহী – নয়তো বা কোন মন্ত্রী অথবা সমাজসেবক। বিপ্লব এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মফিজের বাড়ীর দিকে চলতে লাগল।

বাজারের কাছে এসে দেখল, অধিকাংশ দোকানেই হ্যাজাক অথবা গ্যাস লাইট জ্বলছে। সব দোকানগুলোর আলোয় গোটা বাজারটা যেন ঝক ঝক করছে। ওরই মধ্যে মধ্যে দু একটা বড় বড় দোকান যেন বন্ধ-দরজায় তালা ঝোলান রয়েছে।

বিপ্লব আপনমনে রাস্তা চলছিল। ওর ইচ্ছা হ'ল বাজারটা একটু দেখেই মফিজের বাড়ী যাবে। ও একটা পান বিড়ির দোকানের কাছে আসতেই দেখল, একটা আট দশ বছরের ছেলে সিগারেট টানতে টানতে সেই পানের দোকানদারকে বলছে – আমার একটা টাকা পাবে তাই দিনে সাতবার তাগাদা দিচ্ছ, কিন্তু ঐ সৈন্যগুলো পান খেলে, সিগারেট নিলে – তা একটা পয়সাও দিয়ে গেল না, তাতে তো তোমার কথা বেরুল না। ওরা যে তোমার বাবা হয়! কথা বললেই গুলি।

দোকানদার বলল, চোপরাও! আমার খেয়েছে তো তোর কি?

ছেলেটি সিগারেটের ধোঁয়া রিং করে ছাড়তে ছাড়তে বীরদর্পে বলল, আমার আবার কি? তুমি পয়সা না পেলে আমার চোদ্দ পুরুষ পিণ্ডি পাবে না যে!

দোকানদারের মেজাজ তখন ভাল ছিল না। প্রায় পনের কুড়িটি সৈন্য প্রত্যেকে পান ও এক প্যাকেট করে সিগারেট নিয়ে দাম দেয় নাই – কিন্তু কিছু বলারও উপায় নাই, বললেই গুলি। কে আর বাবা সামান্য পয়সার জন্যে কাঁচা প্রাণটা দেয়! তবে থেকে দাম না চাওয়াই ভাল। সুখ থেকে স্বস্তি ভাল।

ছেলেটা তখন দোকান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। বিপ্লবকে দেখেই বুঝে নিল – একেবারে নতুন আমদানি। তাই সে বিপ্লবের কাছে গিয়ে বলল, এই যে – ভাই সাহেব! খাঁটি নতুন তাজা জিনিষ! খাবেন না কি? একটু চেখে দেখলেই আর ভুলতে পারবেন না।

বিপ্লবের মাথায় সেই ছেলে – মেয়ে দুটির ব্যাপার তখনও পাক খাচ্ছিল। সে এই ছেলেটির কথা যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। বলল – কি তাজা?

আমার সঙ্গে এসেই দেখুন না –

বিপ্লবের তখন খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। সারাদিন তেমন কিছু খাওয়াও হয় নাই। মনটাও তেমন ভাল ছিল না। তাই অত জিগ্যেস না করে বলল – চল।

ছেলেটা ওকে রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে ঢুকল একটা অন্ধকার গলিতে। বিপ্লব বলল – ইস্! এ আবার কোথায় নিয়ে এলে? কোথায় তোমার দোকান?

ছেলেটা চলতে চলতেই বলল – আর এই তো – এসে গেছি বলে! ওখানে আপনি যা খাবেন, তাই – ই পাবেন।

বিপ্লব আর কিছু বলল না। গলিটার দুধারে – দুয়ারে দুয়ারে হ্যারিকেনের আলোয় অস্পষ্ট দেখা গেল নানা বয়সের নারীর দল। তারা ওর দিকে এমন ধারা তাকাচ্ছে, যেন ওকে গিলে খেয়ে নেবে। বিপ্লব বুঝতে পারল এরা রূপজীবিনী। ছেলেটা তাকে ধাপ্পা দিয়ে এই নোংরা জায়গায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু তখন ওর আর পিছোবার যেন কোন উপায় ছিল না। তাই সে মন্ত্রমুগ্ধের মতই ওর পিছু পিছু চলতে পাগল।

ছেলেটা ক্রমশঃ একটা টিনের চালওলা ঘরে বিপ্লবকে নিয়ে উঠাল।

ঘরের মধ্যে একটা তক্তপোষে পরিপাটি করে বিছানা পাতা, ঘরের কোণে একটা কলসী ও গেলাস – আর একটা চেয়ারের উপর কয়েকটা ফুল ও দেওয়ালে কয়েকটা আগরবাতি জ্বলছে।

ছেলেটা বিপ্লবের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বলল – বসুন। এই বলে সে বাইরের দরজায় খিল দিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল।

কিছুক্ষণ পর একটি সুন্দরী মেয়ে একটি রেকাবে করে কয়েকটি নারকেলের নাড়ু ও এক ঘটী জল নিয়ে ঘরে ঢুকে চেয়ারটার উপর রেখে খুব মিষ্টি গলায় বলল, খা–ন!

বিপ্লবের মনে তখন আকাশ পাতাল চিন্তা। এ আমি কোথায় এলাম? কেন এলাম? সে নিরুত্তর, নির্বাক, নিস্পন্দ; ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর।

মেয়েটি আবার বলল – খান!

বিপ্লবের যেন চমক ভাঙল, বলল, হ্যাঁ – খাই।

এই বলে বিপ্লব ঘটির জলেই হাত ধুয়ে নাড়ু কয়টা খেয়ে নিয়ে জলটাও চক্ চক্ করে খেয়ে নিয়ে বলল, আর একটু জল দিতে পারেন?

মেয়েটি ঘরের কোণের কলসি হতে এক ঘটি জল এনে দিয়ে আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বিপ্লব জলটুকু খেয়ে বলল, মিষ্টির দাম কত?

বিপ্লবের এই কথায় মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। সে তেমনি ধারাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিপ্লব আবার বলল, সেই ছেলেটি কোথায়? আমাকে এখুনই চলে যেতে হবে, আমার অনেক জরুরী কাজ আছে। বলুন মিষ্টিকর দাম কত?

মেয়েটি তবু নিরুত্তর। ও যেন নির্বাক, নিস্পন্দ –!

বিপ্লব এবার খুবই রেগে উঠল। সে সহসা পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে মেয়েটির গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, নিন্ আপনার মিষ্টির দাম – এই বলে সে বাইরের দরজার খিল খুলে বেরিয়ে গেল।

বিপ্লব বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার সেই কান্নার আওয়াজ বিপ্লবের কানে যেতেই বিপ্লব ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দেখল, মেয়েটি তখনও ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তার সেই টাকার নোট-টাও সেই খানেই পড়ে রয়েছে। সে স্থানুরের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

মেয়েটি বেশ তো –! দোহারা – অথচ ছিপছিপে গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রং, নাক, মুখ চোখ খুব পরিস্কার। মাঝারি সুন্দরী গৃহস্থ ঘরের বউ যেন। খাসা মিষ্টি স্বভাব, লাজুক লাজুক ভাব। সিঁথির সিঁদুরটা ওর আরও যেন কিছু মনে করিয়ে দেয় – । মেয়েটি দেখতে কতকটা যেন কাকলির মত – ।

বিপ্লব ধমকের সুরে বলল – কাঁদছেন কেন –? আমার সঙ্গে ন্যাকামি করার আর আছে কি? বারবনিতারা ছলা কলা জানে তা আমি জানি। আপনি খুলে বলুন না – কি বলতে চাইছেন – অত ছলাকলার আর কোন দরকার নাই।

বিপ্লবের এই কথায় মেয়েটির কান্না থেমে গেল এবং কঠিন গাম্ভীর্যে, তার মুখটা যেন থম্ থম্ করতে লাগল। সে মুখ হতে হাত দুটো নামিয়ে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে বলল, আমায় মাফ্ করবেন – আমার বলার আর কিছু নাই – । দয়া করে আপনার টাকাটা নিয়ে আপনি এখান থেকে এখনই চলে যান – ।

ওর ঐ কথায় বিপ্লবের মাথায় যেন সহসা আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে বুঝে উঠতে পারছিল না – রূপজীবিনীরা এমন কথা বলে কেমন করে? সে পরিষ্কার বুঝতে পারল – এর মধ্যে কি যেন এক গোপন রহস্য রয়ে গেছে। তাই সে কি বলবে না বলবে ঠিক করতে পারছিল না। সে সহসা বলে ফেলল, রাতের মানুষ বেউস্যাপটিতে আসে কেন? তা কি তোমায় খুলে বলতে হবে? তোমরা পয়সার বদলে দেহ বিক্রী করছ – আর আমরা পয়সা দিয়ে তা কিনতে এসেছি – । এখানে অত কান্নাকাটি ছলা-কলার কোন প্রয়োজনই নাই।

বিপ্লবের এ কথায় মেয়েটি যেন তড়িতাহত হয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার যাবতীয় জড়তা যেন এক নিমেষে কেটে গিয়ে সে এক লাস্যময়ী চটুল স্বভাবা বারবনিতায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ল। সে ছুটে এসে বাইরের দরজার খিল এঁটে দিয়ে নিজের শাড়ী খানা খুলে ঘরের মেঝেয় ফেলে দিয়ে বিপ্লবের গায়ের উপর এসে পড়ল এবং দু হাতে ব্লাউজের বোতামগুলো খুলতে খুলতে বলল-নন্, এই তো আমার দেহ। আপনি পয়সা দিয়ে এইটাই তো কিনতে এসেছেন। নিন্ আর দেরী করছেন কেন –? আমার এই দেহটাকে নিয়ে আপনার যা খুশী তাই-ই করতে পারেন, এ এখন আপনার – ।

আকস্মিক এই ঘটনায় বিপ্লব ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে তক্তপোষে ধপ করে বসে পড়ল। তার গোটা শরীর দিয়ে কল্ কল্ করে ঘাম ছুটতে লাগল। তার দু হাঁটুর মধ্যে সায়া পরা-ব্লাউজের বোতাম খোলা, মেয়েটির আগুন জ্বলা চোখ দুটো থেকে যেন বহ্নির বন্যা ছুটে আসছে – । তার উপর-সতী সীমন্তিনীর মত সিঁথির মোটা সিঁদুরটা যেন জ্বল জ্বল করছে। তার উত্তাপ বিপ্লবের জামা ভেদ করে যেন তাকে শিহরিত পুলকিত করে তুলছে। মেয়েটির ডাগর ডাগর চোখ দুটো তখন যেন জলে টল্ মল্ করছে – ।

বিপ্লব বলল, এ বিশ্বসংসার অতি বিচিত্র। তুমি যদি নেহাত পয়সার প্রয়োজনে এই দেহ বিক্রী কর তা হলে তোমার ও দেহের খরিদ্দার আমি নই।

বিপ্লবের এই কথায় মেয়েটি যেন আবার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। উদ্ধতফনা বিষধর নাগিনী – সামান্য এক ফোঁটা কার্বলিক এ্যাসিডের গন্ধ পেলে ভয়ে প্রাণ বাঁচানর জন্যে যেমনি লুকিয়ে পালাতে চেষ্টা করে, ঐ রমনী দু হাতে ব্লাউজের দু'ধারে নিজের অরক্ষিত বক্ষ ঢাকতে ঢাকতে তার মুখের দিকে আর্ত্তের মত চেয়ে বলল, তবে –? তবে আপনি কি চান?

বিপ্লব-অম্লান বদনে বললে, তুমি যা চাও, আমিও তাই-ই চাই-। মেয়েটি ওর মুখের দিকে অর্থহীনভাবে চেয়ে থেকে বলল, আপনার কথার মাঝে বুঝলাম না।

বিপ্লব বললে – আমাকে একটা বারবিলাসিনীর খরিদ্দার না ভেবে, তোমার যৌবনের যদি প্রয়োজন থাকে কোন পুরুষের সাহচর্য্য এবং তা আমায় নিঃসঙ্কোচে ধরে নিতেও পার তা হলে – আমি তোমার ও দেহ স্পর্শ করিতে পারি।

মেয়েটি কি যেন ভাবছিল। তার মুখে যেন আর কোন কথাই যোগাচ্ছিল না। সে ব্লাউজের বোতামগুলো আঁটতে আঁটতে বলল – বুঝেছি! আপনি খুব দয়ালু লোক। আপনি দয়া করে যা কিছু দেবেন তার বদলে এক রত্তিও কিছু নিতে চান না – এই তো?

বিপ্লব বললে, আমি দয়ালু কিনা জানি না, এমন কিছু কোন দিন ভাবিও নাই আর ভাববার সময়ও নাই।

তাহলে শুধু শুধু আপনি পরকে পয়সা দেবেন কেন? এ সংসারে মানুষ যা দেয় বদলে কিছু না কিছু পেতে চায়।

বিপ্লব বলল – তা চায়।

তবে?

তবে আর কি? তবে তোমার কাছেও আমি কিছু না কিছু একটা নিয়ে যাব, তার আর কি আছে।

মেয়েটি তখন লজ্জাবনত মুখে বলল, কিন্তু আমার যে আর কিছু দেবার মত সম্বল নাই।

বিপ্লব সহাস্যে বলল, না –! তোমার ও কথাটা ঠিক নয়।

তাই হয়ত হবে। কিন্তু –

বিপ্লব বলল, কি কিন্তু? – এখানে যে সমস্ত পুরুষরা আসে – সবাই দেহের খরিদ্দার, এই তো?

বিপ্লবের কথায় মেয়েটি যেন আর কোন কিছুই উত্তর দিতে পারছিল না। সে দুম করে বলে বসল, কিন্তু আপনিও তো যুবক। আপনার ওমন ভরা যৌবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তো আছে।

মেয়েটির কথা শুনে বিপ্লব হেসে উঠল। সে সহসা খাট থেকে নেমে এসে নিজে হাতে ওকে কাপড় পরিয়ে দিয়ে খাটে বসিয়ে নিজে সটান সেই বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং বালিশের উপর হাত রেখে ও হাতের উপর মাথা রেখে অন্য হাতে ওকে আরও কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, কি বললে? আমার যৌবন এবং তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা, এইতো- –!

মেয়েটি যেন বারংবার কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ছিল – বলল, হ্যাঁ –! তা-আছে! আমার যৌবন, আমার ভালবাসার ক্ষুধা, মিলনের ক্ষুধা – সবই আছে এবং সে ভালবাসা, সে মিলনের ক্ষুধা অতি তীব্র – । মেয়েটি বিপ্লবের মুখের দিকে চেয়ে বলল – তবে শুধু শুধু ফিরে যাবেন কেন?

শুধু শুধু ফিরে যে যাবই, একথা তো আমি বলি নাই।

মেয়েটি যেন কি ভেবে নিয়ে বলল, বুঝেছি – । আমি আপনাকে ভাল না বাসলে আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না।

বিপ্লব বলল, ঠিক বলেছ –! তুমি এতক্ষণে বুঝেছ দেখছি –

বিপ্লবের এই কথায় মেয়েটি কি একটুখানি ভেবে নিয়ে নিজেকে সহজ করার যেন চেষ্টা করল। বলল, বেশতো –! আমি আপনাকে ভালবেসেছি।

মেয়েটির কথায় বিপ্লব হেসে উঠল। সে হাসি থামিয়ে বলল, কি রকম ভালবাসা?

বিপ্লবের এই প্রশ্নে মেয়েটি আবার যেন ঘাবড়ে গেল। বলল, ভালবাসা ভালবাসাই – ওতে আবার কেমন, কিরকম আছে না কি?

বিপ্লব বলল, তা আছে বই কি! এ সংসারে মা-বাবা নিজের ছেলেমেয়েকে একরকম ভালবাসে, ভাই বোনকে এক রকম ভালবাসে, বন্ধু বন্ধুকে অন্য রকম ভালবাসে, যুবক যুবতীদের ভালবাসা আর এক রকম, আবার ভক্তরা ভগবানকে ভালবাসে অন্য রকম। তুমি আমায় কি রকম ভালবাস?

বিপ্লবের এই কথায় মেয়েটি যেন হতবাক হয়ে পড়ল। ওর বারংবার মনে হতে লাগল এই সৌম্য কান্তি অপরিচিত যুবকটি যেন একটা মূর্ত্তিমান হেঁয়ালি। ওর ভেবে চিন্তে কথা বলার সব কিচ্ছুই যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই ও দুম করে বলে বসল, যুবক যবতীকে যেমনি ভালবাসে – আমিও আপনাকে ঠিক তেমনি ভালবাসি।

বিপ্লব বলল, বেশতো তা হলে ভালই হ'ল।

মেয়েটি ভাবল, এবার যেন সব জট খুলে গেল – সব পরিস্কার হয়ে গেল। আর ওর মনে কোন খিঁচ খাঁচই রইল না। সে মনে মনে ভাবছিল এইবার হয়ত ও আমার দেহটাকে নিয়ে পড়বে। পুরুষ মানুষ যে কত হ্যাংলা হয় তা তার আর জানতে বাকী নাই। ছোট বেলায় ওর বিয়ে হয়েছিল, প্রাপ্ত বয়স্কা হতে ওর স্বামীটা ওকে যেন ছিঁড়ে খেত। তারপর জীবন বিপর্যয়ের পালা। ওখানেও ওর জীবনে কয়েকটি পুরুষ এলো। ওর দেহতনুটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে। সবই তো তার শেষ হয়ে গেছে। এই শূন্য দেহটা খালি পড়ে আছে। এর আর বাছ বিচারের দরকার কি? তাই সে বিপ্লবের বুকের উপর শুয়ে পড়ল।

তখন বিপ্লব বলল, তোমার বিয়ে হয়েছিল?

হ্যাঁ –!

কোথায়?

মাদারীপুরে।

তোমার নাম কি?

অমিতা নস্কর –!

স্বামীর নাম?

বলতে নেই –

ছেলে পুলে হয়েছে?

না –

তোমার শ্বশুর বাড়ীতে আর কে কে আছেন?

ছিল সবাই, এখন আর কেউই বেঁচে নাই –

কি করে মরল –?

সে অনেক কথা। তবে এইটুকু বলতে পারি-প্রায় মাস দেড়েক আগে একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে অনেকগুলো খান সেনা আমাদের গ্রামটা পুড়িয়ে দিয়ে লুট-পাট করে অধিকাংশ লোককেই গুলি করে মেরে দিয়েছিল। যারা পালাতে পেরেছিল তারা পালিয়েছিল।

তুমি কি করে জানলে যে তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী-আত্মীয় স্বজন-স্বামী, সব মরে গেল।

ওরা আমার সামনেই তো গুলি করে মারলে –

তারপর – ?

তারপর আর কি হয়েছিল জানি না-মনেও নাই। আমার যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম – আমি নির্যাতিতা। আমার কাপড় জামা কিছু নাই, সমস্ত শরীর রক্তে ভেসে গেছে, তখনও তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে। গায়ে যেন একটুও বল নাই। কোন রকমে টলতে টলতে একটু গিয়ে দেখলাম আবার কাপড়টা জঙ্গলে পড়ে রয়েছে। গাঁয়ে ঢুকেই দেখি সব বাড়ী ঘর পুড়ে গেছে। তখনও আগুন জ্বলছে। লোকজন একটাও নাই, রাস্তা ঘাট রক্তে রাঙা হয়ে রয়েছে, তবে মৃতদেহগুলো নাই, বোধ হয় ওরা তুলে নিয়ে গেছে। আমি তখন পাগলের মত গাঁ থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম। যে ছেলেটি আপনাকে ডেকে এনেছে ও আমাদের গাঁয়েরই ছেলে। ওকে মাঠে কাঁদতে দেখে সঙ্গে করে নিয়ে পালিয়ে এলাম।

তারপর –?

তারপর –! তারপর আমরা রাত্রিটা একটা গাছতলায় কাটালাম। সকাল বেলায় আবার চলতে লাগলাম। আমার কানের দুল দু'টো ওরা টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল। আর হাতের চুড়ি ও বালা দুটো এমন জোড়ে খুলে নিয়েছিল, হাতের ছাল উঠে ঘা হয়ে গিয়েছিল। স্তন দুটোয়ও অত্যন্ত ব্যথা, আমার সর্ব্বাঙ্গে তখন এত ব্যথা যেন চলতে পারছিলাম না। গোলা বলেছিল, দিদি চল, আমরা হিন্দুস্থানে পালাই –

বিপ্লব বলল, গোলা কে?

ঐ যে ছেলেটি – আপনাকে সঙ্গে করে এখানে এনেছিল, ওর নাম গোলক। লোকে ওকে গোলা বলেই ডাকে – ।

ও এখন কি করছে?

ও খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে।

বিপ্লব বলল – তারপর?

কিন্তু আমরা তো হিন্দুস্থানে যাবার রাস্তা জানি না। তাই মেঠো পথ ধরে সারারাত চলতে চলতে আমরা ভর্ত্তি দুপুর বেলায় একটা ছোট নদীর ধারে এলাম। গোলাকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে এসে আমি ঐ নদীতে কাপড় চোপড় কেচে গা হাত ধুয়ে একটু জল খেয়ে নিয়ে আবার সেই গাছতলায় ফিরে এসে দেখলাম গোলা ঘুমিয়ে গেছে। ঐ গাছটার চারিধারেই বিচ্ছিন্ন জঙ্গল। ওকানে কোন রাস্তাও ছিল না। তাই ভাবলাম এই যায়গায় কোন লোকজন আসার সম্ভাবনা নাই। তাই ভেবে আমি ভিজে সায়াটা পাশে শুকুতে দিয়ে কাপড়ের আধখানাও বিছিয়ে শুকুতে দিলাম এবং আধখানা কাপড়ে নিজের বুক ও হাঁটু পর্য্যন্ত ঢেকে শুয়ে পড়লাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি-তা আমি একদম জানতে পারি নাই।

বিপ্লব ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে বিমর্ষ ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। সে উঠে বসল এবং বলল, তারপর?

তারপর আমার যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন যেন মনে হ'ল আমার উপর কে যেন শুয়ে রয়েছে, আমায় নিয়ে যেন কে নাড়াচাড়া করছে। কিন্তু তখন আমি এত অবসন্ন ও ক্লান্ত যে কিছুতেই চোখ খুলতে পারলাম না, কিছুতেই আমার ঘুমটা যেন ভাঙ্গতে চাইছিল না।

তারপর –?

তারপর অতিকষ্টে চোখের পাতা খুলে দেখি আমার গায়ের কাপড়টা সরান রয়েছে, একটা কুৎসিৎ কদাকার পুরুষ যেন ছুটে পালাচ্ছে। আমি তখন উঠে বসলাম। দেখলাম হ্যাঁ, ঐ পশুটা নির্জন মাঠের মধ্যে একটা ঘুমন্ত নারীকে পেয়ে তার উপর অত্যাচার করে গেল। আমি তখন যেন মরণ ঘুম ঘুমিয়ে ছিলাম।

অমিতা নস্কর এই কথাগুলো বলতে বলতে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। তার চোখ যেন আগুন জ্বলতে লাগল। ও আবার বললে, পুরুষ মানুষ যে এত পশু হতে পারে তা আমি এতদিন ধরে দেখে আসছি। একটা ঘুমন্ত নারীর উপর এই ধরনের অত্যাচার যে কেউ করতে পারে – এবং অত্যাচার করলেও যে সে নারীর ঘুম ভাঙ্গেনা এ আমার কল্পনাতীত; নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় নিজের ওপরে বড্ড ঘৃণা হ'ল। ভাবলাম এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরব। আমার এ

জীবন রাখার আর কোন প্রয়োজন নাই। গলায় দড়ি দেব কি দেব না – এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মনে এলো, আমি তো মরবই – তবে মরার আগে অত্যাচারীদের একজনকে মেরেতবে মরব। তাই প্রতিশোধের আশায় আবার বাঁচতে চাইলাম।

বিপ্লব অমিতার এই কথায় লাফিয়ে উঠল। সহসা তার পিঠ চাপড়ে বলল – ঠিক! ভেরি গুড আইডিয়া। তুমিই তো বাংলার আদর্শ মেয়ে! তারপর –?

তারপর পথ চলতে চলতে একটা গাঁয়ে এক মুসলমান বুড়ী আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। বলেছিল, তারাও হিন্দুস্থানে পালাবে। আমি ভাবলাম, যাক্‌গে অন্তঃত একটা কিছু কিনারা হবে। কিন্তু দেখলাম, সে আশ্রয়ও আমার নিরাপদ নয়। একদিন ঐ বুড়ী বাড়ীতে ছিল না – তখন তার নাতি আমায় নির্জন ঘরে পেয়ে জাপটে ধরে ফেলেছিল। আমিও তখন তাকে লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দিয়ে ঘর ছেকে বেরিয়ে এসে আবার গোলার হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম।

তখন এ দেশে চলেছে অরাজকতা। চারিধারে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, গোলাগুলি, খুন, জখম। এখানে আমরা কি করে যে পৌঁছেছিলাম জানি না। তবে যে ধারেই যাই, সেখানেই শুনি ওধারে পাকিস্থানী ফৌজ আছে। আমাদের এই পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে আমায় এখানে নিয়ে এসেছিল। সেই এ ঘর দিলে, খেতে দিলে –। তারপর –! এই কথাগুলো বলে অমিতা বিপ্লবের কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। সে চোখ বুজে থেকেই বলল, এই আমার ব্যবসা! সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীর ধারে আমি রোজ বেড়াতে যাই। এর মধ্যে তিন দিন তিনটে সৈন্যকে দেহ বিক্রীর আশা দিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে প্রণয় করেছি, সব কিছু করেছি – আমার দেহটা তাকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছি – আবার তারই বুকে উঠে কণ্ঠনালীটা আমার ছুরি দিয়ে কেটে দিয়েছি। এখন ওরা আর দল ছাড়া বেরোয় না –। এখনও ঐ সুযোগের আশায় আছি, যদি অন্ততঃ আর কয়েকটাকে মারতে পারি –।

অমিতার এ কথায় – বিপ্লব আনন্দে চীৎকার করে উঠে ওর মস্তক চুম্বন করে বলেছিল – তুমি আমার উপযুক্ত বোন, আমি তোমার দাদা – আমাদের সব হারিয়ে গেছে – আমরা রিক্ত, নিঃস্ব, আমরা এর জবাব দেবই দেব, আমাদের জিনিষ সব আমরা ফিরে পাব – আমরা প্রতিশোধ নেব। এই বলে বিপ্লব খাট থেকে নেমে এসে বলল, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন হবে, আমার অনেক জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে – আবার আমাদের পরে দেখা হবে, দিদি – চলি –! এই বলে বিপ্লব তড়িৎ গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল মফিজের বাড়ীর দিকে।

অমিতা বলেছিল, দাদা এখন দিন সময় বড্ড খারাপ। দিনের বেলাতেই মানুষের বেরোন দায়ের কথা। তুমি আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে গেলেই পারতে।

কিন্তু বিপ্লব ওর কথা না শুনেই চলে গেল।

মফিজ কিন্তু সেদিন রাত্রে আর বাড়ী ফেরে নাই। তাই বিপ্লবকে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মফিজের বেগমটা খুবই সুন্দরী এবং সরল প্রকৃতির লোক। এর আগে ও মফিজের কাছে বিপ্লবের নাম শুনেছিল। তাই বিপ্লবকে আদর যত্ন করে বৈঠকখানা ঘরে থাকতে দিয়েছিল – এবং যথাসাধ্য অতিথি সৎকারও করেছিল।

মফিজ ভোর রাত্রে অনেক লোকজন ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ফিরেছিল। মফিজ বিপ্লবকে বলেছিল, কাল সকালে পরামর্শ হবে – তাই হয়েছিল। যাবতীয় কথাবার্ত্তা সেরে বিপ্লব ওর লোকজন ওখানে রেখে দিয়ে ফেরার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

বিপ্লব অনেক দূর চলে এসেছিল। প্রতিটি পদক্ষেপে আজ এই নুতন জায়গাটির সহস্র স্মৃতি তার মনোরাজ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মাঝে মাঝে অমিতা নস্করের উন্মুক্ত বক্ষদেশ, তার পেশা – নিজ হাতে পাকিস্থানী সৈন্য মারা – আবার লায়লার বোকামি, লায়লার সুশ্রী দেহতনু, রশ্মির চেহারাটা, জব্বরের কুটিলতা, সব মিলে-মিশে তাকে যেন অবশ করে তুলেছিল। সে একটা গাছ তলায় বসে পিছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে রইল। বারংবার ভাবতে লাগল, অমিতা আর গোলাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই যেন ভাল হত। আবার ভাবল, দূর ছাই, এদেশে এখন হাজার হাজার অমিতা রয়েছে।

এমন সময় তার কানে ভেসে এলো বন্দুক ও কামানের গর্জন। – দেখল সেই শহরটাই পাকিস্থানী সৈন্যরা আক্রমণ করেছে। ও আবার ফিরে এলো ওখানে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার শহরে ঢুকে দেখল – শহরটি জনশূন্য। মফিজের বাড়ী ঘর ভস্মীভূত, সর্ব্বত্র রক্তে ভেসে গেছে। তখনও রাস্তার উপর দু'দশটা লাশ পড়ে রয়েছে। তখন বিপ্লব অমিতার সন্ধানে এসে দেখল সমস্ত বাড়ীগুলোই খালি পড়ে রয়েছে, লোকজন কেউই নাই। অমিতার বাড়ীতে ঢুকে দেখল, গোলা আর অমিতা উঠানের উপর মৃত। অমিতার হাতে আলগা মুঠিতে ধরা একটা রক্তাক্ত ছুরি।

বিপ্লব আর ওখানে দাঁড়াতে পারে নাই। পাগলের মত ছুটে পালিয়ে এসেছিল। একটা পাগল রাস্তায় কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর বলছিল, 'জয় বাংলা', 'জয় মফিজ রহমান কি জয়।'

ঐ পাগলটার কাছেই বিপ্লব শুনেছিল এখানে আজ প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। দু পক্ষেরই লোক মরেছে প্রচুর। তবে শেষ পর্য্যন্ত মফিজের দলের গোলাগুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় তারা ভেগে পালিয়েছিল। তখন আরও অনেক পাকিস্থানী সৈন্য এসে এ শহরটা ধ্বংস করে দিয়ে গেল – । দু তিন ঘণ্টা ধরে কেবল চলেছে, লুণ্ঠন, নারী হরণ, ধর্ষণ, বলাৎকার, খুন আর আগুন।

ছয়

সাবিত্রী আর নন্দিতাকে নিয়ে লায়লার মন্দ কাটছিল না। কিন্তু ইদানিং জব্বর আর রশ্মি ঐ বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়ে এমন নির্লজ্জ বেলেল্লাপনা আরম্ভ করেছে যে তা দেখে দেখে লায়লা যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল। সাবিত্রী ওকে নিজের দিদির মতই ভক্তি করত। লায়লাও ওকে ভালবাসত মন প্রাণ দিয়ে। উভয়ের ভালবাসা দিন দিন গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠেছিল।

লায়লার তবু যেন আজকাল কিছুই ভাল লাগত না। বিপ্লব আজকাল যেন ওকে বড্ড দূরে দূরে রাখতে চায়। আসে না বললেই হ'ল। অথচ ঐ বিপ্লবের জন্য ওর প্রাণটা যেন আনচান করে। এক এক ময় বিপ্লবের জন্যে ও কেঁদেই ফেলত। ওর কেবলই মনে হয়, দুজনায় একসঙ্গে খাওয়া থাকা বসা বেড়ান কাজকর্ম – সব হলেই যেন ভাল হয়। ও তাহলে আর কিছুই চায় না। মরতে যদি হয় দু'জনায় এক সংগে মরা – তাও ভাল। কিন্তু তা আর হবার নয়। কারণ, লায়লার ভুলের জন্যেই তাদের গোপন সূত্র পাকিস্থানী ফৌজরা পেয়েছে এবং তার ফলও খুব ক্ষতিকারক হয়েছে। লায়লা তার প্রতিবিধানের দায়িত্বও নিয়েছে।

এ সংসারে যে জিনিষ হাতের কাছে থাকে, মানুষ তাকে তত যেন কাছে পেতে চায় না, কিন্তু সেই জিনিষই দূরে থাকলে তার উপর আসে প্রচণ্ড আকর্ষণ। বিপ্লব দূরে থাকার জন্যে – তার উপর লায়লার এত প্রচণ্ড আকর্ষণ হয়েছিল যে তা যেন ক্রমশঃ সহ্যাতীত হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই রাত্রে ওর ঘুম ভেঙ্গে যেতো আর কিছুতেই যেন ঘুম আসতে চাইত না।

ঐ রকমই একটা রাত। রাত বোধ হয় তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অনিদ্রিতা লায়লা খুব সন্তর্পণে বারান্দায় পায়চারি করছিল। তখন ওর মনের পর্দায় একাধিক প্রসঙ্গের ছবিগুলি নির্বাক চলচ্চিত্রের মতই ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছিল। পরে যখন বিপ্লবের ছবিখানা ওর সামনে এলো তখন যেন তাকে নিয়ে ও কত আনন্দ ও সুখ উপভোগ করতে লাগল। এমন সময় নারী কণ্ঠের তিরস্কার ওর কানে আসতেই ওর চিন্তাজাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। ও শন শন করে এগিয়ে গিয়ে রশ্মির ঘরের দরজার কাছে কান লাগিয়ে আড়ি পেতে বসে রইল। ও পরিস্কার বুঝতে পারল, ওর ঘরে জব্বর ঢুকেছে।

রশ্মি জব্বরকে যেন ধমকের সুরে বলেছিল, তুমি যা করেছ – করেছ। আমি সবই মেনে নিয়েছি। কারণ, আমরা উভয়ে যখন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছি তখন তুমিও আমার – আর আমিও তোমার। তাই বলে সব জিনিষেরই তো একটা সীমা আছে।

জব্বর যেন বলে উঠল, সীমার বাইরে আর আমি গেলাম কোথায়?

সীমার বাইরে নয় তো কি? তোমাকে আমি বার বার বলেছি না – আমার দেহটাকে নিয়ে তুমি যা খুসী করতে পার, আমিও তাই চাই, কিন্তু কোন দিন আমার বুকে হাত দিও না।

জব্বর যেন মিনতির সুরে বলল, দোহাই রশ্মি, আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এমন কেলেঙ্কারী ক'র না।

কিন্তু ঐ কথায় রশ্মির রাগ কমল না সে – তেমনি ঝাঁজিয়ে বলতে লাগল, তোমাদের মত হ্যাংলা পুরুষদের জন্যেই মেয়েদের দেহের বাঁধন নষ্ট হয়ে যায়।

জব্বর এ কথার আর যেন কোন জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরে ও বাড়ী থেকে বেড়িয়ে চলে গিয়েছিল। এতে কিন্তু রশ্মির কোনরূপ মানসিক অশান্তি হয় নাই বলেই মনে হয়। কয়েকদিন পরে রশ্মিকে আর দেখতে পাওয়া যায় নাই। জব্বরকে জিজ্ঞাসা করলে বলত – জানি না।

বিপ্লব আধমরা হয়ে অনেক রাত্রে ফিরে এসেছিল। ওকে দেখে লায়লার প্রাণ ককিয়ে উঠেছিল। ওর গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল, বিপ্লব তুমি বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি পারবে কেন এত সব ধকল সইতে?

বিপ্লব তার উত্তরে বলেছিল, হয় শরীর পাতন, নয় মন্ত্রের সাধন – লায়লা বলেছিল, ওটা ঠিক কথা! তাই বলে শরীরটাই যদি নষ্ট করে ফেল তাহলে আমি কি নিয়ে বাঁচব? বিপ্লব – তোমায় সত্যি কথাটা খুলে বলি শোন – আমি নিজেকে কণ্ট্রোল করতে পারছি না। আমার উপর নুরুল আর তুমি যত বোঝা চাপাবে চাপাও – সব আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব, আমার কোন অসুবিধাই তাতে হবে না – কিন্তু তোমাকে আমার কাছে থাকতে হবে। অন্ততঃ প্রতিদিন যেন তোমায় একবার করে দেখতে পাই।

বিপ্লব বলেছিল, তাই কখনও হয় নাকি? এতবড় একটা মিলিটারী পাওয়ারের বিরুদ্ধে কয়েকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্ত্র নিয়ে লড়তে গেলে, আর গোটা দেশটা জুড়ে গণবিপ্লব করতে গেলে – স্থান কালের বাছবিচার করলে চলবে না। তোমাকে ধরে নিতে হবে আমি মরে গেছি।

বিপ্লবের এই কথায় লায়লা যেন ভয়ে আঁতকে উঠল, সে বিপ্লবের বুকে মাথা রেখে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, না-! না- না-! আমি তোমাকে কিছুতেই মরতে দিতে পারব না – । আমার সর্ব্বস্ব চলে গেছে। আমাদের এমন সুন্দর বাড়ীটা এখন মিলিটারী ব্যারাক হয়েছে। মা-বাবা ভাই, বোন, ধন সম্পত্তি সব চলে গেল; তবু আমি বেঁচে আছি, বাঁচতে চাই – বাঁচার মতই বাঁচতে চাই। আর সেই বাঁচার জন্যেই আমার চাই তোমাকে; তুমি আমার হৃদয়ের মানিক, তোমায় আমি কোন মতেই ছাড়তে পারবনা –। তোমায় যদি কেউ কেড়ে নিতে আসে – সে আর এমনি এমনি পারবে না, আমার হৃদয়খানাকে খান্ খান্ করে চিরে তবে তোমাকে বার করে নিয়ে যেতে পারবে – তাছাড়া নয়।

বিপ্লবও লায়লাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, তা তো নিশ্চয়ই –। তুমিও তো আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব। তোমাকে ছেড়ে বুঝি অমিও থাকতে পারি?

লায়লা অভিমানের সুরে বলল, না – পারনা –! এখানে এসে থেকেই তো তুমি আমাকে ছেড়ে ছেড়ে কেবল এখানে ওখানে যাচ্ছ। বলতো – আমি কি করে থাকি?

বিপ্লব বলল, না গিয়ে উপায় কি বল? তুমি কি ভুলে গেছ, কাকলি আর লুৎফাকে –?

বিপ্লবের এই কথায় লায়লা জ্যামুক্ত ধনুকের মতই সহসা তাকে ছেড়ে দিয়ে তার মুখটা একহাতে চাপা দিয়ে বলল, আবার ঐ কথা? তুমি কি আমায় একটুও সুস্থির হয়ে বাঁচতে দেবে না বিপ্লব? শুধু শুধু সেই অপ্রয়োজনীয় পুরোন কথাগুলো তুলে কেন আমার মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছ? যা পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে – ছাইভস্মগুলোও ধুয়ে মুছে কোথায় চলে গেছে কে জানে, সেই সব কথাগুলো আবার তুলে কি লাভ আছে বল?

বিপ্লবের খেয়াল ছিল না। ঐ সব কথাগুলো মনে করলে যে কোন সুস্থচিত্ত ব্যাক্তিরও মাথা গরম হয়ে যায়। লায়লাও কতকটা তাই-ই হয়েছে। তবে প্রতিশোধের নেশায় – আর তার ভালবাসার আশায় ও এখনও বেঁচে আছে, বাঁচতে চাইছে। ও-সব কথা ওর মনে পড়লেই আবার ওর মাথায় রক্ত উঠে পড়বে, তখন আর ওকে প্রকৃতিস্থ করাই দায়ের ব্যাপার হয়ে পড়বে –। তাই বিপ্লব ও-ই প্রসঙ্গটা বদলনোর জন্যে তাড়াতাড়ি বলল,-ই-স-! আমরা তো বহ্নিশিখা! আমরা জ্বলব, জ্বালাব, ব আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেব। আমরা বারবাবহ্নি, আমাদের লেলিহান শিখা প্রসারিত হবে সমগ্র দুনিয়াব্যাপী তাতে ভস্মীভূত হয়ে যাবে ইয়াহিয়ার মত নরপশুর দল, এ ধরণী হবে পবিত্র, ক্লেদমুক্ত।

লায়লা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে চিৎকার করে বলে উঠল, বিপ্লব, থামাও, থামাও তোমার ঐ সব তত্ত্বকথা –! তারপর সে যেন একটু হাঁপ নিয়ে বলল – বিপ্লব তুমি এখন কি খাবে?

লায়লার এ প্রশ্নে বিপ্লব যেন অনেক সহজ হয়ে উঠল। বলল, ক্ষিধেয় নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে। তুমি এখন যা দেবে – তাই খাব।

লায়লা সহসা ওর মুখটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে এসে একটা চুমু খেয়ে বলল, উপস্থিত এই – এরপর খাবার আনছি। তুমি হাত পা ধুয়ে মুছে ততক্ষণে সুস্থ হয়ে নাও। এই বলে লায়লা তড়িৎ গতিতে কক্ষান্তরে চলে গেল।

বিপ্লব স্নান করে, জামাকাপড় বদলিয়ে সুস্থ হয়ে বেশ পরিপাটি হয়ে এসে বসল। লায়লা ওকে খাবার এনে দিল। বহুদিন পরে আজ হঠাৎ লুচি মিষ্টি ইত্যাদি ভাল খাবার পেয়ে বিপ্লব বলল, এ কি? এ সব তুমি কোথায় পেলে?

লায়লা বলল – জব্বর কোথা থেকে যোগাড় করে এনেছে।

বিপ্লব খেতে খেতে বলল – ভাল! তোমাকে ভাল মন্দ না খাওয়ালে জব্বরের যেন কিছুতেই মন ওঠে না।

লায়লা বলল – ঠিক বলেছ, ও যেন কেমন ধারা হয়ে উঠেছে। দিন রাত আমার কাছে ঘুর ঘুর করতে চায়। মনে হয় ও আমার প্রেমে পড়তে চায়।

বিপ্লব বলল, এ-তো খুব ভাল কথা! এমন সুন্দর মওকা যেন তুমি ছেড়ে দিও না!

বিপ্লবের এই কথায় লায়লার ভ্রু-দু'টো যেন ঈষৎ কুঁচকে গেল। সেও সহাস্যে বলল, চেষ্টা করছি ও'র প্রেমে পড়ার। বিপ্লব মুখে খাবার পুরে চিবোতে চিবোতে বলল – ঠিক! তবে খুব সাবধান –! ও ছেলে ভাল নয় –!

তাইতো ভাবনা –! কোন দিন বে-ইজ্জত হয়ে যাব কিনা – তাই ভাবছি।

ওটা অবশ্য ভাবনার কথা। তবে যতটা পার সাবধান হয়ে থাকবে।

তা থাকব – তবে ওকে দিয়েই সেই মেজরটাকে এনে বন্দী করতে হবে। তার জন্যে যা করার দরকার তা আমি অবশ্যই করব। তাতে যদি প্রয়োজন হয়, আমার এই দেহটাকেও ওর কাছে বাঁধা রাখতে – তাও রাখব। বিপ্লব লায়লার এই কথায় চমকে উঠে বলল – ইস; এ কি বলছ! আমি আজই এ পৃথিবী থেকে ওকে সরিয়ে দেব।

লায়লা বলল, না! তা তুমি পারবে না, পাবে না – । তুমি যদি কথা দিতে পার সেই মেজরটা, যে আমার লুৎফা আর কাকলির উপর টর্চার করে মেরে দিয়েছে, তাকে বন্দী করে এনে দিতে পারবে – তা হলে আমি নিজে হাতেই ওকে গুলি করে মেরে ফেলব। আর তা যদি না পার, তা হলে, আমি যে কোন ছলে বলে কৌশলে তাকে ওর হাত দিয়েই বন্দী করব। এ আমার জীবন মরণ প্রতিজ্ঞা – আর ওরই জন্যে এখনও আমি বেঁচে আছি।

বিপ্লব বলল, একটি অমন দুর্ভেদ্য ক্যাণ্টনমেণ্ট ধ্বংস করার মত শক্তি এখনও আমরা অর্জন করতে পারি নাই। আমাদের এ যুদ্ধ গেরিলা যুদ্ধ – গোপন যুদ্ধ। সেই মেজরটাকে বন্দী করে তোমায় এনে দিতে পারব কিনা তা আমি জানিনা।

তবে আমি যা করি – তা তুমি চোখে দেখে যাও।

কিন্তু তাই বলে এইখানেই যে আমাদের জীবনটা শেষ হয়ে যাবে এমন কোন কথা নাই।

তার মানে – আমরা হয়ত আরও অনেকদিন বাঁচব।

তা-বাঁচলামই বা-তাতে তোমার কি ক্ষতি হবে?

ক্ষতি? ক্ষতি কি হবে না হবে তা আমি জানি না। তবে তুমি ঐ জব্বরের সঙ্গে মেলামেশা করলে ক্ষতি হতে পারে।

বিপ্লবের এই কথায় লায়লা হো হো করে হেসে উঠল। তার সেই হাসিতে গোটা ঘরটা যেন কেঁপে উঠল। সে সহসা সেই হাসি থামিয়ে বলল – আচ্ছা বিপ্লব, তুমি এখন হিন্দু না মুসলমান?

বিপ্লব লায়লার এ-হেন প্রশ্নে যেন ঘাবড়ে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, কেন বল তো?

এমনি এমনিই – জানতে ইচ্ছা করছে।

বিপ্লব বলল, মানুষ কোন কিছু এমনি এমনিই জানতে চায় না, তার পিছনে কিছু না কিছু কারণ থাকেই।

লায়লা বলল, তুমি আগে আমার কথার জবাব দাও তারপর বলব। বিপ্লব বলল আমি হিন্দু কি মুসলমান – তা তো ভেবে দেখি নাই।

লায়লা সহাস্যে বলল, তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। বিপ্লব চরম ঔৎসুক্যে বলল – কেন, কেন?

লায়লা বলল, আবার 'কেন'? তুমি মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করছ, মুসলমানের হাতে খেয়েছ, মুসলমানকে নিয়ে ঘর কর – এই জন্যে।

বিপ্লব বলল, তোমার ও কথাটা ঠিক নয়।

লায়লা বলল, না তোমার কথাটাই ঠিক নয়। তুমি মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করলে জাত হতে খারিজ হয়ে যাবে।

বিপ্লব বলল, ও যুক্তি মানি না।

তুমি না মানলেও হিন্দু ধর্ম্মের কিছু যায় আসে না। তবে তুমি যে আর হিন্দু থাকতে পারবে না তার নজির গাদা গাদা রয়ে গেছে, যদি প্রমাণ চাও, তাও আমি দিতে পারি।

একটা উদাহরণ দাও।

লায়লা সহাস্যে বলল – উদাহরণ? উদাহরণ তোমাদের রাজীব, যে রাজীব ঐতিহাসিক 'কালাপাহাড়'। যবন কন্যাকে বিয়ে করে সে হিন্দুধর্ম্ম হতে খারিজ হয়ে গিয়েছিল, তার বাবা মা-ও তাকে ত্যাগ করেছিল, সমাজ তাকে পরিত্যাগ করেছিল।

লায়লার এই কথায় বিপ্লব যেন আর কোন উত্তর খুঁজে পেল না। সে বলল – সে কোন মন্ধাতার আমলের কথা।

লায়লা বলল, তোমাদের সমাজ আর ধর্ম্মের সেই গোঁড়ামিটা এখনও চলে আসছে। মুসলমান ধর্ম্মে কিন্তু এই গোঁড়ামি নাই। এই ধর্ম্ম বড় উদার! যে কোন ধর্ম্মের লোক এই ধর্ম্মে এলে তাঁকে আদর করে গ্রহণ করা হয়। যে কোন ধর্ম্মের-যে কোন লোকের জন্যে আমাদের ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত।

লায়লার কথায় বিপ্লব যেন ক্রমশঃ ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। তার মুখে আর যেন কোন জবাবই বার হ'ল না।

লায়লা আবার বলল – জান বিপ্লব; হিন্দুধর্ম্ম বড় কঠিন, বড় সংকীর্ণ। তোমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি অবশ্য বিশেষ কিছু জানি না, তবে এইটুকু জানি – তোমাদের ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মের মত উদার নয়। যে ধর্ম্ম উদার নয়, যে ধর্ম্ম তার ভক্তদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে পারে না, সে ধর্ম্মের উপর আস্থা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বিপ্লব লায়লার এই সমস্ত কথায় যেন ক্রমশঃ ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। সে অভিজাত ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে। তার ধমনীতে বইছে – ব্রাহ্মণের শোনিত প্রবাহ। সে মানবে কেন লায়লার এ হেন অপবাদ। তাই সে বিরক্ত হয়ে উঠে বলল, তার মানে? তুমি কি আমার ধর্ম্মের নিন্দে করছ?

লায়লা বলল, তোমার প্রশ্নটা বড় ছেলেমি পারা।

কেন – কেন?

তা নয় তো কি? এ সব হচ্ছে যুক্তির কথা!

যেমন – একটা উদাহরণ ও যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও না।

লায়লা বলল, অত উদাহরণ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। তবে আমার মোটা বুদ্ধিতে যা জোটে আমি তা-ই বললাম।

লায়লার এই কথায় বিপ্লব বলল, তুমি আজে বাজে চিন্তা আর কথা নিয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করছ। আসলে তুমি যে কি বলতে চাইচ তা-ই আমি বুঝলাম না।

লায়লা বলল, না বোঝার আর কি আছে? এত বড় একটা হিন্দুপ্রধান দেশ, এত হিন্দু থাকা সত্ত্বেও এই দেশটা কয়েকটা মাত্র মুসলমান এসে জয় করে নিয়ে গেল – অথচ কোন প্রতিকার ও বাধা এলো না! ওরা যেন পড়ে পড়ে মার খাওয়ার জন্যেই জন্মেছে।

বিপ্লব বলল, এমন অত্যাচার মুসলমানদের উপর কি কখনও হয় নাই? লায়লা বলল, হয়েছে না হয় নাই সে কথা নয়। তবে এত হিন্দু থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে পরাধীনতা, হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষে একটা অপকলঙ্ক। এ সত্য তুমি কেমন করে – কোন যুক্তিতে উড়িয়ে দেবে বিপ্লব? আর এ যে সবই ঐতিহাসিক সত্য। আমরা যাই মানি ছাই না মানি – ইতিহাসকে তো আর না মেনে পারব না।

বিপ্লব মাথা নেড়ে বলল, তা সত্যি।

তবে? আমার আফশোষ কি জান? আমার আফশোষ হিন্দু ধর্ম্মটা যদি অতটা গোঁড়া না হ'ত, সকলকে নিয়ে অন্ততঃ বছরে একদিনও এক সঙ্গে ভগবানের উপাসনা করতে পারত, তা হলে হয়ত ওদের একতা বেড়ে হাজার গুণ শক্তিশালী হয়ে উঠত। ঐ হিন্দুরা তা হলে অত্যাচারিত হতে পারত না অন্ততঃ – যেমনি মুসলমানরা, মসজিদে এক সঙ্গে নামাজ পড়ে।

বিপ্লব বলল, তোমার এ কথাটা খুবই সত্যি।

লায়লা বলল, সত্যি নয়তো কি –! রাজা রামমোহন রায় কি কম পণ্ডিত আর গুণী ব্যক্তি? তিনিও অতিষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নইলে তো গাদা গাদা হিন্দু সেদিন খৃষ্টান হয়ে যেতো।

লায়লার এই কথায় বিপ্লব বলল, যাক্‌গে তোমার ওসব কথা – এখন ওসব আর ভাল লাগেনা।

লায়লা বলল, ভাল না লাগলে উপায়ই বা কি? তুমি মুসলমান মেয়ে বিয়ে করছ।

তাতে কি হয়েছে –?

হবে আবার কি? মুসলমান ধর্ম্মে একটা স্ত্রীলোক সাতটা পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করলেও কিছু যায় আসে না – কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে ওটা একদম বারণ, তবে হিন্দুদের পুরুষরা সাতটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।

বিপ্লব বলল, ওটা ধর্ম্মের আওতায় নয়, সমাজ ব্যবস্থার ফলাফল।

লায়লা বলল, সমাজ তো ধর্ম্মের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে।

বিপ্লব বলল, তা তো ভেবে দেখি নাই।

দ্যাখ নাই – তো দ্যাখ।

বিপ্লব যেন আর পারছিল না। ও বড় ক্লান্ত। তাই বলল, এখন অনেক রাত। ও সব ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে এত রাত্রে কচকচানি না করলে তোমার কি এখন চলছিল না –? ও সব আমার একদম ভাল লাগে না। বিপ্লবের এই কথায় লায়লা যেন সহসা বদলে গেল। সে সানন্দে বিপ্লবকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, ভুল হয়ে গেছে। এ আমার জব্বর ভুল।

বিপ্লব যেন বিষিয়ে উঠেছিল। তার মন যা চায় সে তাই করছে ও করেছে। এখানে ধর্ম্ম আর সমাজের ছায়া আনলে সব যেন ভেস্তে যেতো। কি দরকার ওসব ভাবনা ভাববার? তাই সেও নিজেকে সহজ করে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। বলল–আমার যা পাওনা, তা সবই তোমার মধ্যে রয়েছে, তবে অনর্থক অনর্থের সৃষ্টি করার দরকার কি?

লায়লা বলল, ঠিক বলেছ – আজ থেকে কিন্তু আমি তোমায় আর একদম ছাড়ব না। সর্বদা আমার সঙ্গেই থাকতে হবে। একবার ভেবে দেখতো – আমাদের এই ভরা যৌবন বসন্তের আগুন ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে বাতাসে, মনে প্রাণে,

সর্বত্র। বলতো আমি তোমায় ফেলে একা একা কেমন করে থাকি? বিপ্লব – তুমি যেন আর কিছুতেই আমায় ছেড়ে যেও না।

বিপ্লব যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। তাই সে বলল, বেশ তো – যতটুকুই সময় পাব ততটুকুই তোমার কাছে কাটাব।

লায়লা বলল – কাটানো নয় – কাটানো নয় – তুমি আমাকে নিয়ে থেসে দলে একাক্কার করে দেবে। তবে তো তুমি পুরুষ!

বিপ্লব তবু যেন কেমন নিশ্চল হয়ে রইল।

লায়লা তখন বলল-দজান বিপ্লব, রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমার কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না, খালি মনে হয় তুমি যদি আমায় জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতে তা হলে কেমন ভাল হ'ত। আচ্ছা বিপ্লব, রাত্রে বিছানায় একা একা শুয়ে তোমার ঘুম আসত?

বিপ্লব বলল – না, তোমাকে ফেলে কিছুতেই ঘুম আসতে চাইত না।

লায়লা বলল – তখন তোমার কি মনে হ'ত?

তোমার যা মনে হয় – আমারও ঠিক তাই-ই মনে হ'ত।

সত্যি কথা? কই, আমার গায়ে হাত দিয়ে বল – লায়লার কথামত বিপ্লব ওর গায়ে হাত দিয়ে বলল, – সত্যি! আমি কল্পনার চোখে তোমাকে যেন সর্বদাই কাছে পেতাম – তুমি আমার কাছেই থাকতে।

লায়লা আবার বলল – সত্যি?

বিপ্লব তখন বলল – সত্যি নয়তো কি মিথ্যা বলছি?

লায়লা বলল – তবে? ওরে দুষ্টু! এই বলে তখন সে বিপ্লবকে বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর শুয়ে পড়ে বলল, তুমি দূরে থাকলেও সদা সর্বদা আমার মনের মাঝেই তো রয়েছ!

বিপ্লবও লায়লাকে মনে প্রাণে ভালবাসত। কিন্তু ইদানিং অমিতা নস্করের ভাস্বর মুখখানা আর কমনীয় কান্তিটা তাকে যেন বারংবার বিচলিত করে তুলত। তার কেবলই মনে হ'ত সে যদি একটু চেষ্টা করত তা হলে অমিতা হয়তো বাঁচবার সুযোগ পেত। তাই তার অজান্তে অমিতা আর লায়লার প্রতিচ্ছবি তার মনের দর্পণে ঘন ঘন আসা যাওয়া করত।

সেই অমিতা নস্কর – যার প্রতি বিপ্লবের না ছিল একরত্তিনও আকর্ষণ – যে ছিল বিপ্লবের কাছে অপরিচিতা, অনাত্মীয়া; এখন মৃতা। তবু তার কমনীয় কান্তি ও কথাবার্ত্তাগুলো বারংবার লায়লার প্রতি বিপ্লবের অছেদ্য ভালবাসার প্রচ্ছদপটে ছায়ার মত আসা যাওয়া করত তার অজ্ঞাতেই।

বিপ্লব কোথায় যেন কি একটা কাজে বেরিয়ে গেছে, দু' তিনদিন হয়ে গেল তবু ফিরল না। সাবিত্রী নন্দিতাকে সঙ্গে নিয়ে কোন গ্রামে মহিলা সমিতি করতে গেছে চার পাঁচ দিন হয়ে গেল। রশ্মি তো আগেই চলে গিয়েছিল, সে ফেরে নাই – আর কোন দিন ফিরবে বলেও মনে হয় না। জব্বর আজকাল খুবই কম আসে, তাও নানা কাজের অছিলায় একটু থেকেই চলে যায়। যাবার আগে লায়লার দিকে এমন হ্যাংলার মত তাকায় তাতে লায়লার গা-টা যেন ঘেন্নায় রি রি করে ওঠে।

লায়লা এই একা একা থেকে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে নিজেকে আর কিছুতেই সংযত করে রাখতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হ'ত সে যেন পাগল হয়ে যাবে – নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, কাজ কর্ম্ম কিছু নাই, খালি খাওয়া আর শোওয়া। ঘুমেরই বা দোষ কি? সময় অসময় বাছবিচার নাই – ফাঁক পেলেই একটু করে ঘুমিয়ে নেওয়া – এতে ওর একটানা ঘুমের ব্যাঘাতই ঘটে। ও বিপ্লবকে বলেছিল – 'আমি তোমায় ছেড়ে একদম থাকতে পারব

না। তুমি যেখানে যাবে, যা করবে আমিও সেই খানে যাব তাইই করব'; কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ও যুক্তিটা সব যায়গায় প্রযোজ্য হয়ে ওঠে না – এই তো মুস্কিল। তাই হঠাৎ বিপ্লবকে চলে যেতে হয়েছিল, লায়লাকে সঙ্গে নেওয়া যায় নাই।

সঙ্গে নেওয়া তো যায় নাই, কিন্তু লায়লা এখন সময় কাটায় কি করে? তাই তো লায়লার এখন অন্তর্দ্বন্দ্ব; বিপ্লব কেন তাকে একা একা ফেলে রেখে গেল? ও কি বিপ্লবের পাশে থেকে বন্দুক কিংবা রাইফেল চালাতে পারত না? ও-কি যে কোন কাজের উপযুক্তা নয়? ওর শিক্ষাদীক্ষা কি বিপ্লবের শিক্ষাদীক্ষা থেকে কিছুমাত্র কম? বিপ্লব তো ওরই ক্লাশফ্রেণ্ড, বন্ধু, অন্তরঙ্গ, প্রিয় – সব ধার দিয়ে ওরা দু'জনায় সমকক্ষ। তবে?

লায়লা ভাবে, নুরুল ইসলাম যে ওকে কি ভাবে, তা ভাবা যায় না। নুরুল ঠিক ভেবে নিয়েছে লায়লা মেয়েছেলে – তাই ওদের কাজ অন্তঃপুরে, বাইরে নয়। কিন্তু নুরুল ভুলে গেছে, – এটা আর বোরখা পরার দিন নয়, আর একটি পুরুষ ঘরে সাতটা বোরখা পরা বিবি রাখবে সেদিনও নয়, এখন নারী পুরুষ প্রত্যেকেরই সমান অধিকার। পুরুষরা যা পারে মেয়েরাও তা অনায়াসেই পারে। লায়লা এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে কেবলই দূর দিকে তাকিয়ে দেখে, তার কেউ আসছে কিনা! কিন্তু কোথায়-? কাকস্য পরিবেদনা।

লায়লা খাওয়া দাওয়া সেরে শয্যা গ্রহণ করল। তখন রাত আর কয়টা হবে? নয়টা কি দশটা – না হয়ত বড় জোর এগারটা। দূত্তোরি! একটা ঘড়িও নাই যে তা দেখে অন্ততঃ সময়টা জানবে। বিপ্লবের জন্যে ভাতটা ঢাকা দেওয়া আছে। সে আসবে কিনা কে জানে। ঘুমটাও আসছে না কিছুতেই। লায়লা উঠে বসল – এধার ওধার করতে করতে আর আপন মনে নানাপ্রকার ভাবনা ভাবতে ভাবতে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল-বেসামাল হয়ে পড়ল। রাগে ক্ষোভে দুঃখে তার নিজেরই চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছিল। সে বারংবার বিপ্লবকে গালাগাল দিতে লাগল – ই-রেস্পন্সিবল্, নন্‌সেন্স, ইডিয়ট্ –! সে তাকে ভেবেছে কি? আমাকে নিয়ে সে যা খুসী তাই করবে নাকি? সে ঠিক ভেবেছে আমি তার বিয়ে করা ঘরের বউ! কূললক্ষ্মী হয়ে ঘোমটা দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকব। ইডিয়ট্! ঘুরে আসুক না একবার দেখাচ্ছি তাকে মজাটা!

তবু সে এল না।

রাত যত বাড়তে থাকল, লায়লাও তার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার মনে হ'ল এটা তার প্রতি বিপ্লবের ঔদাসীন্য। নুরুল আর বিপ্লব জেনে নিয়েছে, লায়লা অকেজো। এর আগের ঘটনাই তার প্রমাণ। বিপ্লব নিজেই বলেছিল, তোমার এখান থেকেই আমাদের গোপন খবর ফাঁস হয়। ওরা হয়ত এই সব ভেবেই লায়লাকে ওদের ভেতরকার আর কোন খবর জানাতে চায় না – এইটাই ঠিক। তা যদি না হবে তা হলে বিপ্লব কি করে তাকে এই যমপুরীতে একা একা রেখে ডুব দিল? অন্ততঃ তার এটা ভাবা খুবই উচিত ছিল, লায়লা যুবতী ও সুন্দরী। এই ভয়ানক দিনে তাকে এমনভাবে একা রাখা উচিত নয় কিন্তু বিপ্লব তা তো ভাবে নাই – তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো কিছুমাত্র করে নাই, সে বাঁচল কি মরল সে খবর তো বিপ্লব দু'দিন ধরে নিলে না – তবে তার কিসের ভালবাসা? তার সুন্দর চেহারার? তার যৌবনের? তার কামনা বাসনার আকর্ষণের? এই সব ভাবতে ভাবতে লায়লা হা-হা-করে হেসে উঠল। সে পাগলের মত জোরে জোরে হেসে গোটা ঘরটাকে যেন কাঁপিয়ে তুলল। তারপর সে সহসা হাসি থামিয়ে – বলল, ঠিক আছে –! আমিও দেখে নেব, নুরুল আর বিপ্লব কত বাহাদুর – কত বড় মুক্তিযোদ্ধা, কত বড় দেশপ্রেমিক।

এই সব বলে লায়লা আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিপ্লবের কমনীয় কান্তিটা – সরল স্বভাবের কথা, তার মনে পড়ে গেল। এতদিনের তিল তিল করে গড়ে ওঠা উভয়ের ভালবাসা – তাদের দুজনারই বুকে পাহাড় প্রমাণ হয়ে জমে রয়েছে। এ কি কখনও নস্যাৎ হতে পারে? অসম্ভব! বিপ্লব হয়ত বিশেষ কোন কারণের জন্যে আসতে পারে নাই। তাই-ই হবে বোধ হয়!

এই সব ভেবে লায়লা কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। পাশফিরে শু'ল, বার দুই চিৎ হয়ে শু'ল, বার দুই উপুড় হয়ে শু'ল, শেষে মাথার বালিশটাকে পাশ বালিশ করে ঘুমোনর চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম তবু এলোনা।

লায়লা আবার উঠে বসে হাতমুখ ধুয়ে পায়চারি করতে লাগল – তখন রাত অনেক।

লায়লা ক্রমশঃ যেন বেসামাল হয়ে উঠছিল। তার বিক্ষিপ্ত মনটা যেন বল্গাহীন অশ্বের মত যত্রতত্র প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলছিল, সে আর রোখা যায় না।

সেই সময় হ্যারিকেনের তেলটাও ফুরিয়ে গিয়ে পলতে পুড়তে লাগল। লায়লা কয়েকবার দমটা তুলে দিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার সে চেষ্টা বৃথা, পলতেটা প্রায় গোটাই পুড়ে গেল, আলোও নিভে গেল। তখন লায়লা যেন আরও ক্ষেপে উঠল। সে রাগে দুঃখে নিজের চুল ছেঁড়ার উপক্রম করল, কঠিন রাগে লগুরাহত সর্পিনীর মতই – বারংবার অনুন্নত ফণায় মাটিতে কামড় দেওয়ার মত অধর দংশন করে দুলতে লাগল। তার পর সে কেঁদে ফেলল, দু হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর অনেকক্ষণ পরে কান্না থামিয়ে উঠে বসল এবং অসহায় ক্রোধান্ধ আর্তের মত টেনে টেনে বলল-ঠিক আছে, আমিও লায়লা – তোমাদের দেখাব, শিক্ষা দেব – জ্ঞান দেব –। যদি না পারি তো –; আমায় নাম লায়লাই নয়। এ আমার প্রতিজ্ঞা-! প্রতিজ্ঞা –! প্রতিজ্ঞা –! এই বলে লায়লা নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাত বিছানায় তিনবার চাপড় মেরে কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে উঠল।

এমন সময় সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই লায়লা যেন সম্বিত ফিরে পেল। ও বলল, ইস্ –! ঐ তো বিপ্লব এসে গেছে – আমি কি পাগল হয়ে গেছি না কি? তাই আমি – বিপ্লবের সম্বন্ধে যা-তা ভেবে বসলাম। কোই দেখি,আমি নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলি নাই তো! এই বলে ও নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখল – না, তার জ্ঞান হারায় নাই। আমি ভুল করে বিপ্লবের উপর অন্যায় করেছি, এর জন্যে বিপ্লবের কাছে আমি ক্ষমা চাইব – ক্ষমা চাইবই –! ও বিপ্লব আমার বিপ্লব – ও আমারই, আমি ওকে যা বলব ও তাই করতে বাধ্য। ও আমার একার- – এই বলে লায়লা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে ছুটে নিচেয় নেমে গিয়ে খিল খুলতে খুলতে বলল, বিপ্লব তুমি এত দেরি করলে কেন?

কিন্তু দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এলো – আমি বিপ্লব নই লায়লা, জব্বর – ।

লায়লা দরজা খুলে দিয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল, ও –! তুমি? তোমাকে আমার খুব দরকার জব্বর। আমি তোমারই খোঁজ করছিলাম।

জব্বরও ভ্রু কুঁচকে বলল, আমার – ? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমায় দেখে আঁৎকে উঠবে।

লায়লা নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে বলল, কেন কেন? আঁৎকে উঠব কেন?

ওটা খুবই স্বাভাবিক। মেয়ে মানুষরা সব সময় প্রকৃত ভালবাসার মূল্য দিতে চায় না – । তারা, বিশেষ করে যুবতীরা সামনে যা পায় তাই-ই আল্লার দরগার সিন্নী মনে করে। অত বাছবিচার করার ফুরসৎই পায় না।

লায়লা ভ্রু কুঁচকে বলল, ছিঃ –! তুমি যে আমায় কি ভেবেছ তা বুঝে উঠতে পারছি না – ।

না বোঝারই বা কি আছে –?

কি নাই তাই বল আমায়।

জব্বর বলল, ভেবে দেখলে দেখবে কিছুই নাই। আসলে তুমি ভুতে পাওয়া রুগী – তোমার ঘাড় থেকে যতক্ষণ না সেই ভূতটা নামছে ততক্ষণ তুমি পদার্থহীন।

লায়লা এর আর কোন জবাব দিতে পারল না। সে রাগে রোষে অধর দংশন করে নিজের রাগ দমন করে নিয়ে সহাস্যে বলল – ঠিক বলেছ জব্বর, আমি ভুতে পাওয়া রুগীই বটে। আমার দুর্ভাগ্য যে, তুমি এতদিন আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশো নাই। যদি মিশতে তা হলে দেখতে পেতে আমি বিপ্লবের সঙ্গে মেলামেশা করলেও আসলে আমি ভাল বাসতাম তোমাকে।

লায়লার এই কথায় জব্বর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, আমি একটা ইডিয়ট, তাই তোমায় আমি বুঝে উঠতে পারি নাই।

লায়লা তখন বলল, আজ আর আমাদের মধ্যে কিছুই গোপন থাকা উচিৎ নয়। সত্যি কথা বলতে কি রশ্মির সঙ্গে তোমার হৃদ্যতাটা আমায় খুবই আঘাত দিয়েছিল। তার জন্যেই নিজেকে একটু দূরে দূরে রাখতাম। কিন্তু আসলে কোন মুসলমান কন্যা হিন্দু পুরুষকে বিয়ে করাটা ইসলামের পক্ষে যে ক্ষতিকর এ সত্যটা আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জান? বিপ্লব আমার বয়ফ্রেণ্ড। আমাদের দেহ মনের তৃপ্তির জন্যই উভয়ে উভয়ের সঙ্গী ছিলাম – । তাই বলে আমার ধর্ম্মকে আমি দূরে ফেলতে পারি না – ।

লায়লার এ কথায় জব্বরের অন্তর আত্মপ্রসাদে যেন ডগ্ মগ্ করতে লাগল। বলল, ইস্! তুমি কি অদ্ভুত – ।

লায়লা আবার বলল, তুমি তো এটা নিশ্চয়ই জান, মানুষের যৌবনের জোয়ার এলে কোন বাধাই তাকে আটকাতে পারে না – সে জোয়ারের বন্যা সবকিছু ছাঁপিয়ে ছুটতে থাকে। আবার যখন সেই জোয়ার থেমে যায় – ভাটির টান শুরু হয়, তখন তা আপনা আপনিই নিজের সীমিত সীমানায় ফিরে আসে।

লায়লার এই কথায় জব্বর বলল, তুমি ঠিক বলেছ। আমিও তোমার ঐ যুক্তিটা সর্বান্তঃকরণে মানি।

লায়লা আবার বলল, যা প্রকৃত, তাকে বিকৃত করার কোন যুক্তি নাই। আমাদের সমাজের বস্তাপচা কতকগুলো নিয়ম থাকার জন্যেই তো মানুষ মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না। আর এর জন্যই তো হয় গোপন প্রণয়, ছেলে মেয়ের ভালবাসার তিক্ত ফল, হাজার হাজার ভ্রুণহত্যা – আরও কত কি –!

জব্বরের আর যেন কিছু বলবার ছিল না। যা বলবার বই বলে চলেছিল লায়লা। তাই সে চুপ করে রইল। লায়লা আবার বলল, কিন্তু তোমার ওপর আমার খুব রাগ হ'ত। তুমি রশ্মিকে সব দিলে, কিন্তু আমায় কি দিলে?

লায়লার এই কথায় জব্বর রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। একটা অমন সুশিক্ষিতা মেয়ে এত প্রাণ খোলা কথা বলতে পারে কি করে?

লায়লা বলল, চল! তুমি এখন বড় ক্লান্ত! খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম কর, তারপর ওসব কথা হবে। ওসব কার কি কখনও আদি অন্ত আছে? এই বলে লায়লা দরজায় খিল এঁটে দিয়ে জব্বরের হাত ধরে উপরে নিয়ে গেল এবং বিপ্লবের খাবারটা ওকে দিয়ে, উভয়ে শয্যা গ্রহণ করল।

লায়লা বলল, শুয়ে কি হবে? ঘুম তো আসবেনা – । তা থেকে বরং চল আমরা ছাদে গিয়ে একটু বেড়াই। লায়লার এ কথায় জব্বর যেন পায়ে হোঁচট খেল। সে বলল, কিন্তু আজ আমি বড় ক্লান্ত। উঠতে আর ইচ্ছা করছে না।

লায়লা বলল, সে কি কথা? তোমরা দেশের মুক্তিকামী সৈনিক! তোমাদের পা ফেলার দাপটে ধরণী কেঁপে উঠবে না –? এরই মধ্যে এত ক্লান্ত হলে চলবে কেন? কতটুকু পথই বা চলেছ।

জব্বর বলল, পথ খুবই সামান্য, কিন্তু বড় বঙ্কিম – কর্কশ আর বন্ধুর। জব্বরের এই কথায় লায়লা হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসি থামিয়ে বলল, জব্বর – এ চলার পথ কোন দিনই মসৃণ হয় না–। যারা চলতে জানে তারা চলে, আর যারা চলতে জানে না তারা কেবল পায়ে পায়ে হোঁচট খায় – ।

ঠিক বলেছ লায়লা। ঐ রকমই হোঁচট্ খেলাম আমি রশ্মির কাছে।

লায়লা আবার হেসে উঠল। তার প্রচণ্ড হাসিতে গোটা ঘরটা যেন গম্ গম্ করতে লাগল। সে সহসা হাসি থামিয়ে বলল, রশ্মি –! কি সুন্দর নাম, র-শ্মি! তার মানে আলো – । কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য্যের ব্যাপার ঐ রশ্মিকে পেয়েও তুমি যেন অন্ধকারেই রয়ে গেলে জব্বর।

জব্বর যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। সে বার দুই ঢোঁক গিলে বলল, তার মানে?

তার মানে আবার কি? কিসের মানে? আমাদের রশ্মি-অমন সুন্দর চেহারা, যা দেখলে যে কোন হাফেজেরও মতিভ্রম হয়, তাকে তুমি প্রাণ ভরে উপভোগ করলে – তালগোল পাকিয়ে ছাড়লে – তাতেও তোমার ক্ষুধা মিটল না – আবার তারই নিন্দে করছ –? এইভাবে তার নিন্দে করলে দোজখেও তোমার স্থান হবে না জব্বর। আল্লা তোমায় ছেড়ে কথা কইবেন না।

জব্বর তখন যেন ককিয়ে উঠল। বলল, তুমি বিশ্বাস কর লায়লা – সে আমাকে সব দিয়েছে একথা খুবই সত্যি। তবে কি জান, সে মেয়েটার মাথায় যেন পোকা আছে – তবে শোন সে কথা। একদিন আমরা উভয়েই মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছি। হঠাৎ সে বিদ্যুৎপৃষ্টের মতই তড়াং করে লাফিয়ে উঠে বললে কি না – আমি সব দিতে পারি, কিন্তু আমার বুকের উপর কোন চাপ সইতে পারব না –। এই বলে জব্বর অভিযোগের সুরে লায়লার একটা হাত ধরে ফেলল এবং বলল, তুমি বল তো – নরনারীর মিলনের যেটি অঙ্গ তা থেকে কেউ কখনও ঐ সময় নিরস্ত হতে পারে?

জব্বরের কথায় লায়লা বলল, তোমার কথা খুবই সত্যি। মেয়েটা বাতিকগ্রস্তা। তাই ও ওর বুকটার গরবে গরবিনী – ভাবে, কবরে যাওয়া পর্য্যন্ত ওর বুকটা এমনই থাকবে।

জব্বর যেন কেঁদে ফেলল। বলল, শুধু ঐ একদিন নয়, দু'তিন দিন ও আমায় ওরই জন্যে খুব সাংঘাতিক অপমান করেছে।

লায়লা বলল, তাই নাকি? তা তো আমি জানতাম না। যাকগে – ওতে তুমি দুঃখ কোরনা।

জব্বর আবার বলল, কিন্তু ভুলতে পারছি কই? ও কেবলই আমার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে।

তা তো উঠবেই।

তাই আমি যখন দেখলাম, ওর সঙ্গে আমার মিল হওয়ার অনেক বাধা, তখনই তো –

কি তখনই তো?

জব্বর উদাসভাবে বলল, ওকে সরিয়ে দিলাম।

সরিয়ে দিলে? কোথায় সরিয়ে দিলে?

ক্যাণ্টনমেণ্টে ।

ক্যাণ্টনমেণ্টে –?

হ্যাঁ ক্যাণ্টনমেণ্টে।

কার কাছে –?

জিয়াস খাঁয়ের কাছে – ।

কে সেই জিয়াস খাঁ –?

এক পাকিস্তানী সেনা বিভাগের বড় সাহেব।

তুমি তাকে চেন?

তা আবার চিনব না? সে আমার বন্ধু।

তোমার বন্ধু? সে কি কথা? তুমি বাঙলার ছেলে আর সে পশ্চিমী বর্বরদের সেনাধ্যক্ষ। তুমি তারই হাতে রশ্মিকে তুলে দিয়ে এলে? ওরা আমাদের দেশ ধ্বংস করে দিচ্ছে – ওরা আমাদের এই বাঙালী জাতটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে চাইছে – আর তারই হাতে তুমি একটা বাঙলার মেয়েকে তুলে দিতে পারলে – কেমন করে পারলে জব্বর? এর মধ্যে কি সত্য আছে তা তুমি আমায় খুলে বল জব্বর – আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে কি যেন একটা গিঁট রয়ে গেছে।

জব্বর বলল, হ্যাঁ! আজ তোমায় আমি সবই খুলে বলব লায়লা। আমি তোমাকে আর কিছুই গোপন করব না।

করা উচিতও নয়।

জব্বর বলল, তার আগে তুমি বল তো লায়লা – সত্যি তুমি কি আমায় ভালবাস?

জব্বরের এই কথায় লায়লা তড়াং করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। বসে বলল, ও –! এই কথা, তুমি আমায় কি ভেবেছ? আমাকে যদি তুমি বিশ্বাস করতে না পার তা হলে আমাকে কোন দিনই তুমি ভালবাসতেও পারবে না – ।

লায়লার এই কথায় জব্বরও উঠে বসল এবং লায়লার হাত দুটো নিজের বুকে তুলে নিয়ে বলল, তুমি বিশ্বাস কর লায়লা, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

লায়লা তখন বলল, ঠিক আছে – বিশ্বাস করলাম। তবে তুমি সব কথা খুলে বল।

জব্বর এতে যেন একটু ঘাবড়ে গেল। সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে এবং কি যেন একটু ভেবে বলল, তার আগে তুমি বল, তুমি এটা জানতে এত জিদ ধরছ কেন?

কই না তো! তোমার কোন গোপন কথা জানবার জন্যে আমি জিদ ধরব কেন? তবে একটা কথা কি জান! যে যাকে ভালবাসে, সে তার সব কথাই জানতে চায় – এতে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের প্রশ্ন নাই, নেহাৎই কৌতুহল মাত্র।

লায়লার এই কথায় জব্বর একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক বলেছ – ।

তবে বল, কেন ওকে এমন সাংঘাতিক শাস্তি দিলে? আহা –! ও মেয়েটাকে সেই পশুরা জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে – ।

জব্বর বলল, প্রতিশোধ নেবার জন্যেই – ।

কিসের প্রতিশোধ?

ওর বুকের গরবের – দেখি, এবার ও কেমন করে ওর বুকটাকে রক্ষা করে – ।

লায়লা বলল, তুমি ঐ জিয়াস খাঁকে চিনলে কি করে?

সে অনেক কথা – ।

বলনা একটু –! এই বলে লায়লা আদর করে জব্বরের গলা জড়িয়ে ধরল।

জব্বর তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, সে কথা না-ই বা শুনলে! কি দরকার ও-সবের?

লায়লা আবার আদরের সুরে বলল, এমনি এমনিই – শুনতে আমার বড্ড ইচ্ছা করছে।

জব্বর তখন যেন একটু কঠিন হয়ে বলল, না –! তার কোন প্রয়োজন নাই। যা অপ্রয়োজনীয় তা নিয়ে মাথা ঘামানো আমার অভ্যাস নাই। যেমনি তোমার সম্বন্ধেও অনেক কিছুই জানবার আছে। কই আমি তো সে সব কিছু জানতে চাই নাই –!

লায়লা তখন বলল, ঠিক বলেছ! আসল ব্যাপার কি জান? আমি সব সময় মাথার ঠিক রাখতে পারি না। তুমি যা বললে, ওটা আমিও খুব ভাল বুঝি এবং মানিও। তবু এক এক সময় যেন কেমন ধারা হয়ে পড়ি।

লায়লার কথায় জব্বর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। সে তখন লায়লাকে আদর করে আরও জোরে টেনে নিল এবং অধরোষ্ঠে চুম্বন দেওয়ার জন্যে মুখ বারাতেই লায়লা মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, ওঁ-হুঁ-! এত তাড়াতাড়ি নয় – তা হলে খুব তাড়াতাড়ি বাসি হয়ে যাব – ।

তখন জব্বরের ধমনীতে উগ্র কামনার স্রোত বইছে। ও এখন মানবে কেন লায়লার কোন ওজর আপত্তি। সে আরও ভয়ানক হয়ে উঠল। বলল, আমি তোমার জন্যে সব কিছু বিকিয়ে দিতে পারি।

লায়লা বলল – তোমার আমার জন্যে কিচ্ছু বিকিয়ে দিতে হবে না, আমি তোমারই – ।

তবে তুমি আজ আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন?

লায়লা সহাস্যে জব্বরকে আরও কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলল, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ জব্বর! তুমি কি জাননা, মেয়েদের মিলনেও কিছু না কিছু প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি আছে –?

জব্বর তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লায়লার হাতে একটা চুম্বন দিয়ে বলল, ও –! তাই বল – আমি যেন বড্ড হ্যাংলা হয়ে গেছি। কিছু মনে ক'র না – আমি জানতাম না বলেই – ।

লায়লা যেন কিছুতেই নিজেকে আর রক্ষা করতে পারছিল না। জব্বরের সঙ্গে তার প্রেম ও ভালবাসা যেন অভিনয়ে পর্য্যবসিত হয়েছে, জব্বর যেন ক্রমশঃ ক্রমশঃ ওকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। ও যতবারই লায়লার কাছে অভিসারে এসেছে – ততবারই ও একটা না একটা কঠিন ও অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। অথচ প্রতিবারই লায়লা এমন অমায়িক ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছে যে জব্বর তাতে তার লালসার বারবাবহ্নিতে নিজে হাতে জল সিঞ্চন করেছে আনন্দে – ভবিষ্যতের আশায়। ছোট ছেলেকে মা যেমনি ধারা আগুনে হাত দিতে বারণ করলে সেই ছেলে আগুনে হাত দিতেই জিদ ধরে – জব্বরও লায়লাকে পুরোপুরি না পেয়ে – তাকে পাওয়ার নোয় বুঁদ হয়ে পড়ল। –

একদিন সুযোগ পেয়ে লায়লা বিপ্লব আর নুরুলকে সব কথা খুলে বলেছিল। তাতে নুরুল বলেছিল, তুমি ঠিকই করেছ। দেখব, কতদূর কি করতে পার। বিপ্লব বলেছিল, দেখার আর কিছু নাই – এই সময় জব্বরকে কুকুর শিয়ালের মতই গুলি করে মারা দরকার। এর উত্তরে লায়লা বলেছিল, জব্বরকে গুলি করার আগে লায়লা নিজের বুকেই গুলি খাবে। লায়লা না মরা পর্য্যন্ত জব্বরকে কেউই মারতে পারবে না।

এরপর সবই যেন কেমন ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ জোরদার হলেও পূর্ববঙ্গের বীভৎসতা কিছু মাত্র কমে নাই। পূর্ববঙ্গের-সমস্ত হিন্দুরা যেন আরও বেশি উৎখাত হতে লাগল। এ সম্বন্ধে নানা কথা কানে ভেসে আসতে লাগল। যাই হোক – পূর্ববঙ্গ হতে লক্ষ লক্ষ নর-নারী সর্বস্ব ত্যাগ করে নিঃস্ব অবস্থায় দেশ ছেড়ে চলে যেতে লাগল। গোটা পূর্ববঙ্গটাই যেন আগুনে জ্বলছে। যত্র-তত্র লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নি-সংযোগ, অত্যাচার অনাচার, নারী হরণ, ধর্ষণ, নির্য্যাতনের বীভৎসতা। আইন শৃঙ্খলার যেন কোন বালাই নাই – ।

বিপ্লবের সঙ্গে লায়লার মতান্তর ঘটেছে। দু'জনায় দু'দিকে বিচ্ছিন্ন। বিপ্লব একটা বিরাট মুক্তিফৌজের দলের অধিনায়ক। সে এখন চায় যত তাড়াতাড়ি তার জীবনটা শেষ হয়ে যায় ততই ভাল। সে এখন বেপরোয়া অধিনায়ক।

আর লায়লা – এখন জব্বরের প্রেয়সী, ঢাকার অদূরে একটা বৃহৎ প্রাসাদের অন্দর মহলের নায়িকা।

সাত

জব্বর বলছিল – জান লায়লা, একজন বালুচ হাবিলদার বলেছিল যুদ্ধটা পুরোপুরি সখ মেটানোর একটা নেশা। যেমনি মানুষ ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে – বেশ্যালয়ে অথবা বাইজীর কাছে যায়। একজনার দুঃখ, অপরের আনন্দ।

লায়লা বলেছিল, তোমার ও কথাটার মানে বুঝলাম না তো?

মানে কি অতশত আমিই বুঝি ছাই? তবে মোটামুটি যা বুঝেছি তার অর্থ হ'ল রাষ্ট্রপ্রধানরা অনেক সময় কাজের কাজ না পেয়ে সবাইকে একটু চমকে দিতে চায় – একটু যেন আলোড়ন, একটু যেন ভয় ভয় – একটু যেন রোমান্স্ – থ্রিল্ –। দুনিয়ার লোক – হাঁ করে রেডিওর পাশে কান খাড়া করে থাকবে – সাত সকালে খবরের কাগজের জন্য লোকে থাকবে উন্মুখ – বোধ হয় এই রকমই একটা কিছু বলতে চেয়েছিল সেই হাবিলদারটা।

লায়লা বলেছিল – ঠিক বলেছে সেই ভদ্রলোক, এখন তাকে দেখতে পেলে তার পায়ের ধূলো নিতাম। সে আর কি বলেছিল –?

জব্বর বলেছিল – সে আরও অনেক কিছু বলেছিল।

লায়লা আদরের সুরে বলল – বলনা তার কথাগুলো, শুনতে খুব মজা লাগছে।

জব্বর বলেছিল – এই নদীর ধারের মুক্ত হাওয়া খেতে খেতে – আর চারি ধারের গাছপালা ফুল ফলের সোঁদা সোঁদা গন্ধে আমার মনে প্রাণে খিদে লেগে গেছে – এখন কি খাই?

লায়লা বলেছিল আর একটু হাওয়া খেয়ে নাও, তাতে যদি খিদে না মেটে তা হলে দু' আঁজলা নদীর জল খেয়ে নিও।

ইস্ –! লোকে দেখলেই বলবে পাগল!

লায়লা বলল, না – তা কেউ বলবে না – তার কারণ এখানে এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে, যুদ্ধের ডামাডোলের আবহাওয়ায় একজন প্রাণীও নাই- – যে তোমায় পাগল বলবে।

জব্বর জলল – জলে আর বাতাসে আমার ক্ষিধে মরবে না, ক্ষিধে মারতে হলে চাই –

কি চাই –

তোমার কানে কানে বলব –

'বল' এই বলে লায়লা জব্বরের মুখের কাছে কানটা নিয়ে গেল।

জব্বর তখন লায়লার মুখটা আর একটু টেনে নিয়ে চুপি চুপি বলল একটা – চুমু।

লায়লা একটু সরে এসে বলল, ইস্ –! তুমি কি অসভ্য! কেউ যদি দেখে ফেলে – তবে কি বলবে বলতো?

এখানে দেখবার আর কেউই নাই।

ঐ তো রয়েছে আকাশের তারাটা – ঐ দ্যাখ, একফালি চাঁদ – পশ্চিমের সিঁদুরে আকাশটা আমাদের দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে রয়েছে – আর নদীটা আমাদের কথাগুলো শোনার জন্যে যেন উৎকর্ণ হয়ে অসারের মত পড়ে রয়েছে।

জব্বর তখন লায়লার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল- – কি সুন্দর –! তুমি খুব চমৎকার কথা বল, তুমি চেষ্টা করলে কবি হতে পার।

তা পারি – অন্ততঃ তুমি যদি পাশে থাক। যাক্ গে, সেই হাবিলদারটা আর কি বলেছে বল না।

জব্বর আর লায়লা নদীর ধারে একটা বাঁকের মুখে একটা ঝোপের আড়ালে বসল। দক্ষিণা বাতাসে লায়লার আঁচল খানা কেবলই স্খলিত হয়ে যাচ্ছিল আর তার কয়েকটা কুঁচো চুল উড়ে উড়ে পড়ছিল তার প্রশস্ত ললাটে – ও বারবার ঐ গুলো সামলে নিতে নিতে বলছিল – বলনা সেই হাবিলদারের কথাগুলো।

জব্বর বলল – সে বলেছিল, 'মিঞা দেখছেন ঐ আসমানটা কি সুন্দর! আর তার গায়ে কত সুন্দর সুন্দর তারকা জ্বল জ্বল করছে – মনে হয় সারা রাত ভোর ঐ আসমানটার নিচের ফুল ফল গাছপালাওয়ালা জমিনটার উপর শুয়ে শুয়ে তারকা গুলোকে গুনি আর দেখি।'

জব্বর বলেছিল – তাতে তুমি কি সুখ পাবে?

'আর কি পাব না –! ওতে সবই আছে – । এ দুনিয়ার নসিবই তো ঐ আসমানটা।'

কি-রকম?

আরে মিঞা – 'থোরাসে পরখ করকে দেখনা – ঐ আসমান মেরা জান, সবকোইকো জান –! আঁখো মুদঁকে এ জমানা – আঁখো খুলো মৎ, দেখো এহি পেড় ইয়ে জমিন, আসমান, ফুল, পানি, সবই সবকইকো জান, হামারাভি, তুমারাভি।'

হাবিলদারটা যখন এই সব কথাগুলো বলছিল তখন কোথায় যেন একটা শেল ফাটার গর্জন ভেসে এলো। তার অগ্নিশিখার একটা রেখা যেন আকাশটাকে ছুঁচ বেঁধা করে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। তখন হাবিলদারটা বলেছিল দেখছেন দেখছেন – এমন সুন্দর আসমানটাতেও যেন আগ লাগিয়ে দিচ্ছে – শুয়ারকা বাচ্ছারা সব লালে লাল করে দিলে ভাই সাহেব – ।

লায়লা বলল, তারপর –?

জব্বর বললে-হাবিলদারটা বলেছিল – 'ঠিক এইসাই এ ধরতি ভি লালে লাল হয়ে যাচ্ছে! খালি খুন আর খুনে লালে লাল। ঔরৎ জেনানা, জোয়ান মর্দানা-বালবাচ্ছা সবকোইকো খুন আর খুন – এ জমিন লালে লাল হয়ে গেল – ।' 'শুনিয়ে সাহাব, হামলোগ সব চাহাতা নেহি এইসা খুন। লেকিন মিলিটারী অর্ডার তামিল করনেই পরেগা – খুন লেনে হোগা – নেহিতো দেনে হোগা। লেকিন যব হামলোক সোচ্‌তা হ্যায় – এইসাই জেনানা, এইসাই বালবাচ্চা হামলোগকা ঘরমেভি হ্যায়, উস্ টাইম হামলোগকা রাইফেল, মেসিনগান, সবকুছ গির জাতা হাথোসে – ।'

জব্বর বলেছিল – তাহলে তোমরা যুদ্ধ করতে চাও না?

'আরে দূরতারি ভাইসাব! ইস্কো কি লড়াই বোলা জায়েগা? এতো বিলকুল খুন। গরীবকা কমজোরী কা কুঠিমে আগ দেনা, কমজোরী কা জেনানা বহিন কো লেকে ভাগনা, ঔরৎকা ইজ্জত লুঠ লেনা, সবকোইকো সবকুছ ছিন্ লেনা – ই-ক্যা লড়াই হোতা হ্যায়? আপকো বোলা না? জমানা বদল গেয়া – । এইসা খুবসুরত আসমান,ও-ভি-বদল গেয়া – ।'

জব্বর বলেছিল তবে তোমরা আমাদের জেনানাদের নিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টেরেখে দিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করছ কেন?

'ও-হি করনেই পড়েগা – । মিলিটারী হুকুমত হ্যায়। নেই তো হাম লোগোকো জান চলা জায়েগা। লেকিন সব মিলিট্রি আদমি এ্যায়সা চাহ্‌তা নেহি। সাহাব লোগ এ্যায়সা জ্যাদা মাংতা হ্যায়, কুছ্ কুছ্ বদমাস মিলিট্রি ভি সাথ সাথ মজা লুট রাহা হ্যায়।'

জব্বর বলেছিল – তুমি কোন দিন মজা লোট নাই?

'আরে তোবা-! তোবা-! এ ক্যা তুম্ কহ্‌তেহেঁ সাব? তব্ শুনিয়ে এক খিস্যা। ইয়ে হোগা কম্‌সে কম ছে-সাত রোজ পহ্‌লেকা বাত। খিজির খাঁ বোলকে এক কর্ণেল সাহাব হম্‌লোগোকে লেকে একঠো গাঁ-ও এ্যাটাক্ কিয়া থা। গাঁ-ও

কো বিলকুল জ্বালা দিয়া – সব লুঠ লিয়া, কমসে কম পানশো জান মার দিয়া – 'খুনসে পুরা গাঁ-ও লালে লাল হো গেয়া। আউর ওহি সহাব এক মিলিটারী ট্রাক মে এক ট্রাক জেনানা উঠা লেকর চল্ গিয়া।'

'মিলিট্রি ছাউনিমে আনেকা টাইম একঠো খুবসুরত লেড়কী উমর হোগা লগভগ আঠার উন্নিশ – বিলকুল হামারা খাস লেড়কীকা মাফিক। মুঝে বোলা, আব্বা –! মুঝে বাঁচাও! হম্ উসকো ছোড় দিয়া। বোলা – ভাগ! – হিঁয়াসে ভাগ! হিন্দুস্থান চলা যা – আভি চলা যা! নেই তো তেরা জান চলা জায়েগা! ইজ্জৎ চলা যায়গা! তু মেরী বেটী, তু আচ্ছা তু আচ্ছা রহ্‌নেসে মেরা আচ্ছা হ্যায়, তু জলদি ভাগ যা!'

হাবিলদারটা এই কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল। সে চোখ মুছে আকাশের দিকে আবার তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'কেয়া খুব সুরত ওহি আসমান। ও-ভি ললে লাল হো গেয়া! ক্যা মালুম – মেরা বেটী আজ কাঁহা হ্যায় –! দেশ মে এক বেটী, হিঁয়া পর ভি এক বেটী! দু'নো বিটিয়া কাঁহা হ্যায়-ক্যায়সা হ্যায়,কেয়া করতা হ্যায়, কেয়া খাতা হ্যায়! আউর হাম লোগকা কভি মুলাকাত হোগা কি নেহি হোগা – এ-ভি মালুম নেহি – ।'

আট

শহরের গা ঘেঁষে পাকিস্তান সরকারের বিখ্যাত ক্যাণ্টনমেণ্ট। বৈদেশিক সাহায্যে বৈদেশিক পোষকতায় ও পরিকল্পনায় সর্ব্বাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত–সুন্দর ও সুদৃঢ়।

ঐ ক্যাণ্টনমেণ্টের দুর্ভেদ্য মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে ছুঁচ গলাবারও উপায় নাই। যুদ্ধের বাজারে ওখানে বালুচ, পাঠান, পাঞ্জাবী, সৈন্যের কঠিন মহড়া চলছে দিনরাত। আশ-পাশের গ্রামগুলো সব জনশূন্য, যেন খাঁ খাঁ করছে। দেখলে মনে হয় যেন এক রূপকথার দৈত্য মায়ার মরণকাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

কয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে সমস্ত বসতি উচ্ছেদ করে তৈরী হয়েছে বাড়তি সৈন্যদের জন্যে অস্থায়ী ছাউনী। ওরই মাঝে মাঝে আম, বকুল ও নারকেল সুপারীর গাছ ও ছোট বড় পুকুর। তারই চারি ধারে এ্যাস্‌বেষ্টসের সেড্ আর ত্রিপলের বেড়া দিয়ে তৈরী করা হয়েছে সৈন্যদের থাকবার জায়গা ও অফিসারদের কোয়ার্টার। ওখানেও রয়েছে ক্লাব, খেলার মাঠ, বড় পুকুরটাতে সুইমিংপুল তৈরী করা হয়েছে। বাঁশের খুঁটি পুঁতে ইলেকট্রিক তার টেনে টেনে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অফিসারদের ঘরে নিয়ন আলো জ্বলছে।

লায়লাকে জব্বর নিয়ে গিয়েছিল ক্যাণ্টনমেণ্ট দেখাতে। জব্বর ওখানের এক মেজরের সুপরিচিত বন্ধু। লায়লাকে তার বেগম বানিয়ে আগা গোড়া বোরখা ঢাকা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভিতরে।

ওরা যখন একটা মিলিটারী জিপে করে ভিতরে প্রবেশ করেছে তখন দুটো ট্রাকে কমপক্ষে দুশো মৃত সৈন্যকে মাল বোঝাই করা করে লোড্ করছিল। সবাই তরুণ – আজই এই ক্যাণ্টনমেণ্টের ভিতরে সার করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ওদের একমাত্র অপরাধ এরা বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের।

লায়লা আর জব্বর জিপ থেকে নেমেই এই দৃশ্য দেখে ভয়ে আঁৎকে ওঠে। চিৎকার করে লায়লা জব্বরকে জাপটে ধরেছিল।

ওরা যাদের নিমন্ত্রণে ওখানে গিয়েছিল তার মধ্যে সেই জিয়াস খাঁ তখন কি যেন একটা জরুরী কাজে বাইরে কোথায় গিয়েছিল। জব্বরের কাছে দু'খানা আইডেন্‌টিটি কার্ড ছিল। তাই ওদের গতি বিধি ছিল অবাধ এবং সঙ্কোচহীন।

একধারের একটা হল ঘর হতে নাচগানের উদ্দামতার রেস ভেসে আসছিল। জব্বর বলেছিল ঐটাই অফিসারদের রিক্রিয়েশন রুম। ঐখানেই রশ্মি আছে। লায়লা বলেছিল সে এখানে যখন এসেছে তখন রশ্মিকে না দেখে কিছুতেই এক পাও নড়বে না। জব্বর ওর কথা মেনে নিয়েছিল। তাছাড়া ওর জিয়াস খাঁর সঙ্গে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। সে না ফেরা পর্য্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। শুধু শুধু চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে থাকাও মুস্কিল। তাই ওরা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল ক্যাণ্টনমেণ্টটা।

ওরা চলছিল আর চারিধারে উঁকি মেরে মেরে দেখছিল। প্রথমেই ওদের নজরে পড়ল একটা কচি গোছের অফিসার – এত ড্রিঙ্ক করেছে যে সে একেবারে বে-হুঁস। তার বুক থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত খাটের উপর – শরীরের বাকি অংশটা ঝুল্‌ছে, মিলিটারী পোষাক তখনও ওর পরনে। অন্য একটি ঘরে রেডিওয় উর্দ্দু ফিল্মের গান হচ্ছে আর একটা আধবুড়ো লোক কেবলমাত্র আণ্ডার ওয়্যার পরে এক হাতে মদের গেলাস আর এক হাতে চুরুট ধরিয়ে – প্রচণ্ড নাচ নাচছে। অন্য একটি ঘরে একটি বিরাটকায় পাঠান অফিসার এত মাল গিলেছে যে একদম বেহুঁস হয়ে ঘরের মেঝেয় পড়ে রয়েছে, তার পাশে মদের বোতল, গেলাস, মাংসের হাড়গোড় ও তরকারিপাতি ছড়ানো। জলের কুঁজোটা পর্য্যন্ত উল্টে গেছে আর সেই জল গোটা মেঝেময় হয়ে তার জামা প্যাণ্ট জুতো মোজা সবই ভিজিয়ে দিয়েছে, সে মাঝে মাঝে একটু আধটু গোঁ গোঁ করছে মাত্র। অন্য ঘরে একটা ছোকরা মত অফিসার সিগারেটে টান দিতে দিতে নোট বইয়ে কিসব লিখছে – আর মাঝে মাঝে টেলিফোনে কি সব কথা কইছে। এই সব দেখতে দেখতে লায়লা আর জব্বর অন্য রোতে প্রবেশ করল। এত অফিসার্স কোয়ার্টার।

প্রথমেই ওদের নজরে পড়ল, একটা ঘরে একটা অফিসার লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে মদের গেলাস হাতে নিয়ে মেঝেয় বসে পা ছড়িয়ে গান ধরে অন্য হাতে একটি তরুণীর কাপড় ধরে টানাটানি করছে। মেয়েটি বোধ হয় বাঙ্গালী হবে, সে প্রায় বিবস্ত্রা হয়ে পড়েছে, ভয়ে তার মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। যেন একটা হিংস্র বাঘ একটা চঞ্চলা হরিণীকে নিয়ে মরণ খেলা খেলছে। অন্য একটি ঘরে দু তিনটে অফিসার মদ্যপান করছে – আর কি সব বলছে বোঝা গেল না। আর একটিতে একটি সুন্দরী যুবতী নাচছে অন্য আর এক সুন্দরী গান করছে। মাঝে মাঝে একটু একটু করে মদের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। পাশে বসে দুজন বিরাটকায় ব্যক্তি। ওদের গান শেষ হতেই একজন একটি নারীরত্নকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন অপরটি বাকী রমণীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে নিজের কোলে বসিয়ে আদর করে মাংস ও মদ খাওয়াতে লাগল। মদ্যপানের ফাঁকে ফাঁকে তাদের জড়িত কণ্ঠের কথাবার্ত্তা ও ছিটে ফোঁটা গানের কলি সবই যেন মদিরাচ্ছন্ন করে তুলছিল। ওদের বেলেল্লাপনা ক্রমশঃ অশ্লীলতায় পরিণত হতে লাগল।

লায়লা বলল, এসব আর চোখে দেখা যায়না, এখান থেকে পালিয়ে চল। জব্বর বলল, কিন্তু কিন্তু জিয়াস খাঁ?

লায়লা বলল – তার ঘর কোথায়?

ও ধারে – ।

তবে চল, তার ঘরেই বসি গে।

ওরা চলতে লাগল। কিন্তু তখন অদূরের একটা ব্যারাক হতে নারী কণ্ঠের আর্ত্তনাদ ভেসে আসতে লাগল। লায়লা তখন জব্বরের হাত ধরে বলল – চল না, ওখানে কি হচ্ছে একটু দেখে আসি – ।

জব্বর বলল, ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। ওটা সৈন্য ব্যারাক। রোজ রোজ যে সমস্ত গ্রাম এবং শহর আক্রমণ করে লুঠপাট করা হয় ও যে সমস্ত মেয়েদের ধরে আনা হয় তাদের ঐ খানেই আটকে রাখে। তারপর ওদের ওপর হয় অত্যাচার। বাছা বাছা সুন্দরীদের অফিসাররা পছন্দ করে এবং এখানে আনতে বলে দেয় প্রহরীদের। অফিসারদের নির্দেশ মত ওরা সেই সমস্ত মেয়েদের জোর করে এখানে নিয়ে আসে এবং বাকীগুলোর উপর অত্যাচার চালায় ঐ সৈন্য ব্যারাকেরই সৈন্যগুলো। এখন বোধ হয় সেই রকমই কোন অত্যাচার চলছে, তাই মেয়েগুলো ককিয়ে মরণ-কান্না কাঁদছে – ।

লায়লা বলল, হ্যাঁ তা তো কাঁদবেই। ওরা যে কান্নার জন্যেই জন্মেছে। ওদের যে পুরুষ নাই – সবই মেয়ে – ।

জব্বর বলল, ঠিক বলেছ – গোটা দেশটাই যেন মেয়ে মানুষের দেশ, পুরুষ নাই একটাও –।

লায়লা তখন হেসে ফেলল। বলল, তুমিও?

জব্বর এর কোন উত্তর করতে পারল না। সে যেন বেশ খানিকটা ঘা খেয়ে কাঁচুমাচু করতে লাগল।

লায়লা বলল, চল এখান থেকে পালাই।

ওরা আবার চলতে লাগল। এমন সময় ঐ ব্যারাক হতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ করে গুলির শব্দ ভেসে এলো। লায়লা তখন ভয়ে আঁৎকে উঠে জব্বরকে জড়িয়ে ধরে বলল, ও কি?

জব্বর বলল, যে সমস্ত মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে করতে আধমরা হয়ে গেছে, তাদের গুলি করে মেরে দিয়ে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়। বোধ হয় ঐ রকমই কিছু হবে।

লায়লা বলল, অঃ –! ওরা তা হলে এতক্ষণে বাঁচল। ক্রমশঃ ওরা জিয়াস খাঁর কোয়ার্টারে এসে গিয়েছিল। জিয়াস খাঁ – সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার। ও তখন মদ খেয়ে চুর হয়ে রশ্মিকে কোলে বসিয়ে সিগারেট টানছিল। রশ্মিও সিগারেটে টান দিচ্ছিল খুব জোরে জোরে। উভয়েই তখন পাঁড় মাতাল। রশ্মির পরনে তখন পেণ্টি আর ব্রেসিয়ার।

জিয়াস খাঁ তখন একটানে ওর ব্রেসিয়ারটাকে ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে ওকে কিস্ করতে লাগল। রশ্মিও কম যায়না – ও-ও সমানে কিস্ করতে লাগল। তার পরের দৃশ্য দেখে লায়লা জব্বরকে বলল, এখুনই এখান থেকে পালিয়ে চল – জিয়াস খাঁকে আমার দেখা হয়ে গেছে। আমার সমস্ত আশা তুমি পূর্ণ করেছ – তোমার কাছে আমি আজীবন ঋণী রইলাম। এখুনই এখান থেকে পালিয়ে চল – ।

ওরা সেদিন জিয়াস খাঁর সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছিল। লায়লা সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিল – যেন একটা গভীর বনের মধ্যে কতকগুলো মেয়ে ফুল তুলছিল। কোথা থেকে একপাল নেকড়ে বাঘ ছুটে এসে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ঐ অসহায় মেয়েগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল – । একটা বাঘ লায়লার উপর ঝাঁপিয়ে আসছে – । লায়লা তখন ভয়ে চিৎকার করে উঠে বলল, জব্বর –! জব্বর –! আমার বড্ড ভয় করছে – মনে হচ্ছে আমাকে মেরে ফেলবে – ওরা আমায় খেয়ে ফেলবে – আমি আর বাঁচব না জব্বর, আমি আর বাঁচব না –।

রাত অনেক। জব্বরের কিছুতেই যেন ঘুম আসছিল না। সে বিছানা ছেড়ে ছাদের উপরে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর তার মনের মধ্যে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। তার মনের মধ্যে এই প্রশ্নই বারবার জাগতে লাগল – লায়লাটা যেন পুরোপুরি কুহেলী। তা না হলে যে যুবতী মাসাধিক কাল ধরে তার বাগদত্তা স্ত্রী এবং প্রণয়িনী হিসাবে তারই বাড়ীতে রয়েছে – উভয়ের মেলামেশার মধ্যে যেখানে একরত্তিনও মানসিক শিথিলতা নাই, সেই মেয়ে এতদিন স্ত্রীরোগের অজুহাতে তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কি? নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত রহস্য রয়ে গেছে – যেটা লায়লা খুলে বলতে চায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং উদ্দেশ্য যাই-ই থাকনা কেন, মানুষ তো যৌবনের আকাঙ্খাটা হাতেনাতে পুরোপুরি মিটিয়ে নিতে চায় – যদি সে সুযোগ পায়। এর যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম আছে – তা মনে হয় না। বেশ মনে পড়ে – লায়লা বারবার বলেছিল জিয়াস খাঁর দেখা পেলেই ওর দেহটা সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ রয়েছে ও সেটা তুলে নেবে। কিন্তু আজ জিয়াস খাঁর দেখা পাওয়া সত্ত্বেও এবং লায়লা ওর শয্যাসঙ্গিনী হয়েও ওর ধরা ছোঁয়ার বাইরে কেন থাকতে চাইছে?

একটা হিংস্র বাঘের সামনে কোন অসহায় শিশু বা প্রাণী থাকলে সেই বাঘটা যেমনি তাকে খাবার জন্যে লালায়িত হয়ে পড়ে – তখন তার কোন কিছুর ভয় এবং বিপদের কথাও মনে থাকে না – প্রচণ্ড লোভ তাকে এনে দেয় অসীম শক্তি; সেই রকমই লায়লার লীলায়িত দেহতনু জব্বরের সামনে বারবার উদ্ভাসিত হতে লাগল এবং তাকে যেন পাগল করে তুলল। তখন তার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় যৌবনের উষ্ণ বহ্নির বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে। এখন যেন সব কিছুই যুক্তি তর্কের বাইরে।

সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল – লায়লার সঙ্গে আজ এস্পার-ওস্পার না করে কিছুতেই ছাড়বে না। এই ভেবে সে তড়িৎগতিতে নিজের শোবার ঘরে ফিরে এল এবং ইলেকট্রিক সুইচ টিপে নীল আলোটা জ্বেলে দেখল লায়লা দুগ্ধফেননিভ শয্যার নীলাভ বর্ণচ্ছটায় অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের ঘোরে তার অবিন্যাস্ত বেশবাস ভেদ করে তার অনন্ত যৌবনের জোয়ার যেন উচ্ছ্বসিত বেগে বেরিয়ে আসছে।

তখন জব্বরের মনে এই প্রশ্নই জাগল – যৌবন কি দ্বিমুখী? পুরুষের যৌবনের সঙ্গে নারীর যৌবনের কিছু কি তার তফাৎ আছে? তা যদি না থাকবে তাহলে এই পূর্ণযুবতী লায়লা এখনও নিজেকে সংযমের সীমায় আবদ্ধ করে রাখতে পেরেছে কিসের জোরে? কই, সে নিজেকে তো রাখতে পারছে না? সে জীবনে যত নারীর সঙ্গে মিশেছে, ভোগ করেছে – সব কিছুরই উর্দ্ধে যেন এই লায়লা। লায়লা যেদিন ওর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে সেদিন থেকে বেহেস্তের হুরীরাও যেন ওর চোখে ভাল লাগে না। কিন্তু ধৈর্য্যেরও তো একটা সীমা আছে?

এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে জব্বর বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লায়লাকে দেখতে লাগল। তখন তার হতে প্রচণ্ড হিংস্রতার লোলুপ দৃষ্টি লায়লাকে তীর বেঁধা করে বিঁধতে লাগল। সে যেন মাতালের মত টলতে লাগল।

সে সহসা লায়লার বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'হাতে করে তার অবিন্যস্ত বেশবাসগুলো টেনে ফেলে দিতে লাগল।

গভীর ঘুমে নিমগ্না লায়লা তার সুপ্ত চেতনার আবেশে একধারে এই অজ্ঞাত ও অর্ধবোধ্য মূর্চ্ছনা – এবং অপরধারে বিবেক ও প্রতিজ্ঞার নির্দেশ, উভয়ে মিলে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে যেন হতচেতন করে দিল। একবার ভাবল এই মুহূর্তের এই জানোয়ারটাকে লাথি মেরে দূরে ফেলে দেয়, কিন্তু তখনই কি যেন একটা তার অজ্ঞাত ক্ষুধা এই অবস্থাটাকে সমর্থন করে নিল।

এ সংসারে মানুষ যা ভাবে – মানুষ যা চায়, তা পুরোপুরি কার্য্যকর হলেও কি যেন এক অজ্ঞাত ফলাফলের ভাবনায় অনেক সময় দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাই একধারে কামনা, আত্মতৃপ্তি – অপর ধারে কর্ত্তব্য এবং প্রতিজ্ঞা; এইগুলো মিলে মিশে লায়লাকে তখন করে তুলেছিল জড় পদার্থ – যার চেতনা থাকে না এক রত্তিনও।

যে মুহূর্ত্তে জব্বর ওকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের বাইরে গিয়েছিল – তখনই যেন দুনিয়ার ভাবনা চিন্তা ওর মাথাটাকে বিকৃত করে তুলল। ও মেন প্রাণে বুঝে নিল যে আজ ও লক্ষ্যভ্রষ্টা হেয়ে গেল। কিছুতেই আর নিজেকে রক্ষা করতে পারল না।

কোন অসচ্ছল ব্যক্তি দিবাযামী পরিশ্রম করে নিজের ক্ষুদ্র সংসারটার জন্যে – নিজের প্রিয় পরিজনদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্যে। অক্লান্ত পরিশ্রমের পারিশ্রমিক দিয়ে একটা খড়কুটোয় কুঁড়ে বেঁধে তাতে বাস করতে থাকে, এবং সেই ঘরখানা দৈবক্রমে যদি আগুন লেগে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, তখন সেই মানুষটা ভালমন্দ, ভূত-ভবিষ্যৎ, ভাববার সব ক্ষমতা যেমন হারিয়ে ফেলে এক নিমেষে – এবং মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কল্পনা করে আবার সে উপার্জন করে নূতন ঘর বেঁধে প্রিয়জনদের নিয়ে সুখে সাচ্ছন্দে বাস করবে – এই রকমই ভাবনা না ভাবলে তার যেমন আর কিছু উপায় থাকে না, ঠিক তেমনি ভাবনা ভাবতে লাগল লায়লা। যা হবার তা তো হয়েই গেছে! যেহেতু ঐ অবস্থায় বাধা বিপ্তির সৃষ্টি করেও তেমন কিছু কুল রক্ষা করতে পারত না – তখন ওটা মেনে না নিয়ে উপায়ই বা কি? তাছাড়া সমাজের খুঁটিনাটি নিয়ম কানুনগুলো ধর্ত্তব্যি না করলেই হল? যা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় – যাতে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়, যার জন্যে রয়েছে মানুষের অন্তরে একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা – সেই ক্ষেত্রে গতানুগতিক বিধিনিষেধগুলো না মানলেই বা ক্ষতি কি?

জব্বরের যে ক্ষুধাটা অত্যাচার বলে পরিলক্ষিত বা পরিগণিত, সত্যিকারের বিচার করলে লায়লার কি তা ছিল না? হয় তো ছিল? এবং সব মানুষেরই তাই-ই থাকে। কিন্তু মানুষ উপায় হারা হয়ে ওঠে, তার কারণ এ মনুষ্য সমাজে চারিদিকে রয়েছে একটা অলিখিত এবং অলঙ্ঘনীয় বিধি নিষেধের প্রাচীর। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সংসারে মানুষ যা পেতে চায় সেই পাওয়াটা সামাজিক অনুশাসনের কঠিন আবরণে এমনই আবৃত যে তা যেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অপরাধ? সুতরাং জব্বর যা করেছে তা ভুল হলেও বাস্তব এবং সেই কারণেই তাকে অস্বীকার করা যায় না।

লায়লা এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে লক্ষ্য করল তার দেহটা অজ্ঞাত পুলকে স্তিমিতপ্রায় হয়ে পড়েছে। কিন্তু তখনই বিপ্লবের প্রতিটি ব্যবহার, আত্মত্যাগ, নুরুল ইসলামের দেশ প্রেমের কথা – দেশের জন্যে তাদের নির্য্যাতনের ডালি মাথায় তুলে নেওয়া – তার অর্ধচেতন মনটাকে যেন কোন এক অজ্ঞাত রাজ্যে নিয়ে চলে গেল। তখনই তার বিবেকটা যেন তাকে সহস্র চাবুক মেরে এই কথাটাই বল্লে – তা হলে এই পৃথিবীতে দৈহিক ক্ষুধাটাই সর্বশীর্ষে স্থান পেত – আত্মত্যাগ, মানবিকতা সবকিছুরই ঊর্দ্ধে চলে যেত দৈহিক কামনা। কিন্তু তা তো যায় নাই। এই মাটিতে যারা ত্যাগ করতে পেরেছে – তারাই টিকে রয়েছে; যারা ত্যাগ করতে পেরেছে – তারাই টিকে রয়েছে; যারা ত্যাগ করতে পারে নাই তারা যেন ভূমিষ্যাৎ হয়ে গেছে কালের আবর্ত্তে।

তবে –? লায়লা যা করতে এসেছিল তা তো পারল না! এখন ও করে কি? ওর আর সম্বল তো কিছুই রইল না। তবু একটু সান্ত্বনা পায় – যদি ঐ জিয়াস খাঁকে আর ঐ জব্বরের মত পাপীকে এ পৃথিবী হতে চিরদিনের মত সরাতে পারে; তাহলে ঐটাই হবে ওর একমাত্র কৈফিয়ৎ।

ও নিজেকে আরও সংযত ও সমাহিত করে নিয়ে মনটা সহজ করে নেবার চেষ্টা করল। শয্যাত্যাগ করে বেশবাস ঠিকঠাক করে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে জব্বরের খোঁজ করতে লাগল।

জব্বরকে বারান্দায় দেখতে পেয়েই বলল – জান জব্বর, এতদিন আমি একটা ম্যানিয়াতে ভুগছিলাম। আমি ভাবতাম – আমি বুঝি একটা রুগী। কিন্তু এখন দেখলাম ঐ তুচ্ছ রোগের চিন্তাটা মানুষকে কতবড় একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে। তুমি তাড়াতাড়ি চেষ্টা কর যাতে আমাদের বিয়েটা হয়ে যায়।

তখন জব্বর বলল – কেন তোমার কি আমাকে সন্দেহ হয়?

লায়লা তখন বলল – ছিঃ! তোমাকে আমি এত ভালবাসি! তুমি ঐ নোংরা কথাটা ভাবতে পারলে? তুমি মানুষ না অমানুষ? যে মানুষ প্রকৃত ভালবাসার মূল্য দিতে জানে না – এ সংসারে তার দাম এক কানাকড়ির সমানও নয়।

লায়লার এই কথায় – জব্বরের মনের যাবতীয় খট্‌কা এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। ও মনে প্রাণে বুঝে নিল লায়লার সম্বন্ধে ও যা চিন্তা করেছিল তা সবই ভুল। যতই হোক লায়লা একটি সুশিক্ষিত অভিজাত বংশের মেয়ে। প্রকৃত বিচার করতে গেলে আমার থেকে সে সবদিক দিয়েই উন্নত। আমি স্ত্রী-লোলুপ, দেশদ্রোহী, কর্ত্তব্যহীন, অত্যাচারী এবং দুশ্চরিত্র। কিন্তু লায়লা? সত্যি সত্যিই লায়লা যেন একটা মূর্ত্তিমান হেঁয়ালী। ও যত সরল – তত যুক্তি ও ন্যায় বাদিনী।

তাই সে সানন্দে লায়লাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল – লায়লা! তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি যদি আমায় ক্ষমা না কর, এ সংসারে আমার সব কৈফিয়ৎগুলোই ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

লায়লা আর জব্বরের এখন যেন সুখের সংসার। জব্বর প্রতিজ্ঞা করেছে সে লায়লাকে বিয়ে করবেই। লায়লাও ওর কথায় যেন পুরোপুরি নির্ভর করে বসে রয়েছে – সেই বহুপ্রতিক্ষিত দিনটির পানে তাকিয়ে রয়েছে। জব্বর মনে প্রাণে বুঝে নিয়েছে ঐটাই যেন লায়লার মনের কথা, ওর জীবনের চাওয়া পাওয়ার একমাত্র সামগ্রী।

লায়লা বলেছিল, দ্যাখ জব্বর, আমরা যার দয়ায় আজ এত সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবনে কাটাচ্ছি তাকে এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের একদিন নিমন্ত্রণ করা খুবই দরকার এবং কর্ত্তব্য।

লায়লার এই কথাটা জব্বরের খুবই মনে ধরেছিল। ও ভেবেছিল লায়লাটা কি বুদ্ধিমতী! পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকে মুক্তিফৌজের গোপন তথ্যগুলো পাচার করতে পারলে তার আরও প্রমোশন হবে। আর ঐ রাস্তার জন্যে লায়লার সহায়তা সব থেকে বেশি কাজ করেছে। মোটা মাইনে – ফ্রি গাড়ী বাড়ী – এ সবই তো লায়লার কাছে হতে হদিশ এনে ওদের দেওয়াতেই হয়েছে। সুতরাং তাকে আরও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে, আরও অনেক – অনেক রোজগার করতে হবে, আরও অনেক সম্পত্তি অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ লায়লা যখন চাইছে তার উন্নতি – এবং পথও বাৎলে দিচ্ছে- – তখন ক্ষতি কি! সুতরাং –

লায়লা বলেছিল – তোমার ভাবনার কিছু নাই। আমি নাচ গান দুই-ই জানি। তোমার খুব বড় প্রমোশন না হওয়া পর্য্যন্ত আমার জীবন মরণ পণ – যেমন করেই হোক কার্য্যসিদ্ধি করতেই হবে। যে নারী নিজের স্বামীর উন্নতির সহায়ক না হয় তার জীবনের একতিলও দাম নাই।

লায়লার এই কথায় জব্বর ওর কপোল চুম্বন করে বলেছিল, লায়লা – তুমি মানবী না বেহেস্তের হাসিনা! তোমার ঋণ আমি জীবনেও শুধতে পারব না। তোমায় পেয়ে আমার কলঙ্কিত ও অকর্মণ্য জীবনটা ধন্য হয়ে গেছে।

লায়লা সহসা ওর মুখ টিপে ধরে বলেছিল, ছিঃ – ও কথা বলতে নাই। নারীর সামনে পুরুষের কাপুরুষতার বাষ্পও ঘৃণ্য। আমি তোমার ও সমস্ত কথা মোটেই শুনতে চাই না। তুমি আমার চোখে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তোমার অন্য পরিচয় আমার জানবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কোন প্রয়োজন থাকত, তাহলে তা আমি নিজেই বলতাম। তাছাড়া সর্ব্বাগ্রে আমাদের দরকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে-আমাদের মঙ্গলের জন্যে, যা করা দরকার তা করতে হবে বই-কি! আজ আমরা মাত্র দু-জন রয়েছি, কাল হবে বাচ্চা-কাচ্চা। তখন –? তখন তো আমাদের অনেক পয়সা-কড়ি দরকার হবে, বিষয় আশয়ও অনেক দরকার হবে-তার জন্যে চাই যথোপযুক্ত প্রস্তুত।

লায়লার এই কথায় জব্বর আনন্দে আটখানা হয়ে উঠেছিল। আনন্দের জোয়ারে হাবুডুবু খেতে খেতে ওর মুখ দিয়ে আর কোন কথাই যেন জোগাচ্ছিল না। অতি আনন্দে সে যেন ভ্যাবাচ্যেকা খেয়ে নির্বাক বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। লায়লা বলল – কি ভাবছ বল তো?

জব্বর উদাসভাবে বলল, না তো! তেমন কিছু ভাবি নাই। আমি কেবলই ভাবছি অতীতের কথা। সে সব নোংরামির কথা ভাবলে মনে হয় আমি যেন একটা ভূতে পাওয়া রোগী ছিলাম। আমার এই সামান্য অপরিণত জীবনে যা অন্যায় করেছি – তা তুমি শুনলে হয়ত এখনই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু যত অধর্ম, যত অন্যায়, যত পাপই করি না কেন – সবই একজনকে না বলে যেন থাকতে পারছি না। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল সে কথা শুনবে কে? আর তা বলিই বা কাকে? শোনার মত মনের মানুষ না পেলে তা তো আর বলা যায় না! তাই মনে করছি আমার জীবনের প্রভাতী সূর্য্য তুমি – তোমায় আমার সব কথা খুলে বলতেই হবে। এই বলে জব্বর ধপ করে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে বলল – জান লায়লা, আমি এরই মধ্যে অনেক লোকের সর্বনাশ করেছি। নারীর প্রতি এক অদম্য ঘৃণ্য লালসা – পয়সার উপর এক দুর্বার আকর্ষণ, আমায় দোজখে নামিয়ে নিয়ে গেছে – আমি নিজে নির্দেশ দিয়ে আমার মাতৃভূমির অনেক সোনার সংসার ছারখার করে দিয়েছি – কত অসহায় শিশুকে, কত অসহায় নারীকে জীবনের মত ভিখারী করে দিয়ে তাদের সর্বস্ব জ্বালিয়ে দিয়েছি, তার কি কোন হিসেব নিকেশ আছেনা লেখাজোখা আছে? আমি ছদ্মবেশে গোপন খবর যুগিয়ে ইয়াহিয়ার সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছি গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে – লুণ্ঠন, হত্যা, নিষ্পেষণ, নারী নির্যাতন সবই আমি নিজে হাতে করেছি এবং করিয়েছি। আজ সোনার বাঙলা ছারখার হয়ে যাচ্ছে। জান লায়লা, মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে সেই সমস্ত অসহায় নর-নারীর বুকফাটা কান্না আমায় পাগল কোরে তোলে। তাই মদ খাই – প্রচুর মদ খাই, আবার নারী আর শরাবে মেতে উঠি – জীবনকে উপভোগ করি তিল তিল করে। একরত্তিনও কিছু ফেলে রাখতে চাই না। সবই যেন ঠিক চলছিল – যেন রেলের গাড়ী। ইঞ্জিন চালু করলেই লাইন ধরে চলবে-লাইন যেখানে নিয়ে যাবে, ইঞ্জিন ও পিছনের বগিগুলোও ঠিক সেখানেই যাবে। তাদের না গিয়ে যে কোন গত্যন্তর থাকবে না – । কিন্তু আজ তুমি যেন সব ওলট পালট করে দিলে। রশ্মির দাগটা এখনও হৃদয়ে কেটে বসে রয়েছে – ও দাগটা যে মোছবার নয়। মেয়েটা বড় ভাল লায়লা! বড় ঘরের মেয়েও বটে। কিন্তু তার আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি – তা মুখে বলে শেষ করতে পারব না, তোমায় বোঝাতেও পারব না। ওর জীবনের যা কিছু সর্বনাশের জন্যে দায়ী তো আমিই – । লায়লা, তুমি বল না – আমি এখন কি করি? কি নিয়ে ভুলে থাকি? এই বলে জব্বর লায়লার হাত দুটো ধরে যেন ককিয়ে উঠল।

লায়লা বলল, তুমি কিচ্ছু ভেবো না জব্বর! মানুষ যা কিছু অন্যায় করে – আর যখন সে তা বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়ে তার প্রতিকার করে, তখনই সে নিখাদ সোনার মত খাঁটি ও নির্মল হয়ে ওঠে। এ যে আমাদের কোরাণ শরিফের কথা। তবে একটা কথা কি, মানুষ ন্যায় অন্যায়ের বাছ বিচার করে যে রাস্তা ধরবে – সেটা যেন কর্দমাক্ত না হয় – তা হলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক বলেছ লায়লা। কিন্তু এখন প্রশ্ন হ'ল কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক – তার বিচার করবে কে? তুমি আমি? না খোদাতাল্লা?

তা তো জানি না –

তবে? একাধারে সশস্ত্র বিপ্লব, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, মৃত্যু, নিষ্পেষণ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ – আর অপর ধারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-বিলাস, জীবনের নিশ্চয়তা। এটা এক দাঁড়ি-পাল্লায় মাপা যাবে কি?

তা বলতে পারব না –

তা যদি না পারবে তবে এইমাত্র বললে কেন জীবনের সুখ আর ভবিষ্যতের কথা?

লায়লা বলল – তা তো বলবই। ও কথা সব মানুষই বলতে চায় তাই বললাম।

তবে –!

তবে আবার কি? আমিও তো সব পরীক্ষা করেই নিয়েছি। বিপ্লবকেও দেখলাম – বিপ্লবও দেখলাম, তোমাকেও দেখলাম। এখন আমি ঠিক করে নিয়েছি – যে কয়দিন বাঁচব জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে যাব, অনর্থক আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে, রঙ্গিন কাঁচ চোখে লাগিয়ে দুনিয়াটাকে রঙীন দেখতে চাই না।

লায়লার এই কথায় জব্বরের অন্তরাত্মা যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। বলল, কি রকম?

কি রকম! তবে শোন – বিপ্লব আমার মনোনীত খসম ছিল। কিন্তু সে অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসে। তা আমি জানতে পেরেছি ওর ঘুমের ঘোরের কথাবার্ত্তা শুনে। ও ঘুমে অচেতন অবস্থায় মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে, 'অমিতা' বলে। একদিন আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অমিতা কে? ও তখন বলেছিল – 'অমিতা নস্কর!' এক আদর্শ নারী, এখন সে নিহত। বিপ্লবের এই কথাই প্রমাণ করে দেয় যে সে অন্যানুরক্তা ছিল।

জব্বর লায়লার এই কথায় বলেছিল, তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে ইসলাম আর কাফেরে কোন দিনই মিল খেতে পারে না। এই সাধারণ সংস্কার মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা অত সহজ নয় – সাময়িক মোহে মানুষ পথভ্রষ্ট হয় মাত্র। উদারতা দেখাতে গিয়ে ঔদাসীন্যে পরিণত হয়।

লায়লা বলল – ঠিক বলেছ জব্বর। তাই – আজ আমি নূতন লায়লা।

তুমি ঠিকই করেছ! এখন দেখছি তোমার সুমতি হয়েছে। আমরা শাসকের জাত – আর ওরা শাসিতের জাত, এটা ভুললে চলবে না।

লায়লা বলল, ঠিক –!

তুমি দেখবে আবার এমন একটা দিন আসবে, যেদিন সমগ্র দুনিয়ার বুকে মুশ্লিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে – সমগ্র দুনিয়ার মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে – জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে। তাই তোমায় বলছি, তুমি জেনে রেখো – যে ধর্ম্ম মানুষকে স্থান দিতে পারে না, অভয় দিতে পারে না, আশ্রয় দিতে পারে না, তা বেশিদিন টিকতেও পারে না।

লায়লা বলল – ওটা আমারও ধারণা।

তোমার ধারণা ঠিকই।

লায়লা বলল, তার জন্যেই তো চাই – একতা। আমাদের এ গৃহ বিবাদ যেমন করেই হোক মিটে যাওয়া উচিৎ। সমগ্র মুশ্লিম সম্প্রদায় এক হয়ে ওঠা উচিৎ।

লায়লার এই কথায় জব্বর বলল, হবে – নিশ্চয় হবে। তবে তুমি শোন – ইয়াহিয়ার প্ল্যানটাই তো তাই। প্রকৃতপক্ষে আজ যারা নির্য্যাতিত এবং নিষ্পেষিত তারা নিরানব্বই পারসেন্ট হিন্দু। কদাচিৎ মুসলমান নির্য্যাতিত হয়েছে – তাও প্রকৃত তথ্যের অভাবে এবং ভুলের জন্যেই। আমি তো যা কিছু করেছি তার অধিকাংশই হিন্দুদের উপর।

ঠিক করেছ। তা এখন মুসলমানও তো সরাসরি বিপ্লবে নেমে পড়েছে। পড়ুক না – তাতে কি যায় আসে? ওরা আর কটা? আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত এক সুষ্ঠু সরকারের কাছে ওটা নস্যি ছাড়া আর কিছুই নয়। লায়লা! দেখবে ও সব ধুলিস্যাৎ হয়ে উড়ে চলে যাবে – একটু চিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না।

জব্বরের এই কথায় লায়লা যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। বলল, তাই না কি? তাহলে তো খুবই মজা হবে!

জব্বর নিশ্চিত ভাবে উত্তর দিল, নিশ্চয়ই।

লায়লা তখন বলল, তবে তুমি একটা কাজ কর – জিয়াস খাঁ আর ওর বন্ধুবান্ধব অন্যান্য অফিসারদের নেমন্তন্ন করে একদিন এখানে নিয়ে এসো। ওদের আরও অনেক গোপন খবর দিয়ে আমাদের আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। অনেক-অনেক সম্পত্তি করতে হবে – এবং ঐ বিপ্লব ও নুরুলকে ধরিয়ে দিয়ে তোমায় প্রমোশন নিতে হবে। তুমি যোগাযোগ কর। ওদের ধরানোর ভার আমি নিলাম, বিপ্লবের উপর আমি প্রতিশোধ নেবই।

জব্বর বলল, ঠিক?

লায়লা বলল, ঠিক-ঠিক-ঠিক-! বিপ্লবের ধাপ্পার প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে।

জব্বর লায়লার এই কথায় আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল। বলেছিল, তা হলে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পাব – তোমাকে এ দেশের বেগম সাহেবা করে তুলব – তুমি তখন হবে পাকিস্থান সরকারের মুকুটমণি।

লায়লা বলেছিল তা হলে আমি যা বলব তা তোমায় করতে হবে।

জব্বর বলেছিল – নিশ্চয়ই। এখুনই বল, আমায় কি করতে হবে?

লায়লা বলল, আমায় চার পাঁচটা ভাল ভাল গুপ্তচর দিতে হবে। আমার একটা গাড়ী থাকা চাই। তোমাদের ঐ ক্যান্টনমেন্টের নারীদের আমি তদন্ত করে দেখব – এবং মুসলমান নারীগুলোকে ফেরৎ পাঠিয়ে তার বদলে হিন্দু নারী যোগাড় করে দেব। কিছু লোককে আমি মুক্তিফৌজ সাজিয়ে সব খবর ও সন্ধান যোগাড় করে নেব। আর নাচ গানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে – জলযান ও নর্ত্তকী এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা প্রয়োজন মত করে দিতে হবে।

জব্বর বলল, সব দেব – তুমি খালি ওদের ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

লায়লা বলল, রাজী। তোমার জন্যে আমি সব পারি। প্রয়োজন হলে জানটাও এক নিমেষে বিলিয়ে দেব।

জব্বর সানন্দে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার জীবনটা আজা তুমি ধন্য করে দিলে।

লায়লা বলল, তুমি চিরকালই ধন্য, যারা তোমায় চেনে না জানে না তারাই কেবল কখন কি ভাবে জানিনা, আমি তোমায় জেনেছি – তোমায় চিনেছি – তাই আমি জানি তুমি চিরধন্য। তুমি আমার প্রিয় – তুমি আমার গর্ব।

লায়লার কথায় জব্বর ভাবে – অপরূপ এই লায়লা; যেন তুলনাহীন। যেমনি মিষ্টি রূপ তেমনি মিষ্টি স্বভাব, তেমনি অতুলনীয় মধুমাখা কথাবার্ত্তা। তাই সে মনের গহ্বরে বারংবার খুঁজে দেখতে লাগল, এমন মেয়ে সে জীবনে কখনও কোথাও দেখেছে কিনা। কিন্তু কই এমনটি তো একটাও মনে পড়ে না। এও ভাববার মত একটা কথা বটে। জব্বর নিজের চোখে দেখেছে গোটা পূর্ববঙ্গে পশ্চিমী সৈন্যের প্রলয়। গ্রামের পর গ্রাম পুড়েছে – জ্বলে ছারখার হয়ে গেছে, লুঠতরাজ, নারীহরণ ব্যাভিচার, বলাৎকার, সবকিছু। আবার ছাউনিতে ছাউনিতে নারীকণ্ঠের কি ভয়ানক কান্না! হৃদয়-বিদারক। কিশোরী থেকে শুরু করে প্রৌঢ়া পর্য্যন্ত। সুন্দরী, শ্যামাঙ্গী ও যুবতী হওয়াই যেন অপরাধ। এরা কেউই ছাড়া পায় নাই – আর পাবেও না। জব্বর দেখেছে পানোন্মত্ত জঙ্গী প্রতিটি পুরুষের সে কি লালসা, উন্মাদনা, উল্লাস। অপর দিকে তরুণ, বৃদ্ধ, যুবার রক্ত – আর রক্ত। ব্যাভিচারের সময় অসহায়ের অসহনীয় আর্ত্তরোল গোটা ক্যান্টনমেণ্টকে ভরিয়ে তুলত বেদনার বাতাশে। যেন – শ্বাস প্রশ্বাস নিতে গিয়ে নিতে পারা যেতো না। এই তো কবেকার কথা – জিয়াস আর জব্বরের নির্দেশে ফৌজরা একটা গ্রাম আক্রমণ করেছিল। গোটা গ্রামটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ছিয়েছিল,

লুঠতরাজ, হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ করে গোটা গ্রামটাকে আধঘণ্টার মধ্যে নরকে পরিণত করে গেল। তারপর লুণ্ঠিত সামগ্রী ও প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি যুবতী ও কিশোরীকে মিলিটারী ট্রাকে তুলে নিয়ে ওরা আবার ক্যাণ্টনমেণ্টে ফিরে এলো। মেয়েগুলোকে প্রথমেই ব্যারাকের একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হ'ল। সন্ধ্যার সময় অফিসারদের নির্দেশমত যখন ঐ রমণীদের ভাগ বাটোয়ারা করে বিভিন্ন ব্যারাকে ও কোয়ার্টারে পাঠান হচ্ছিল, তখন একটি কচি মেয়ে বোধ হয় বারো তের বছর বয়েস হবে, ছিট্‌কে পড়ে লুকিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। গিয়েছিলোও অনেকটা। ফ্রক পরা সেই কচি মেয়েটিকে দেখে মনে হয় কোন অভিজাত ঘরের। সুরূপা, তন্বী, তাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেই মেয়েটি পালাতে পালাতে একটি বালুচ সৈন্যের খপ্পরে পড়ে। আর যায় কোথায়? হিংস্র নেকড়ের মুখে হরিণ ছানার মতই ওর অবস্থা হয়ে উঠল। ক্যাণ্টনমেণ্টের শেষ প্রান্তে একটা ঝোপের ধার হতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনে জব্বর ওখানে গিয়ে দেখেছিল – সেই পাশবিক বীভৎস অত্যাচার। অচৈতন্য রক্তাক্ত অবস্থায় সেই মেয়েটিকে জব্বর এনে নিজের অফিসেই রেখেছিল। তার শুশ্রূষা করিয়েছিল – তাকে সারিয়ে সুস্থ করে তুলেছিল। মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠেই খালি কাঁদত। কান্না আর কান্না-কি যেন নামটি তার? আঙ্গুর! ঠিক বটে, আঙ্গুরই তো। কি সুন্দর! যেমনি নাম, ঠিক তেমনই সুন্দর তার চেহারা! মেয়েটি দিন রাত কেঁদে কেঁদে সবকিছু যেন বিষিয়ে তুলেছিল। জব্বর অনেক বুঝিয়েছিল, তবু সে শোনে নাই – বোঝে নাই, চোখে কিছু দেখে নাই; খালি কান্না – আর কান্না!

তখন জব্বর বলেছিল – বেশ, তোকে ছেড়ে দিতে পারি একটা সর্ত্তে। তুই রাজী?

মেয়েটি বলেছিল, রাজী।

জব্বর বলেছিল, তবে শোন, তোকে সাতদিন আমার কাছে থাকতে হবে। যা বলব তাই করতে হবে। তবে তোকে ছেড়ে দেব, তোর মা বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব, আর তা যদি না করিস – তবে তোকে আবার ঐ সৈন্য ব্যারাকে পাঠিয়ে দেব।

এর পর আঙ্গুর আর কোন জবাব দেয় নাই। সেই কচি আঙ্গুরটি আমার অঙ্কশায়িনী হয়েছে দিবানিশি, মাতাল বর্বর পশু আমি, আমার শয্যা সঙ্গিনী হয়েছে মুখ বুজে, নির্বিবাদে। কেবল মাঝে মাঝে তার একটা করে দীর্ঘশ্বাস শুসনতে পেতাম। ঠিক সাতদিন পরেই আঙ্গুর আমায় বললে এইবার আমায় বাড়ী পৌঁছে দাও। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বাড়ী পৌঁছে দাও।

জব্বর সেদিন সকালে আঙ্গুরের তাগিদে বিছানা ছেড়েই মুখ হাত ধুয়ে বারংবার ঘড়ি দেখছিল – আর মদ খাচ্ছিল। বলেছিল, ঠিক সাতটার সময় তোকে আমি দিয়ে আসব। তোকে আর আটকে রাখব না, আর নয়।

জব্বর তখন মাতাল। সকাল সাতটার সময় একটা মিলিটারী ভ্যান এসেছিল জব্বরের দরজায়। জব্বর আঙ্গুরকে ঐ ভ্যানে তুলে দিয়ে বলেছিল যা, আমার কাছ থেকে তোর আজ ছুটি।

আঙ্গুর তখন জব্বরকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল – না, আমি ওতে কিছুতেই যাব না – তুমি আমায় দিয়ে আসবে চল।

তখন জব্বর চুর মাতাল। তার হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে দিয়ে লাথি মেরে তাকে সিঁড়ির নীচে ফেলে দিয়ে জড়িত কণ্ঠে বলেছিল, জানিস জিয়াস আমার বন্ধু! সে তোকে দেখেছে, তোকে খু-উ-ব ভালবাসে। সেই তোকে পাঠিয়ে দেবে – রে আঙ্গুর। তুই চলে যা – চলে যা –! তখন সেই মিলিটারী ভ্যানের ড্রাইভার ও দুজন সৈনিক আঙ্গুরকে তুলে নিয়ে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল এবং ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে চলে গেল। সেই গাড়ীর ধূলো যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণই জব্বর ঢক্ ঢক্ করে মদ গিলেছে – বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল তিনদিন। মদের ঘোরে বারংবার বলেছে, জিয়াস –! শালা শুয়ার কা বাচ্ছা –! পশ্চিমী সব শালাই শুয়ার কা বাচ্ছা। আমি যে মেয়েই আনব তাতেই ও শালাদের নজর। জিয়াস এমন বেইমানী করবে জানলে আঙ্গুরকে আগেই বাড়ী পাঠিয়ে দিতাম, না হয়ত ওকে গুলি করে মেরে দিতাম। তাহলে ও ইজ্জত ও সম্মান

নিয়ে সুখে মরতে পেতো। ছি! ও সব ভাবলে মনে হয় আমি মানুষ নই পশু। আমার মত নরাধম পাপী বোধ হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই। শুধু কি ঐ? ঐ রকমই কত শরিফ ঘরের কত কুলবধূ, কত কিশোরী, কত যুবতীর সর্বনাশ করেছি তার কি কোন লেখাজোখা আছে?কত সোনার সংসার, কত সোনার গ্রাম আমারই ইঙ্গিতে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে – তার কি কোন গোনা-গুন্তি আছে?

জব্বর আপন মনে এই সমস্ত ভেবে চলেছিল। এই সব ভাবতে ভাবতে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ন্যায় অন্যায়ের সংঘাত, দুরাচারীর দুরভিসন্ধি, বীভৎসতা, কামান্ধতা, মোহ সব কিছু মিলে মিশে তার অন্তঃকরণকে যেন চাবুক মারছিল। প্রতিটি চাবুকের ঘায়ে তার অন্তর যেন কেটে রক্তাক্ত হয়ে পড়ছিল। সে গায়ের জোরে যাই-ই করুক, যাই-ই করতে যাক না কেন, নেশা কেটে গেলেই কি যেন এক অজ্ঞাত আতঙ্ক, অজ্ঞাত শিহরণ, অজ্ঞাত অনিশ্চয়তা তাকে বারংবার কোন এক আবর্তে ঠেলে দিচ্ছিল – তা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। তাই অনেকক্ষণ ধরে তার এই বিমূঢ় ভাব দেখে লায়লা যখন বলল, কি এত আকাশ পাতাল ভাবছ?

তখন সে কচি শিশুর মতই কেঁদে ফেলল, বলল, লায়লা – আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। খালি মনে হয় – আমি যেন কি এক সাংঘাতিক কাজ করেছি, করতে যাচ্ছি। ভালমন্দ বোঝবার শক্তি আমার আর এক রত্তিনও নাই। এখন থেকে তুমি আমার ভার নাও! তুমি যা বলবে আমি তাই-ই করব। তুমি আমার জীবন সর্বস্ব।

জব্বরের এই কথায় লায়লা বলেছিল – ঠিক আছে! তোমাকে আর কিছু ভাবনা ভাবতে হবে না। যা করার সব আমিই করব।

জব্বর তখন হতেই নিশ্চিত হতে পেরেছিল। অত্যন্ত উগ্র ও দূরাচারী জব্বর লায়লাকে পেয়ে মদিরাচ্ছন্ন মাতালের মত দিন কাটাতে লাগল।

লায়লাও ভেবেছিল জব্বর হয়ত বদলে গেল।

সুতরাং তারও যেন বারংবার অন্তর্ঘাত হতে শুরু হ'ল জব্বরকে নিয়ে। বিষয় সম্পত্তি ধনদৌলত নিয়ে জীবনটা কাটান যায় কিনা? জব্বর এখন শুঁয়ো পোকা। যেন ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না। একটা শক্ত-সমর্থ বশ মানানো যুবক – নিরিবিলি প্রাসাদোপম অট্টালিকা আসবাবে সুসজ্জিত, চাকর বাকর ধনদৌলত সব কিছু, মিলিটারী অফিসারগুলো যেন জব্বরের হুকুম তামিলের অপেক্ষায় থাকে – এই সব কিছুর উপরই লায়লার আদেশ ও হুকুম যেখানে অপরিহার্য্য – যেখানে এত সুন্দর কর্তৃত্বের আনন্দে লায়লা যেন আত্মহারা হয়ে পড়ল। ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য, যৌবনের লীলা খেলা, ক্ষমতার মদমত্ততা – লায়লাকে যেন সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলল। ও এই সবের মাঝে কেবলই ভাবত কত ভাবনা।

জব্বর কেমন? তা বলা মুস্কিল। মানুষ চেনা অত সহজ নয়। মানুষ মাত্রেই বদলায়, আজ যে ভাল কাল সে খারাপ হয়, কাল যে ভাল পরশু সে খারাপও হতে পারে – আবার একের ভাল অপরের চোখে খারাপ, আবার অপরের কাছে যা ভাল, অন্যের কাছে তা আরও খারাপ। সুতরাং – ভাল মন্দের বাছবিচার করা অত সহজ ব্যাপার নয়।

লায়লা খালি ভাবত, জব্বর কেউটে-বাচ্ছা – ছোবল দিয়ে পালাবে নাতো? যদি পালায়? তখনও বাঁচবে কোন ঔষধে?

এই সব ভাবতে ভাবতে লায়লা আপন মনে হেসে উঠে। মনে মনে বলে, হ'কগে ও কেউটের বাচ্ছা। আমিও কালনাগিনী। ও যদি আমায় দংশায়, আমিও তখন আমাকেই দংশাব। তখন বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে। আমি আঙ্গুর নই, রশ্মিও নই – ব্যারাকের বেওয়ারিশ মেয়েও নই। আমি বাংলার বেগম – 'লায়লা মঞ্জুর।' মঞ্জুর নয়, মঞ্জরী। যার গন্ধে ভরে উঠবে – দিকদিগন্ত, আকাশ বাতাস, জল স্থল সব কিছু। আমার রূপের ছটায় জ্বলে পুড়ে মরবে হাজার হাজার পতঙ্গ, যেমনি মোমের আলোয় পুড়ে মরে। আমার ইঙ্গিতে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির ভিতও থর্ থর্ করে কেঁপে উঠবে। উঃ! তখন কি মজাই না হবে! এই সব ভাবতে ভাবতে লায়লা – বারংবার দামী দামী কাপড় পরে আর বদলায় – গহনা পরে আবার

খুলে ফেলে। বিভিন্ন সাজে সুসজ্জিত হয়ে নির্জন প্রাসাদে নাচে আর গান গায়। আপন মনে বিভিন্নরূপে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, বিভিন্ন নাচে গানে অবসর বিনোদন করে। জব্বর ফিরলে তার সেবাশুশ্রূষা – আনন্দ আহ্লাদ, যৌবনের মদিরাচ্ছন্ন লীলা খেলায় বিভোর হয়ে ওঠে।

তার উন্মাদনার যেন নিরসন হয় না। জব্বরকে নিয়ে লোফালুফি করতে করতে – তার জ্বলন্ত রূপশিখায় উদ্বেলিত যৌবনের প্রবল প্রবাহে জব্বর যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে – খড়-কুটোর মতই ভেসে যায়। তখনও লায়লা – অস্থিরমতি – উচ্ছ্বাস উত্তাল। সে হাসতে হাসতে যেন ককিয়ে ওঠে। বলে – কি? নারী –? নারী কি জিনিষ এবার চিনেছ? তুমি হেরে গেলে। এই বলে লায়লা – ঢক্ ঢক্ করে মদ গেলে। মদ খেয়ে চুর হয়ে জব্বরের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

আর জব্বর? জব্বর তখন অবিন্যস্ত বেশবাসে অর্দ্ধাবৃত এই লীলা কৌশলময়ী অপরূপার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সস্নেহে তার অঙ্গাবরণ ঠিক করে দিয়ে আদর করে যত্ন করে ভালভাবে শুইয়ে দেয়। তারপর ঘুমন্ত লায়লার বিচ্ছুরিত যৌবনের লীলায়িত তরঙ্গে আত্মহারাও অচেতন হয়ে পড়ে। নিজের মনেই বলে ওঠে, আমি ভাগ্যবান! আমি আজ সব পেয়েছি – আমার আশা আকাঙ্ক্ষা অতীত ভবিষ্যত বর্ত্তমান সবই আজ পেয়েছি হাতের নাগালের মধ্যে। লায়লা তুমি যেন দীর্ঘায়ূ হও! আজীবন তোমায় আমি মাথায় করে রেখে দেব, তোমার আজ্ঞাবহ গোলাম হয়ে থাকব। এই বলতে বলতে জব্বর লায়লার মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে – আদর করে তার কপোল চুম্বন করে ঘুমিয়ে পড়ে।

নয়

পূর্ব্ববাংলার দিনগুলি যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায়। ঠিক আগেকার মতই পূবদিকে সূর্যি ওঠে – আবার পশ্চিম দিকে ডুবে যায় – এর যেন এক রত্তিনও ব্যতিক্রম হয় নাই। সূর্য্যিমামার গায়ের রংও বদলায় নাই, আকাশের রং ও এক টুকুও ফিকে হয় নাই। সন্ধ্যা আকাশে সন্ধ্যাতারগুলো দপ্ দপ্ করে জ্বলে – সাত ভাই ঠিক তেমনি ধারাই মায়ের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যায়, তাদের অনুজ্জ্বল নিষ্প্রভ দীপ শিখা ঠিক তেমনি ধারাই আকাশে মিট্ মিট্ করে জ্বলে। এখন খালি মনে হয় ওদের আঁখিজল যেন একটু একটু করে ঝরে ঝরে পড়ছে এই ধরণীর বুকে। মা-হারা ছেলে ঐ সাত ভাইকে আকাশে দেখা যাচ্ছে – কিন্তু পিতৃহারা, বাস্তুহারা, ভ্রাতা-ভগ্নিহারা, স্ত্রী-পুত্রহারা সর্ব্বহারা নক্ষত্র কোন্টা? আকাশে এত যে নক্ষত্র রয়েছে – তার মধ্যে যুবতী ভার্য্যার বুক থেকে যুবক স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে খুন করা এবং সেই বিধবা যুবতী বধু পৈশাচিক বর্ব্বরতায় মরে গেলে তার নক্ষত্র কোনটা? চোখের সামনে মা-বাপকে গুলি করে হত্যা করার পর পাঁচ ছয় বছরের কচি শিশুটির বুকে একটা মাত্র গুলি লেগে ঐ নক্ষত্র লোকে চলে যাওয়া – ঠিক ওমনি ধারাই কত শত শিশুর নক্ষত্র কোন্ – কোন্টা? কে জানে কোন্টা? মানুষ মরে গেলে যদি নক্ষত্র হয় – আর নক্ষত্র হয়ে যদি ঐ নক্ষত্রলোকে জ্বল্ জ্বল্ করে, মিট্ মিট্ করে জ্বলে – তবে জীবিত আপন জনরা খুঁজে নিক না কেন – তাদের প্রিয়জন কোনটা না কোনটা।

সুশ্যামল সোনার বাংলা! মাতৃরূপিণী বাংলা! যার প্রতিটি নদ-নদী অকাতরে বিতরণ করে সুধা আর সুধা, প্রতিটি পাদপ, প্রতিটি মহীরূহ, প্রতিটি ওষধি পর্য্যন্ত অকাতরে দান করে অজস্র জীবিকা আর জীবন, যার রূপ রস ও গন্ধ তুলনাহীন – চিরহরিত, প্রাণপল্লবে ভরপুর, সেই বাংলা আজ যেন জড়-স্থবির, লোলচর্ম্মসার বৃদ্ধা। আজ এ যেন এক ভয়ঙ্করা দন্তহীনা ডাইনী – এর চক্ষে রুদ্রের রূপ, নিঃশ্বাসে নিঃস্বের হতাশ্বাস, অন্তরে আর্ত্তের কান্না!

এখানে মানুষ আর কি নিয়ে বাঁচবে – কি নিয়ে বাঁচতে চাইবে? কিসের আশায় আবার বুক বাঁধবে? এ বাংলা এখন মরুভূমি – খালি বালি আর বালি, প্রখর রোদে ঐ বালুকণা হয় আগুন, ঠাণ্ডায় হয় যেন হিমশীতল বরফ।

এখন গোটা পূর্ব্ববাংলাই যেন এক লক্ষ্মীছাড়া দেশ। যারা মরেছে তারা শান্তি পেয়েছে, যারা মরে নাই তারা জীবন্মৃত, মৃত্যুর উপর তাদের বড় মায়া বেড়েছে – যারা সুখ এবং শান্তির ভান করে – সুখ এবং আশার মোহে বাঁচতে চাইছে, তাদের বুকেও অক্লান্ত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে তাদের স্তব্ধ করে দিচ্ছে – নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও যেন এখন ওদের বিপদ এনে দিতে পারে যে কোন সময়, দম নেবার মত হাওয়া নাই একটুকুও – যা একটু আধটু আছে, তাও নির্য্যাতিতের হতাশ্বাসে, মৃতার শেষ নিঃশ্বাসের বায়ুতে বিষাক্ত।

গ্রামের পর গ্রাম জনমানবশূন্য। বাড়ীঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে – ধনসম্পত্তি সব কিছুই লুণ্ঠিত, যেখানে সেখানে মৃতদেহ শিয়াল কুকুরে খাচ্ছে, দু'চারটি গবাদি পশু ইতস্ততঃ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা মানুষ দেখলেই থম্কে দাঁড়ায়, হাম্বা হাম্বা করে ডাক ছাড়ে – আপনা আপনিই তাদের চোখ হতে জল গড়িয়ে পড়ে। যেখানে সেখানে রক্তের দাগ, অত্যাচারের বীভৎসতা,মৃতদেহ। কোন গ্রামে দু'একটি মানুষ যারা আছে, তারাও অর্দ্ধমৃত। যেন পঙ্গু – তাই পড়ে আছে, চলতে পারলে চলে যেতো।

যারা চলে যায় তারা দল বেঁধে যেতে চায়। সীমান্তের রাস্তা অপরিচিত। কেউ কেউ জানে কেউ কেউ আবার জানে না। বিশেষ দু'একটি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে প্রাণে বাঁচবার জন্যেই ওরা চলেছে দিনের পর দিন। তাও রাস্তায় রাজাকার ও বদমাসের সন্ত্রাস। সব কেড়ে কুড়ে নেয় – উলঙ্গ করে কাপড় ঝাড়া দিয়ে তবে ছাড়ে। মেয়েদের মাথার খোঁপা খুলে দেখে তাতে কিছু আছে কিনা। সুন্দরী সোমত্ত মেয়ে বা যুবতী বধূর নিরাপত্তা নাই এক বিন্দুও। ওরকম কেউ সঙ্গে থাকলে পথচারীদের বিপদ আরও অনেক বেশী। বাচ্চা কাচ্চা হতে আরম্ভ করে স্থবির বৃদ্ধ এবং রোগী ও মুমূর্ষু পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই

প্রাণে বাঁচতে চায় – আর বাঁচতে চায় বলেই তার লাইন দিয়ে চলেছে সীমান্তের পথে। অত্যাচার শুরু হলে কঁকিয়ে ওঠে, চীৎকার করে বলে, বাবা প্রাণে মেরো না – যা আছে সব নিয়ে নাও।

প্রকাশ্য দিবালোকে জনাকীর্ণ গ্রামের মাঝখানে থেকে বাবা-মার বুক হতে মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া, স্বামীর বুক হতে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেওয়ার বিভীষিকা সয়ে সয়েও তারা আবার বাঁচতে চায় –! কোলের কচি খোকা কিম্বা খুকীকে ছিটকে ফেলে দিয়ে জঙ্গী ফৌজ যুবতী বধূকে যখন টেনে নিয়ে চলে যায় তখনও ঐ পরিবারের – আর সব লোক প্রাণে বাঁচার তাগিদে সীমান্তের দিকে পা বাড়ায়।

অত্যাচারিতের বীভৎস গ্লানি, ঘৃণা, অবমাননা নিয়েও মানুষ কেন বাঁচতে চায়? তাদের বেঁচে কি সুখ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

এইতো আজকেরই ঘটনা। ঐ অঞ্চলটার তখনও বিশেষ পতন ঘটে নাই। মুশ্লিম-বহুল জনপদ। শতকরা পাঁচ ঘরও হিন্দু ছিল না সেখানে। যারা ছিল তাদের উপর মুসলমানদের বিশেষ আক্রোশও ছিল না। ওরা পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি নিয়েই বাস করত। কিন্তু আজই অপরাহ্নে ঐ অঞ্চলে যেন এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও বিধ্বংসী ঝড় সব তছ্নছ্ করে দিয়ে গেল। মাত্র এক ঘণ্টার ব্যাপার – কি যে হ’ল, আর কি যে না হ’ল এর ঠিক-ঠিকানাও হিসাব নিকাশের বাইরে।

দিনমজুর ও দীনদুঃখীরা তখনও মধ্যাহ্নভোজন সেরে উঠতে পারে নাই, মধ্যবিত্তরা খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে কি কেউ কেউ আপন আপন কাজে বার হবার উপক্রম করেছে – আর সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের মানুষেরা দিবানিদ্রা সেরে হয়ত চা পানের আয়োজন করছে কিম্বা করবে – এমন সময় মোটরের শব্দে সকলেই সচকিত হয়ে উঠল। যে যার হাতের কাজ ও মুখের গ্রাস ফেলে রেখে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কি বুঝি হবে এখনই।

হ’ল – যা হবার নয় তাই – আর যখন তা হ’ল তখন মানুষ আর কোন কিছু করার সময় এবং সুযোগ পেলো না – পেল কেবল আল্লা কিম্বা ভগবানের নামটা মনে মনে একবার স্মরণ করার।

আট দশ খানি মিলিটারী ট্রাক গ্রামের দু’প্রান্তে প্রধান সড়কের দু মুখে থেমে গেল। একখানি জিপে দুটি বাঙ্গালী মুসলমান ছোকরা, দু’জন জঙ্গী অফিসার ও কয়েকটি পাকফৌজ, প্রত্যেকেরই হাতে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, যার ঘোড়া টিপলে এক নাগাড়ে কয়েক শত দূরপাল্লার বুলেট বেরিয়ে যায়, আধ মাইল দূরের প্রাণীও এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যায়। এক কথায় এই রকম একটি অস্ত্র নিয়ে অবলীলাক্রমে কয়েক হাজার লোককে এক নিমেষে যমালয়ে পাঠানোর একরত্তিনও অসুবিধা নাই। তারা গ্রামে প্রবেশ করল।

জিপটা থামল – এক হিন্দু ব্যবসায়ী রমানাথের দোকানের সামনে। রমানাথ মণ্ডল ওখানকার নামকরা ব্যবসায়ী। ফৌজগুলো সোজা ওর দোকানে ঢুকে রমানাথকে টেনে বার করে নিয়ে এসে একটা গাছে বাঁধল – ঐ সময় একটি স্থানীয় মুসলমান ছোকরা ওখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে দিল একটু অফিসার। রক্তাপ্লুত অবস্থায় ঐ যুবকের দেহতনু ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। রমানাথ তখন হরেকৃষ্ণ নাম জপছে – ভয়ে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া, অফিসারটি তখন জীমূতমন্দ্রে বলল, ‘আপকা যো কুছ্ হ্যায় সবকুছ মেরা আদমীকো নিকাল দিজিয়ে। নেইতো জান লে-লেঙ্গে।’ ওদের যে এনেছিল সেই মুসলমান যুবকটি বলল, তোর যা আছে সব দিয়ে দে – না দিলে এখনই তোর জান নিয়ে নেব। তখন রমানাথ বলল – দিচ্ছি, আমায় জানে মেরো না বাবা।

তখন একটু যুবা – ওর বাঁধন খুলে দিয়ে ওকে দোকানের মধ্যে নিয়ে গেল এবং টাকাকড়ি যা ছিল সব নিয়ে নিল, এবং ব্যাংকের ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই করিয়ে একটি মিলিটারী ট্রাকের সৈন্যদের ওর দোকান লুঠ করতে বলে সে জিপে উঠে পাশের বাড়ীতে প্রবেশ করল।

পাশের ত্রিতল প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি ওখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তি হাজী সাহেবের। তাঁর দুই ছেলের মধ্যে একছেলে সস্ত্রীক থাকে বিলাতে, একছেলে থাকে ঢাকায়, বড় ডাক্তার। বাড়ীতে আছে – নিজের স্ত্রী দুই যুবতী কন্যা, এবং এক পুত্রবধু ও নবজাত নাতি।

তখনও ঐ গ্রামের মুসলমানেরা ভাবছে, খান সেনারা হয়ত হিন্দুদের উপরই অত্যাচার করবে। তাই তারা গ্রাম ছেড়ে পলায়নের কোন চেষ্টা চরিত্রই করে নাই। হাজীসাহেব জানেন – আমার মত বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান লোকের উপর ওরা কোন অত্যাচার করতে পারে না। তাই তিনি নিশ্চিন্তে বসেছিলেন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে।

কিন্তু আল্লার লিখন ছিল সবই উল্টো। জিপটি সহসা হাজীসাহেবের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। জিপ থেকে নেমেই সকলে হাজীসাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করে তাঁর আদরের তনয়াদুটিকে ও পুত্রবধুকে সকলের সামনেই টেনে নিয়ে এলো এবং জিপে তুলেই ষ্টার্ট দিল। হাজীসাহেব ও তাঁর স্ত্রী নির্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন। তাঁদের চোখে না বেরুল একবিন্দু অশ্রু, না বেরুল মুখ দিয়ে কোন প্রতিবাদ। এ যেন আগে থেকেই সব ঠিক করা ছিল এবং ওরা সবই জানতেন, নূতন কিছু নয়।

সহসা হাজীসাহেব নিজের বন্দুকটা বুকে লাগিয়ে আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্ত হ'লেন। কিন্তু তাঁরই এক ভৃত্য তাঁর বন্দুক কেড়ে নিয়ে বাড়ী থেকে ছুটে পালাল।

ও-ধারে ঐ জিপটি ঐ গ্রামেরই আরও কয়েকটি রমণীরত্ন সংগ্রহ করে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ল। তখন গ্রামের দুপ্রান্ত হতে মর্টারের গোলা গোটা গ্রামটাকে ধ্বংস করে দিল। গোটা গ্রামটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। মর্টারের গোলায় ও সৈন্যদের স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিতে এক দণ্ডে প্রচুর লোক নিহত হ'ল। দু'চারটি যারা প্রাণে বাঁচতে চাইল এবং সুযোগ পেলো – তারা পালাল, কেউ কেউ বা গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করল। ওধারে ফৌজরা লুঠের মাল ও রমণীরত্ন নিয়ে আবার ফিরে চলে গেল। এধারে আগুণের লেলিহান জিহ্বা, আর্ত্তের ও অর্ধমৃতের আর্ত্তনাদ – শোকার্ত্তের ক্রন্দনরোলে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

এইতো কবেকার কথা, একটা যুবা অর্ধোন্মাদের মতই – ছুটতে ছুটতে একটা মুক্তিফৌজের ঘাঁটিতে এসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। তার জ্ঞান ফেরার পর সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সুস্থ হয়ে বলেছিল, আমাদের গ্রামেরই একটা লোক রাজাকার – আমি জানতাম না। সে আমাদের প্রায় কুড়ি পঁচিশটা লোককে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক সৈন্য ব্যারাকে তুলল। সেখানে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ আমাদের প্রত্যেককেই একটি করে খাল কাটতে বলল। আমরা বাধ্য হয়ে তাই করলাম। তখন দশ পনেরটি ফৌজ এসে গেল এবং প্রথম ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলল সেই মৃতদেহটা খালে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিতে – সে তাই করল, এবং তার কাজ শেষ হতে না হতে তাকেও গুলি করে মেরে দিল একটি ফৌজ। এই ভাবে সব লোক গুলোই খুন হয়ে গেল। আমিও ঐ দলেই ছিলাম আমারও মৃত্যু অনিবার্য্য জেনে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। সেই সময় ঐখানে একটি ট্রাক এসে দাঁড়াতেই আমি এক নিমেষে ঐ ট্রাকের পাশে লুকিয়ে পড়লাম এবং একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। তারপর নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব সাঁতারে পালিয়ে এলাম। মাঝে মাঝে খালি নাকটা বার করে শ্বাস প্রশ্বাস নিতাম। এই ভাবে প্রায় দেড় দু' মাইল চলে এসে প্রাণ বাঁচালাম। সেই সৈন্যগুলো তখন ঐ ভাঙ্গাবাড়ীর ঘরগুলোতে আমায় তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল – তাই আমার প্রাণটা বাঁচল।

দশ

বেশ কিছুদিন পরের কথা। লায়লার অগ্নিগর্ভ রূপ ও যৌবনের প্রবল তরঙ্গে জব্বর যেন হেজে উঠল। ওর নারী লোলুপ কুরুচিপূর্ণ স্বভাবে এবং মানসিক বিকারে যেন ভাটি এনে দিল লায়লা। লায়লা মদ্য পান করে, নাচগান করে এবং জব্বরের তালে তাল দিয়ে তাকে যেন বারংবার ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর দেখা গেল জব্বর যেন কেমন উদাসীন হয়ে গেছে। নারীর প্রতি সহজাত অন্যায় আকর্ষণ হতে ও যেন মুখ ফিরিয়ে নিতে চায়। এক কথায় লায়লার উদ্বেলিত যৌবনের প্রবাহে জব্বর যেন এখন নিতান্ত খড় কুটোর মতই ভেসে চলে যায় – সে হার মানে।

একধারে কামনার তীব্র হলাহল, অপর ধারে অক্ষমতার গ্লানি – দিনের পর দিন তাকে যেন পঙ্গু করে তুলল। সে ক্রমশঃ যেন ধর্ম্মভীরু সাচ্চা মানুষ হতে চেষ্টা করতে লাগল। ভোগের প্রাচুর্য্যে দিনাতিপাত করে বাধা ও বল্গাহীন জব্বর শীর্ণকায় হয়ে উঠল এবং সব কিছুতেই যেন তার বিতৃষ্ণা ও নিস্পৃহতা পরিস্ফূট হতে লাগল – তখন তার মন নূতন একটা কিছু করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল।

কিন্তু নূতন কিছু এ সংসারে আর কি আছে? বিশ্বাসহন্তা দেশোদ্রোহী চরিত্রহীন নরাধম জব্বর সব কিছুই এর মধ্যে সেরে ফেলেছে, নিচ ও কু-কর্ম যা কিছু এ সংসারে আছে তা সবই করেছে। এখন নতুন কিছু যদি করতে হয় – তবে তাকে পুরোপুরি সাধু হয়ে যেতে হবে, দেশপ্রেমিক হতে হবে, নয়ত বা পাকিস্থানী জঙ্গী ফৌজ বা অফিসারদের উপর নিজে হাতে গুলি চালাতে হবে – অথবা তার বাগদত্তা সুন্দরী যুবতী ভাবী স্ত্রী লায়লাকে ঐ পাকিস্থানীদের হাতে তুলে দিয়ে নূতন কিছু একটা রেকর্ড করতে হবে।

এ সংসারে এটা যেন এক অনিবার্য্য নিয়ম। মানুষ ছেদহীন ভোগের প্রাচুর্য্যে থেকে থেকে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে – সব কিছুতেই যেন অরুচি ধরে যায়। তাই মানুষ এ বিশ্ব সংসারে বিভিন্ন কাজ করে, বিভিন্ন মানসিক সংঘাত সয়, আর তা সইতে সইতেই নিত্যনৈমিত্তিক ভোগেও অনাগ্রহী হয়ে পড়ে – ওতে যেন অরুচি ধরে যায়। যে মানুষ একঘেয়ে ভোগ আর ভোগ এবং অন্যায় আর অন্যায় করে যায় তার রুচি পরিবর্ত্তন হয়ত একদিন না একদিন হবেই হবে। জব্বর যেন এর একটা মস্তবড় উদাহরণ। লায়লা যখন তার বাগদত্তা স্ত্রী হিসাবে নিজেকে উজার করে দিল এবং জব্বরের ভোগাসক্ত মন ও প্রাণ ঘাসের মতই নুইয়ে পড়তে লাগল, তখনই তার সহজাত কামনা ও মাদকতা দূরীভূত হয়ে গেল এবং আবার একটা অন্য কিছু করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠল।

কিন্তু অন্য আর কি সে করবে? লায়লা মদ খায় – গান করে, নাচে। তার নাচ গান এবং যৌবনের লীলায়িত তরঙ্গ যেন আদি ও অনন্ত, তার যেন শেষ নাই। তার রূপশিখার বারবাবহ্নিতে জব্বর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার ভষ্মরাশি এখন যেন হাওয়ায় ফুর ফুর করে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। তাই এখন তার মাথায় নানা রকম দুর্বুদ্ধি গজাতে লাগল। সেই দুর্বুদ্ধির প্রকাশ পেতে লাগল, মাঝে মাঝে পাকিস্তানী ফৌজের কর্তাদের নিয়ে এসে নাচ গানের আসর করা এবং লায়লার সঙ্গে তাদের ভিড়িয়ে দেওয়া – লায়লাও যেন সমুদ্র। প্রতিদিন আকণ্ঠ মদ্যপান করে নাচে গানে ভরপুর হয়ে ওঠে। সে প্রতিদিনই একাধিক পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতেও দ্বিধা বোধ করে না এবং ক্লান্তও হয় না – বরং আরও যেন আনন্দ উপভোগ করে; জব্বরকে আরও বেশি আদর করে – আর এতে জব্বরেরও প্রমোশন হয়, টাকা রোজগার করে গাদা গাদা।

পরের দিন সকালে লায়লা বিছানা ছেড়ে উঠে যেন নূতন মানুষ হয়ে উঠল। আগের দিন রাত্রে কি হয়েছে না হয়েছে – লায়লা কতটা মদ খেয়েছিল না খেয়েছিল- – কয়জন পুরুষের শয্যাভাগিনী হয়েছিল না হয়েছিল, এসব যেন তার কিছু মনে ছিল না। সে সহজ সরল মানুষের মত এবং জব্বরের পরিণীতা স্ত্রীর মত – একটি শিক্ষিতা সুমার্জিতা

রমণীর যে আচার ব্যবহার করা দরকার সে তাই-ই করল। জব্বরের জড়বুদ্ধি তখন আবার মোহান্ধ ও মাতোয়ারা হয়ে উঠে, অতীত ভুলে গেল। এইভাবেই কেটে যায় জব্বরের দিন।

কিছুদিনের মধ্যেই লায়লা অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়ল। সে যখন জানতে পারল তার গর্ভে এক অজ্ঞাত পিতার অজানা সন্তানের আবির্ভাব হয়েছে-তখনই সে যেন আরও ভয়ানক বেপরোয়া হয়ে উঠল। তার সেই দুর্দ্দমনীয় বাসনার বারবাবহ্নিতে একাধিক সামরিক অফিসার ও জব্বর জীবন্ত আত্মাহুতি দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। তারা লায়লার নির্দেশে এখন সবকিছুই করতে পারে। লায়লাও বুঝেছিল তার কাজকর্ম ও প্রয়োজন এবার শেষ হয়ে আসছে। এইবার একটু বিশেষ কিছু করা দরকার। সুযোগ সমাগত – নতুন কিছু একটা করার প্রয়োজন তো ছিলই।

লায়লা এখানে জীবনকে ভোগ করতে আসে নাই। নিজের জীবন দিয়ে দেশের জন্যে কিছু না কিছু করতে এসেছিল। কিন্তু সেই করণীয় কাজ করতে গিয়ে তাকে অনেক কিছু স্বীকার করতে হয়েছে – জীবন আহুতি দিতে হয়েছে, জীবনের সর্বস্ব খোয়াতে হয়েছে। তবে তার কপাল ভাল যে আজ পর্য্যন্ত সে যা করেছে, তাতে তাকে আনন্দ বই নিরানন্দ পেতে হয় নাই। তার যৌবনের ভরা গাঙে ব্যাভিচার, অনাচার, সবকিছুই আচারে পরিণত হয়েছে – সে মনের আনন্দেই সব কিছু সয়েও নিয়েছে। যতদিন সে পেরেছিল নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছিল – যখন পারে নাই, তখন নিজেকে উপুড় করে পরের হাতে ঢেলে দিয়েছে। তবু তার জিদ, একটা না একটা কিছু করবেই করবে। তাই সে পূর্ববঙ্গের সেরা সেরা বাইজী ও বারবনিতার মত সমান তালে পা ফেলে চলেছে। ক্যান্টনমেন্টে আটকানো নারীদের মতই বাধ্য হয়ে, সেও সবকিছু স্বেচ্ছায় সয়ে গেছে – মেনে নিয়েছে। এবার তার কাজ, নেশা খোর বুঁদ হওয়া মানুষগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে টানা হেঁচরা করা। তাই সে শেষ পর্বের জন্যে দিন দিন তৈরী হতে লাগল। গর্ভের সন্তান যতই বর্দ্ধিত হতে লাগল সেও ততই তা গোপন রেখে প্রহসনের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে চলে এলো এবং ক্ষিপ্র হতে ক্ষিপ্রতর পদ্ধতি অবলম্বন করতে লাগল।

এগার

লায়লার সখ জলবিহার করা। লায়লা এখন যদিও পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের দেওয়া জব্বরের একটা বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ীতে রাজরাণীর মতই থাকে, তা হলেও ঐ বাড়ীতে এখন কয়েকটি সামরিক অফিসারের যাতায়াত অব্যাহত ছিল। উদ্দেশ্য, সাময়িক আকণ্ঠ আনন্দ উপভোগ। এখানে তার ত্রুটিও ছিল না। লায়লা একাই যেন একশো। নাচে, গানে, লীলায়িত দেহতনুর স্পন্দনে, ডগ্‌মগে প্রাণ প্রাচুর্য্যে সর্ব্বক্ষণ গোটা বাড়ীটাকেই সে যেন মাতিয়ে তুলত।

সাময়িক কর্ত্তারাও এখন আর জব্বরের বড় একটা প্রয়োজন বোধ করে না। ওরা জব্বরের কাছেই শুনেছে নবজাত মুক্তিসংগ্রামীদের হদিস পেতে হলে লায়লাই উপযুক্ত ইনফরমার। তাছাড়া বিরাট বপু সামরিক কর্ত্তাদের প্রচণ্ড ইন্দ্রিয় দাবানলে শান্তি জল শিঞ্চনে লায়লা অদ্বিতীয়। ঐ সমস্ত অফিসার মহলে লায়লার প্রভাব অবর্ণনীয়। মোহান্ধ মানুষগুলোকে লায়লা এখন যা করতে চায়, তাই-ই করতে পারে বিনা দ্বিধায় এবং বাধায়।

লায়লাও শক্ত সমর্থ মেয়ে। প্রতিদিনই দু তিনটে পুরুষকে সে অবলীলাক্রমে সঙ্গ দেয়। এই মায়াবিনী তাই হয়ে উঠেছিল অলিখিত এবং অজ্ঞাত এক নায়িকা। লায়লার নির্দেশে হয় না এমন কাজ নাই – এখন একটা ক্যাণ্টনমেণ্টের মুকুটমনিগুলো লায়লার আজ্ঞাবহ দাসানুদাস।

জিয়াস খাঁ বুঝতে পেরেছিল, জব্বর জীবিত থাকলে সারারাত লায়লাকে অঙ্কশায়িনী করার পক্ষে অসুবিধা – তাই ও এখন জব্বরকে এ ধরণীর বুক থেকেই সরাতে চায়। যদিও ইদানীং জব্বর কঙ্কালসার এক অপদার্থ তরুণ, তার কার্য্য সীমাও সীমিত – সন্ধ্যার পরই তাকে আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়ে পাশের একটা সুসজ্জিত কক্ষে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত এবং লায়লা যা খুশী তাই-ই করত – তা হলেও জিয়াস খাঁ খালি উস্‌খুস করত জব্বরের বুকে একটা বুলেট মারার জন্যে। সে দু'তিন দিন এ্যাটেম্পটও নিয়েছিল। কিন্তু লায়লা ওর হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়ে বলেছিল, না –! এখন থাক, ওকে দিয়ে মুক্তিফৌজদের আরও কিছু সন্ধান যোগার করে নিতে হবে। আমাদের পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টকে এ যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। আমি তো তোমারই রইলাম চির জীবনের জন্যে।

জিয়াস খাঁ লায়লার এ কথা মেনে নিয়েছিল, বলেছিল – কিন্তু তুমি যে পুরোপুরি আমার – সে কবে –? কবে হবে গো?

লায়লা সহাস্যে তার প্রায় নিরাবরণ দেহতনুটি মদ্যপ জিয়াস খাঁর কোলের উপর এলিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'জিয়াস, তুম্ মেরা জান্!'

সেদিন জিয়াস খাঁ আনন্দের অতিশয্যে হাহাকার করে উঠেছিল। তার চোখ ফেটে আনন্দাশ্রু টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়েছিল লায়লার নিরাবরণ বক্ষে। লায়লা তড়িতাহতের মতই উঠে জিয়াসের চক্ষু মার্জনা করে বলেছিল, 'জিয়াস তোম রোতা হ্যায় কেঁও –? কেঁও তোম রোতা হ্যায়? তোম রোনেসে ম্যায় মর জাউঙ্গি।'

সেদিন জিয়াস খাঁ যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে লায়লাকে নিজের হৃদয়ের সঙ্গে পিশে একাকার করে দিতে চেয়েছিল, করেছিলও। সেদিনকার উপভোগ্যতায় ও পেয়েছিল – পরম কমনীয় তৃপ্তি, হৃদয় নিঙরানো ভালোবাসার পরম আস্বাদ, অনবদ্য ও পুতঃ প্রেমের প্রস্রবণ।

আর সেই দিনই জিয়াস খাঁ লায়লার আপত্তির কথা ভুলে গিয়ে জব্বরের বুকে পর পর তিন তিনটি গুলি করেছিল, যাতে জব্বরের মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। ওর জিদ – যে ভাবেই হোক, লায়লা হবে ওর একলার; আর কারোর, কারোরই-নয়।

জব্বরের মৃত্যুতে লায়লাও কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল – তুমি আমার ডান হাতটাই ভেঙ্গে দিলে। জব্বরকে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক খবর যোগাড় করতে পারতাম। আসলে এই মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস না করা পর্য্যন্ত আমার সুখ শান্তির অনেক বাধা। মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করতে পারলেই তবে হবে তোমার পদোন্নতি, আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবই বাড়বে। তারপর আমরা উভয়ে –

জিয়াস খাঁ বলেছিল, ‘তোম সোচো মাত্। হাম সবকুছ বন্দোবস্ত করেঙ্গে।’

এর পর অনেক ক’টা দিন কেটে গিয়েছিল। এখন ওরা জব্বরকে প্রায় ভুলেই গেছে। তবু সমগ্রদিনটি লায়লা একা একা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ওর মাথা যেন গরম হয়ে ওঠে। ওর মনে হয়-ও যেন পাগল হয়ে যাবে। তাই ওর মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে – অন্ততঃ একটা না একটা কেউ আসুক। কিন্তু কে আর আসবে! আসার মধ্যে আছে আরও দু’টি সামরিক কর্ত্তা। তারা মাঝে মাঝে আসে – হয়ত আবার আসবে। কিন্তু জিয়াস খাঁ যে বলেছে-‘তুম্ বিলকুল মেরী জান, আউর কিসিকা নে-হি!’

তবে –? লায়লা আবার ভেবে চলে আকাশ পাতাল। তার মনের পর্দায় চলচ্চিত্রের ছবির মতই অতীতের সবকিছু ক্ষণেকের জন্যে প্রতিফলিত হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলে যায়। একের পর এক আসে – মা-বাবা, লুৎফা, কাকলি, বিপ্লব, নুরুল, সাবিত্রী, রশ্মি, মফিজ রহমান, নন্দিতা – এরা যেন বারংবার ওর মনের পর্দায় উঁকি ঝুঁকি মারে আর ওকে দেখে ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ওদের মধ্যে বিপ্লব এলেই ও যেন ভয়ে আঁৎকে ওঠে, প্রসন্ন মুখখানা নমিত করে মার্জনা ভিক্ষা করে। কিন্তু বিপ্লবের ক্রোধানল-সে মানতে চায় না লায়লার কোন যুক্তির কথা। সে বলে হয় জান নেব-নয় দেব। অপমান সইবার জন্য জন্মাই নাই। তাই লায়লার এহেন অবনতিতে বিপ্লব ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়, লায়লাকে লক্ষ্য করে তার হাতের রাইফেল গর্জন করে ওঠে-দ্রাম্-দ্রাম্-দ্রাম্ –! লায়লা ভয়ে আর্ত্তনাদ করে ওঠে – না –! না-! না –! আমায় মেরো না – আমি বাঁচতে চাই, এই বলে লায়লা ঘরের মেঝেয় বসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নাই। তখন সে বালিসে মাথা গুঁজে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে – চোখের জলে তার বালিস ভিজে যায়, আকাশ বাতাস পৃথিবী সব কিছুই তার কাছে ভারি হ’য়ে ওঠে – দেহতনুখানি ন্যাতার মতই হাল্কা হয়ে পড়ে, প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যাবার উপক্রম হয়।

এক একবার ভাবে বেশ তো ছিলাম কেন আমি মরতে এখানে এলাম! আমার নিজের কৈফিয়ৎ যে নিজের যে নিজের কাছেই আর খুজে পাচ্ছি না – আমার ভবিষ্যৎ কি? এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার না – আমার ভবিষ্যৎ কি? এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার তার মনের দর্পণে নিজের অজ্ঞাতেই এসে হাজির হয়, সৌম্যকান্তি বিপ্লব – নির্যাতিতা স্নেহের ভগ্নি লুৎফার অত্যাচারিত প্রাণহীন দেহটা, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর মেয়ে কাকলিটাও প্রাণের কান্নায় ককিয়ে উঠে কোন জনারণ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে-তার কণ্ঠ এই পৃথিবীতে আর কোন দিনই শোনা যাবে না। যেমনি গেছে ওর মা বাবা সকলেই। তবে –? এ তবের উত্তরটা কি? বিপ্লব তাকে কি ভাববে? এ দুনিয়া – এ বিশ্বসংসার – তার গায়ে যে থুথু দেবে। লায়লা এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে যেন পাগলপারা হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ মেঝেয় পায়চারি করে বেশবাস বদলাতে লাগল। তাকে আজ অপ্সরার সাজে সাজতে হবে। আজ আবার কে কে আসবে কে জানে?

সে বন্ধদ্বার নির্জন ঘরে অঙ্গাবরণ ফেলে দিয়ে দামী দামী গহনা ও বহুমূল্য শাড়ী ব্লাউজ সায়া পরায় মনোনিবেশ করল। ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা বিরাট আয়নায় তার নিরাবরণ দেহতনু প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সে যেন আঁতকে উঠল। নিজের হাতের পরিধিটা একবার মেপে দেখল, সে আগের থেকে যেন আরও একটু মোটা হয়েছে, রঙটি আরও যেন চক্চকে হয়ে উঠেছে। কিন্তু আঁখির কোণে ঈষৎ যেন কালিমার অদৃশ্য আস্তরণ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝা যায় না। আর –? আর তার পেটটা যেন ঈষৎ উঁচু। দেখে মনে হয় ওর যেন ভুঁড়ি নামছে। তখনই ও ভয়ে যেন শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি একটা সায়া কোন রকমে জড়িয়ে বিবস্ত্রার বিষদৃশ দৃশ্যের বীভৎসতা হতে নিজেকে রক্ষা করল। দু’ হাতে

সায়াটার দুপ্রান্তে ধরে বারংবার ঘুরে ঘুরে ও নিজেকে আবার সেই আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, দেখতে দেখতে ওর মনটা আবার ছুটে চলে গেল হিসেব নিকেশ করতে।

বোধ হয় মাস দুয়েক আগেকার কথা। লায়লা তার নারীদেহের প্রাকৃতিক ঘটনার কথা ভাবে। জব্বর, জিয়াস এবং আরও দু'জন সামরিক অফিসারের সঙ্গে লায়লার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার আগেই, এবং ও কয়েকদিনের জন্যে একটু দূরে গিয়েছিল। মদ্যপ অফিসাররা একের পর এক এসেছিল – আর প্রচুর মদ গিলে ওর উপর অত্যাচার করেছিল। লায়লার কোন বাধা বিপত্তিই ওরা শোনে নাই। ঐ জিয়াস খাঁকে বাধা দিলে জিয়াস লায়লাকে রিভলভার দেখিয়েছিল। তারপর হতে একাদিক্রমে ও নির্যাতিতা।

তাই এখন আর একবার নিজের অনাবরণ দেহতনুটা দেখে নিয়ে ও ভাবতে বসল সত্যিই সে কি অন্তঃসত্ত্বা? যদি সে অন্তঃসত্ত্বাই হয় তবে তার পেটের সেই অজ্ঞাত সন্তানের পিতা কে? জব্বর –? না জিয়াস খাঁ –? না সেই বালুচ কর্ণেলটা –? না – মোসের মত গতরওয়ালা – আর একটা অফিসার –? এদের মধ্যে কোনটা – কোনটা তার সন্তানের পিতা? লায়লা আবার হিসেব করতে লাগল। কিন্তু তার হিসেব বারংবার ভুল হয়ে যাচ্ছিল। একবার মনে হচ্ছিল জব্বর, আবার মনে হ'ল, না – জব্বর ছিল না, ছিল জিয়াস; আবার মনে হ'ল, না-না – সেই বালুচ কর্ণেলটা হবে বোধ হয়। না-না, তা তো নয়, সেদিন সেই মোসের মতন পাঠান অফিসারটা এসেছিল বোধ হয়। এই ভাবে লায়লা বারংবার খতিয়ে খতিয়ে দেখতে লাগল, এদের মধ্যে সত্যিকারের কোন অফিসারটা সেদিন এসেছিল?

লায়লা আবার ভাবতে লাগল – যদি সেদিনই সে গর্ভবতী না হয় – তার পরের দিন হয়? তবে সেদিন কে কে এসেছিল? এমন তো হয়েছে – যে একই দিনে ওরা পরপর সবাই এসেছিল। তবে –? তার অজ্ঞাত সন্তানের পিতা কোনটা?

তবে ওর ছেলেটা কেমন হবে –? পাঠান বীরের মত –? না – জিয়াসের মত –? না সেই বালুচ কর্ণেলটার মত –? না জব্বরের মত –? কেমন – ; কেমন ধারা হবে –?

কেমন – কেমন দেখতে হবে ওর ছেলে? ও তখন একবার খুঁটিয়ে ভেবে দেখে – ওদের ঐ চারজনার ভেতর কিছু সাদৃশ্য আছে কিনা? আচ্ছা এমনওতো হতে পারে, পাঠানের মত তেজ; বালুচের মত চেহারা, জব্বরের মত কাপুরুষতা – আর জিয়াসের মত ধড়িবাজ! তাই যদি হয় তবে ঐ ছেলে দেখতে কেমন হবে? ছিঃ! ও-সব আর ভাবা যায় না! যা হয় হোক গে – । একটা ছেলের যদি চার চারটে বাবা হয়, তবে সে ছেলে আর যা-ই হোক না কেন অন্ততঃ সুপুরুষ এবং বুদ্ধিমান হবে না – । আবার এমনও তো হতে পারে – একটা কদাকার চেহারার ছোঁড়া? তবে –? আর যদি মেয়ে হয়- –? সে মেয়ে দেখতে কেমন হবে –? মেয়েরা সাধারণতঃ মায়ের মতই হয়। তবে সে মেয়ে কি আমার মতই হবে-? হয়ত হবে! দূর ছাই! এই সব ভাবতে ভাবতে মাথাটা একদম গরমহয়ে উঠবে দেখছি। না-! আর ঐ সব হাবর হাটী ভাবব না – কাপড় পড়ি, এই বলে লায়লা বেশবাস ঠিক করতে লাগল এবং ঐ চিন্তা ভোলার জন্যে – গুণ গুণ করে গান ধরল। একবার ভাবল সেক্সোলজির বইটা থাকলে এর হদিস পেতাম।

কিন্ত মানুষ ভুলবে বললেই তো আর ভোলা যায় না! মন তো আর থাসা কাদা নয়, যে তাকে টিপে টুপে যা খুশী তাই বানাবে – আবার পছন্দ না হলে তা ভেঙ্গে চুরে নতুন কিছু একটা গড়বে! তাই লায়লার অজ্ঞাতেই তার চোখের সামনেই যেন একটা অজ্ঞাত শিশু গোটা ঘর ময় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগল। সেই অদৃশ্য শিশুর আধো আধো কথা – অপ্রয়োজনীয় হাসি হাসা, ঘরের মেঝেময় লাল ফেলা, দাপাদাপি করা তাকে যেন উত্যক্ত করে তুলল। সে চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিয়ে দেখতে লাগল, খুজতে লাগল সেই অদৃশ্য শিশুকে। কিন্তু শিশুটা এত চালাক যে, লায়লা চোখ খুললেই সে পিছনে লুকিয়ে পড়ে। তাই লায়লা শত চেষ্টা করেও ঐ শিশুকে আর ধরতে পারল না। অথচ তার কলনাদ, দৌরাত্ম

তাকে যেন পাগল করে তুলতে লাগল। শেষকালে সে অসহ্য বোধ করায় আকণ্ঠ মদ্যপান করে খাটের উপর শুয়ে পড়ল এবং বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওর যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন রাত অনেক। ঘরের মধ্যে হঠাৎ গুলির আওয়াজ-দ্রাম্-দ্রাম্-দ্রাম্ – । মদের ঘোরে ঘোরে লায়লা চোখ খুলে দেখল, সেই বালুচ কর্ণেলটা তার পাশে শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে আর তার তাজা রক্ত ফিচ্ দিয়ে বেরিয়ে এসে লায়লার সমস্ত শরীর এবং বিছানা ভিজিয়ে দিচ্ছে। আর –? আর জিয়াস মেঝেয় নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে লায়লাকে আর সেই কর্ণেলটাকে দেখছে, মানুষ মরবার আগে কি করে আর না করে।

লায়লা জিয়াসের দিকে অর্ধনমিত নেত্রে তাকিয়ে তাকে বললে, জিয়াস! তুমি ওখানে কেন। তুমি দূরে কেন? আমার পাশে এটা কে? কেন এখানে এসেছ? ওকে কে ঢুকতে দিলে এখানে? তুমি মানুষ না পশু? তুমি যাকে ভালবাস তার পাহাড়ার, তার নিরাপত্তার, কি ব্যবস্থা করেছ? ঐ পশুটা আমার ঘরে ঢুকেছে কি করে? ও আমার বিছানায় শুয়ে কেন? লায়লা তখন আলুথালু বিবস্ত্রা বেশবাসে কোন রকমে উঠতে গিয়ে আবার টলে পড়ল। সে জড়িত কাতর কণ্ঠে বলল – জিয়াস আমায় তোল, আমি উঠতে পারছি না, আমাকে কে ধরে রয়েছে – ওকে সরিয়ে দাও।

বার

তখনও মুক্তিযুদ্ধটা যেন কচি শিশু, গা থেকে আঁতুড়ে গন্ধ বেরুচ্ছে ভগ্‌ ভগ্‌ করে। গন্ধটা উঠে যেতো ষষ্টি পূজোর পর, কিন্তু ওঠে নাই তেল জল আর হলুদ বাঁটা মাখানোর অভাবে। সর্বহারা ভিখারিণী মায়ের সন্তান, পথে-প্রান্তরে প্রসব হয়েছে, সেই সন্তানকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় মায়ের স্তনের দুধ, কিন্তু তাও সীমিত – কারণ মাও অর্দ্ধমৃতা, অনাহারক্লিষ্টা, অত্যাচারিতা – অত্যাচার হতে বাঁচার জন্য বনবাসিনী।

বিপ্লব লায়লাকে কথা দিয়েছিল, ‘যে সামরিক অফিসারটা লুৎফা আর কাকলির উপর অত্যাচার করেছে তাকে ধরে এনে লায়লার কাছে হাজির করবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কিন্তু এ বিশ্ব সংসারে মানুষ যা ভাবে, যা চায়, তাই-ই যদি পায় তা হলে তো ভাবনার আর কিছুই ছিল না। আর ঐ চাওয়া পাওয়ার সামগ্রীটির জন্যে যদি স্বেচ্ছায় সুখশান্তি, ঐশ্বর্য্য আরাম বিরাম সবকিছু বিকিয়ে দিয়ে ত্যাগ এবং দেশ-সেবার কঠিন ব্রতে ব্রতী হয়, মাথায় তুলে নয় সীমাহীন বিড়ম্বনার বোঝা-তা হলেই যে সে চাওয়া পাওয়ার সামগ্রীটি পাবে এমন নিয়ম তো নাই এ সংসারে। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষ বঞ্চিত, রিক্ত, নির্যাতিত, বিড়ম্বিত।

লায়লা বিপ্লবের প্রণয়িনী, ভাবী ভার্য্যা। প্রাণ হতেও প্রিয়তর বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সেই বিপ্লবই যখন সবকিছু ত্যাগ করে দেশ মুক্তির ব্রত মাথায় তুলে নিয়েছে – বিষাক্ত কীট সেই পাক বর্ব্বর অত্যাচারীকে ধরে এনে লায়লার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে; যার জন্যেই তার নিষ্ঠার, কর্মের নাই এক বিন্দুও ত্রুটি – তবু সে পারছে কই সেই অফিসারটাকে ধরে আনতে লায়লার কাছে? যদিও অনেক দিন হয়ে গেল লায়লা বিপ্লবের সশস্ত্র দল হতে বিচ্ছিন্ন – এবং অন্তর্হিতা, তবু বিপ্লবের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় যত্নের ত্রুটি নাই এক বিন্দুও। কিন্তু মানুষের হৃদয় – প্রেম, ভালবাসা আর নিষ্ঠা দিয়ে যদি বিচার করা হ’ত এবং তাই দিয়ে এ সংসারে তাই অবস্থা নিরূপিত হ’ত তা হলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ বদলে যেতো। তাই এখানে তা হয় নাই – এখানে ছলে, বলে, কৌশলে, অর্থে, সামর্থে – যে যত শক্তিশালী হতে পেরেছে – ইতিহাস তাকেই সুসন্তান বলে কোলে স্থান দিয়েছে। হৃদয়বানদের স্থান, সংসারজ্ঞানহীন অপরিণামদর্শী আধ্যাত্মিক মানুষের দলে – ইতিহাসের পাতায় হয়ত নয়।

তাই যেন পূর্ব্ববঙ্গের হৃদয়বান যুব সমাজের ও মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে – আসুরিক শক্তিসম্পন্ন বর্বর অত্যাচারী পাকফৌজের অধিনায়কদের নামই স্মরণীয়, হয়তো ওদের নামই লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়। এ সংসারে যারা নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্যে আত্মদান করে – তারাই হয় বোকা আর অপদার্থ – এ যেন এক অনিবার্য্য নিয়ম। কিন্তু নিয়মেরও তো ব্যতিক্রম ঘটে!

পূর্ব্ববঙ্গের সার্ব্বজনীন বিপ্লব এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ঐ বিপ্লবের বারবাবহ্নিতে হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবণিতা আত্মাহুতি দিয়েছে, দিচ্ছে আরও দেবে। ওদের প্রতিজ্ঞা, ‘হয় মরব, নয়ত – বাঁচার মতই বাঁচব।’ যারা সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এ দেশের হাড়মাস রক্ত সব চুসে চুসে খেয়েছে তাদের অত্যাচার আর শোষণ থেকে মুক্তি চাই-ই – চাই – ।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের অতর্কিত গেরিলা আক্রমণে পাকিস্থানী ফৌজের যেন একটু মাত্র নুন ছাল উঠে গেছে। ওরা ঐ জ্বলুনি থামানোর জন্য ডেটল ও টিনক্‌চার আইওডিন ইত্যাদি ওষুধ-পত্রের বিধি বন্দোবস্তও করেছে। সুতরাং ভাববার আর তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু বলা তো যায় না! সামান্য নখের আঁচড়েও অনেক সময় বিষ হয়, আবার বিষ হয়ে গা মাথা ঘুরতে ঘুরতে মানুষ মরেও যায়। সুতরাং অতি ছোট, অতি নগণ্য যা – তাকেও মানুষ ভয় পায়, আর ভয় পায় বলেই প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করে। তাই গোটা পূর্ব্ববঙ্গে বিশাল পাক সামরিক শক্তির কাছে নগণ্য

নখদন্তহীন মুক্তিসংগ্রামী শিশু শুধু মাত্র অবহেলিতই নয় – হাস্যজনকও বটে। তাই ঐ অবাঙ্গালী পাকফৌজরা বড় বেপরোয়া, সাংঘাতিক, নির্মম, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, আর হৃদয়হীন। যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

মানুষ যে কত বড় বেয়াদপ, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হতে পারে – তার প্রথম এবং শেষ উদাহরণই বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গের অত্যাচারের নায়ক – পাক সামরিক জুণ্টা।

বিপ্লব ও নুরুল বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে – বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে যেন নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছিল। এখন ওদের দরকার নির্ভরশীল জনসমর্থন এবং সহযোগিতা। কিন্তু তার দুর্ভেদ্য অন্তরায় সৃষ্টি করেছে ইয়াহিয়া সরকার। পূর্ব্ববঙ্গের গোটা দেশটা জুড়েই ওরা ক্রীড়নক প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছে, তারা আলবদর ও রাজাকার এবং অন্যান্য নামে আত্মগোপন করে রয়েছে মুক্তিকামী জনসাধারণের মধ্যেই। সুতরাং ঐ স্বার্থান্বেষী দেশোদ্রোহীদের খুঁজে খুঁজে বার করা অত সহজ কাজ নয়।

তাই বিভিন্ন গেরিলা আক্রমণের সময় মুক্তিফৌজের দল বারংবার অপ্রত্যাশিত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে ও হচ্ছে। ওদের পেছনে যেন শনি গৃহদেবতার অদৃশ্য হাত রয়েছে। কিন্তু এর প্রতিকার কি?

প্রতিকার –! এই মুক্তিযুদ্ধের যারা শরিক, যারা অঙ্গ, তাদের মধ্যেই যদি কেউ কেউ অতি সংগোপনে অলক্ষনীয় ও অবোধ্য কর্কট রোগের মত হৃদয়ের এক প্রান্তে আক্রমণ করে, তাহলে সেই রোগী এবং ডাক্তার করবেই বা কি, আর করবার আছেই বা কি? যে রোগ ধরবারই কোন উপায় নাই-সে রোগের ওষুধই বা কি? ও রোগের ওষুধ দিতে হলে চাই এমন প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্র, যার আড়ালে এ-বিশ্বসংসারের কোন কিছুই লুকোনো যায় না, এবং প্রতিটি অনুপরমাণুর প্রতিচ্ছবি ওতে প্রস্ফুটিত হয়।

পূর্ব্ববাংলার মুক্তিফৌজরা বেশ বুঝতে পেরেছিল, তাদের সংগ্রাম জোরদার করতে হলে চাই সংগঠন – আধুনিক উন্নত ধরণের অস্ত্র শস্ত্র এবং আরও অনেক স্বেচ্ছাসেবী। আর একটা জিনিষ ওদের সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল, সেটি হ'ল – অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপে লিপ্ত ছদ্মবেশী দেশদ্রোহীদের মুক্তিফৌজ হতে একদম ছাঁটাই করা। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় চারিধারে মৃত্যু ফাঁদ ও মরণের বিভীষিকার মাঝখানে – মাতৃপিতৃহীন অনাথ ছোট্ট শিশুর মতই অসহায় মুক্তি ফৌজের পক্ষে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ – দূরদর্শিতা-বহুল কাজে হস্তক্ষেপ করা সহজসাধ্য ছিল না। এতে হয়ত ঠাকুর গড়তে গিয়ে কুকুর গড়ার সম্ভাবনাই অনেক বেশি। হয়ত রাজাকার বা আর আর দেশদ্রোহীদের ছাঁটাই করতে গিয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিককেই ছাঁটাই করা হয়ে যেতে পারে। যার ফলে শুভ'র বদলে অশুভের সম্ভাবনাই বেশী। প্রকৃত কর্মী না থাকলে কাজ হবে কেমন করে? দ্বিতীয়তঃ সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক বাদ পড়লে আর থাকবে কি – আর হবেই বা কি? তাই তো এ-পৃথিবীতে যেখানেই হোক এবং যেমনই হোক না কেন, মুক্তিসংগ্রাম সফল করতে রক্ত ও প্রাণক্ষয় হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক-অনেক বেশি। আজ পর্য্যন্ত এ সংসারে এমন একটা নজির পাওয়া যায় নাই যেখানে যে কোন শুভকর্ম্ম ঘটেছে বিনা বাধায় ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাই যাঁরা বিশ্ববরেণ্য মায়ের ছেলে, তাঁদেরই প্রাণ হয়েছে পর্য্যুদস্ত ও নিপীড়িত। যাদের স্বার্থে সে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ কাজ করে, প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে বা নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব কিছু অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে সর্বহারা হয় – সেই ব্যক্তিই হয়ে ওঠে তাদের কাছে হাস্যাস্পদ ও পাগল। তাই গোটা পূর্ববাংলায় প্রকৃত মুক্তিফৌজরা একধারে পাচ্ছে আধুনিক ও উন্নত রণসম্ভারের আঘাত – অপর ধারে নিজের দলের লোকদের কাছেই অট্টহাস্য ও বিদ্রূপ, বেইমানী ও মতান্তরের হতাশা। কিন্তু মা, ভগ্নীর উপর পাশবিক অত্যাচারের বিভীষিকা মানতে চায়না কোন বাধার প্রাচীর। যার চোখে সর্বহারার আগুন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে – সে মানবে কেন যুক্তিতর্কের বাধা বিপত্তি? সে চায় মুক্তি – সীমাহীন মুক্তি। যেখানে থাকবে না কোন সংকীর্ণতা, মানসিক আবিলতা। থাকবে কেবল অটল প্রতিজ্ঞা আর নির্ভীক পদক্ষেপ।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে পর্য্যুদস্ত মুক্তিফৌজ যেন নাজেহাল হয়ে উঠেছিল। বেশ কিছু মুক্তিফৌজ দেশমাতৃকার চরণ সেবায় আত্মোৎসর্গ করেও এবং বিপুল সংখ্যক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও যেন তেমন একটা কিছু করে উঠতে পারছিল না। তার কারণ – ওদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নাই, তেমন কিছু প্রশিক্ষণ নাই, নাই সংগঠন, নাই – রণকৌশল। যা আছে – তা একমাত্র আন্তরিকতা ও জীবন মরণ প্রতিজ্ঞা।

ওদের ঐ মূলধনটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ চোখের সামনে মা-ভগ্নীর উপর পাশবিক অত্যাচার ও পিতা-পুত্রের উপর উৎপীড়নের নৃশংস ধ্বংসলীলা দেখে যে কোন মানুষই ঐ রাস্তা ধরতে বাধ্য হয়। কিন্তু যুদ্ধ এক জিনিষ, আর হৃদয় আর এক জিনিষ। দুয়ের ব্যবধান প্রচুর। তাছাড়া একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক বিসদৃশ। হৃদয়বানেরা যেমন যুদ্ধ করতে পারে না, তেমনি যোদ্ধাদেরও হৃদয় থাকলে জয়লাভ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না – বিশেষ করে বর্ত্তমানে যুদ্ধ'র নামে প্রচণ্ড আসুরিক বর্বরতা যেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই সহায়-সম্বলহীন মুক্তিফৌজের দল পর্য্যুদস্ত। ওরা এখন খুঁজছে – মানবতা বোধকামী দেশ ও দশের সহায়তা।

নুরুল আর বিপ্লব বিভিন্ন রণাঙ্গনে বেশ কিছু পাকিস্থানী ফৌজ খতম করলেও বিপক্ষের শক্তি এবং প্রাধান্য দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ওরা ভাবত এভাবে আমাদের জয় সম্ভবপর নয়। এখন সর্বাগ্রে দরকার আধুনিক ও উন্নত ধরণের রণসম্ভার। কিন্তু তা দেবে কে? যে বিশ্বে মানুষ মানুষকে ভালবাসে না, নিছক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর মানুষকে চিরদাসত্বে শৃঙ্খলিত করে রাখতে চায়; সেখানে, সেই কলঙ্কিত বিশ্বে তারা সাহায্য পাবে এমন দেশ কোথায়? কারা সেই মহামানব, যাঁরা সুদর্শনচক্র হাতে নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষমতার উত্তরাধিকারী ভগবানপুত্র হয়েও বসে আছে দুনিয়ার বুকে খবরদারী চালাবার লোভ সম্বরণ করে – এই সাড়ে সাতকোটী মরণোন্মুখ মানুষকে বীভৎসতা থেকে রক্ষা করতে? এর হদিস পাওয়া খুবই মুস্কিল। কারণ, যাদের হৃদয় আছে তারাও হৃদয়হীন হতে বাধ্য হচ্ছে, তা নাহলে বিশ্বের দরবারে তারা অপাংক্তেয় হয়ে যাবে, তাদের উপর ক্ষুরধার খড়্গ নেমে আসবে। তখন তাদের বাঁচাবে কে?

এ বিশ্ব বড় বিচিত্র। যে দেশের মানুষ দুনিয়াকে জানাতে চায় তারাই প্রকৃত মানুষ, তারাই মানুষকে ভালবাসে – মানুষের জন্যে সব কিছু আত্মোৎসর্গ করেছে আর করবে, তারাই গোপনে এই দুনিয়ার বৃহত্তর শক্তিবর্গের পদলেহন করে ন্যায় অন্যায় ভুলে যায় – লোকের চোখে ধাঁধাঁ লাগাতে চায় – সাড়ে সাত কোটি নির্য্যাতিত মানুষের মাথায় অবলীলাক্রমে নিজের ভারী বুটওয়ালা পা-টা চাপাতে চায়। তাই নুরুল আর বিপ্লব বড় বিভ্রান্ত।

ওরা দু'জনায় কোন এক শত্রু ঘাঁটিতে গেরিলা আক্রমণ করতে গিয়ে কৃতকার্য্য হয় নাই। যদিও বেশ কিছু সংখ্যক শত্রুসৈন্য ওরা মারতে পেরেছিল – কিন্তু ঐ যুদ্ধে নুরুল এবং বিপ্লব উভয়েই আহত হয়েছিল। নুরুল সামান্য আহত হলেও বিপ্লবের অবস্থা তত ভাল ছিল না। বিপ্লবের ডান হাতে গুলি লেগেছিল। তাই নুরুল সাত পাঁচ ভেবে স্থির করেছিল ভারতীয় সীমানার কাছাকাছি পৌঁছে বিপ্লবকে ওদেশে পাঠাতে হবে চিকিৎসার জন্যে। বিপ্লব সুস্থ হয়ে ফিরে আসবার সময় ওদেশ থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এদেশে নিয়ে আসবে।

তাই ওরা রাতের অন্ধকারে পথ চলত তাদের লক্ষ্যণীয় স্থানে পৌঁছুবার জন্যে – আর নতুন উদ্যমে সংগ্রামে নামার উদ্যোগের আশায়। পথ চলতে চলতে ওরা দু'দিন পরে একটি প্রায় জনশূন্য গ্রামে রাত কাটাতে মনস্থ করল। সেদিন সেই রাতের বাস্তব বিভীষিকা ওদের আরও মর্ম্মাহত করে তুলল। ওরা ব্যাথা বেদনা, মান অপমান, জয় পরাজয় সব কিছু ভুলে গিয়ে হতবাক হয়ে পড়ল; নিজেদের আবার নতুন সাজে সাজাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

সেই ধ্বংসাবশেষ গ্রামটার যেখানে সেখানে কেবল মৃতদেহ – আর মৃতদেহ। রক্তের প্লাবন ধূলিকীর্ণ রাস্তায়, বাড়ীতে, বাইরে, মাঠে, ঘাটে সব জায়গায়। কেবল রক্ত আর রক্ত – মৃতদেহ আর মৃতদেহ। আরও দেখল তারই মধ্যে একটি রক্তক্ষরা মৃতা যুবতীর বুকে নধরকান্তি শিশুর স্তন্যপান করতে গিয়ে ক্রন্দন।

তের

লায়লা যেন অর্দ্ধোন্মাদ হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে ও সেই প্রাসাদ হতে ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে চায় – কথাবার্ত্তাগুলোও যেন অসংলগ্ন। কিন্তু ওটা ক্যান্টনমেণ্টের আওতায়। বেরুব বললেই তো আর বেরোন যায় না – । ঐ বাড়ীটি আপাততঃ কঠিন প্রহরাধীনে রাখা হয়েছে। মানুষ যেমনি একবার যমালয়ে পৌঁছুলে তখন চিত্রগুপ্তের খাতাখানা হতে হিসেবের খাতিয়ান নিতেই হবে – আর সেই খতিয়ানের হিসাবমত দেনা পাওয়া তাকে মিটিয়ে দিতেই হবে; তেমনিই, ঠিক তেমনিধারাই পাকফৌজের আওতায় একবার গেলে – আর ফেরা যায় না। যদি কেউ কদাচিৎ ফিরে আসে তবে তাকে তার জীবনের সবকিছু বিকিয়ে দিয়ে শূন্য কায়াটা নিয়েই ফিরতে হবে। যদিও তা অত্যন্ত অসম্ভব – যেহেতু সে সুন্দরী যুবতী।

চোখের সামনে পর পর কয়েকটা হত্যাকাণ্ড দেখে লায়লাও যেন কেমন হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। ও পরিস্কার বুঝেও নিয়েছিল, বিপ্লবের সঙ্গে তার মিলনের আশা আর একবিন্দুও নাই। ও ভেবেছিল বোড়ের চালে কিস্তিমাত করবে এবং সমস্ত শক্তিগুলো অক্ষয় রেখে অপ্রতিহত ক্ষমতায় নিজের গণ্ডিতে ফিরে আসবে। প্রতিশোধের একটা প্রচণ্ড নেশায় যে মেয়ে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল এবং হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে একজন দুশ্চরিত্র দেশোদ্রোহীর প্রণয়িণী সেজে ক্যান্টনমেণ্টে অবাধে প্রবেশ করেছিল, তার কি ভাবা উচিৎ ছিল না – সে একটা সুন্দরী যুবতী? প্রতিশোধ হয়তো নেওয়া যাবে, কিন্তু তার পর –? তাই এখন লায়লা ভাবে। এরপর –?

এখন ও অনেক কিছুই ভাবে। ভাবনার কি আর শেষ আছে? কত কথা –! শেষ তো নাই, কিন্তু শেষ না করলেও তো চলবে না। হয় শেষ করতে হবে, নয়তো –

সেদিন সন্ধ্যায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে জিয়াস খাঁ, শিষ দিয়ে গান করতে করতে ওর ঘরে এসে হাজির। ওর স্বতস্ফূর্ত্ত ভাব দেখে লায়লা ওকে সাদরে অভ্যর্থনা করে সোহাগের সুরে বলল, 'ডার্লিং জিয়াস – মাই জিয়াস –! বিলাভেড্ জিয়াস!' বলতো – আজ হঠাৎ তুমি এত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলে কেমন করে? আর আমি এখন একটা প্রিজনড্, ডার্টি লাইফ বেয়ার করছি। সত্যি করে বলতো জিয়াস – এইটাই কি তোমার উপহার –?

জিয়াস ভ্রূ কুঁচকে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে লম্বা লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল – 'সার্টেনলি নট্! ইউ আর মাই ব্রিথড্ ওয়াইফ্', আমি তোমার মর্য্যাদা রাখবই রাখব। এমন কোন শক্তি নাই যে তা থেকে আমায় বিচ্যুত করতে পারে।

লায়লা বলল, তুমি বড় সুন্দর বাংলা বলতে পার দেখছি। এত ভাল বাংলা বলতে তুমি কি করে শিখলে?

হ্যাঁ শিখেছি – অনেক কষ্টে শিখেছি।

লায়লা আদর করে তাকে বহুমূল্য সোফায় বসিয়ে তার অনিন্দিত দেহতনুটা তার কোলের উপর এলিয়ে দিয়ে বলল – জিয়াস! এতদিন তোমায় আমার নিজস্ব কথা কিছু বলি নাই বললেই হয়। আমার যা কিছু আছে তা' তো তোমায় সবই উজাড় করে দিয়েছি। কিন্তু আমি জানিনা তুমি এতে কতটা সুখী হতে পেরেছ।

লায়লার এই কথায় জিয়াস খাঁ সস্নেহে বলল, না- না –! ও কথাটা আবার তুলছ কেন? সত্যি কথা বলতে কি তোমার মত একটা 'কাল্‌চারড্ 'ইউথ বিউটিফুল গার্ল' পেয়ে আমার লাইফ ধন্য হয়ে গেছে। আর এর জন্যেই আমি বাংলাও শিখেছি।

লায়লা বলল, তা হয়ত হবে। কিন্তু আমি তো শুনেছি তোমরা বাঙালী জাতটাকেই বড্ড ঘৃণা কর। এও নাকি তোমাদের পরিকল্পনা – এই জাতিটার একটা বৃহৎ অংশ মেরে শেষ করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জনতার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে – যাতে ভবিষ্যতে এখানকার জনতা অগ্রাধিকার না পেতে পারে। এটা কি সত্যি কথা?

লায়লার এই প্রশ্নে জিয়াস খাঁর সুপ্রশস্ত ললাটের রেখাগুলো ক্ষণিকের জন্যে বেন কুঞ্চিত হয়ে আবার সহজ হয়ে উঠল। সে বলল – কিন্তু তুমি এসব কথা জানতে চাইছ কেন? আমাদের ইন্টারন্যাল ব্যাপারের কোন কিছু খবর তো তোমার জানবার কথা নয়, উচিতও নয়। তাছাড়া আমি একটা দায়িত্বশীল সামরিক বিভাগের অধিকর্ত্তা। আমি কেমন করে তোমায় সেই সব 'টপ্ সিক্রেট্' কথা বলি বল তো!

জিয়াসের এই কথায় লায়লা তার কোল হতে মাথা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসল এবং বলল, কি বল্লে –? এই সব সিক্রেট কথা আমায় বলা যায় না? তা যাবে কেন? এখন দেখছি – তুমি এত বড় একটা অফিসার, কিন্তু আসলে তুমি একটা আকাট মুখ্যু। মানে – 'মোস্ট ইডিয়ট্'!

লায়লার এই কথায় জিয়াস খাঁট কান দুটো যেন লাল হয়ে উঠল। সে প্রচণ্ড রাগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। একবার ভাবল, এখনই দুটো গুলি ছুঁড়ে লায়লার কণ্ঠ চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেয়। এই ভেবে সে নিজের পকেটের রিভলভারে হাতও দিল এবং ওর দিকে কট্ মট্ করে চেয়ে বলল, শাট্ আপ!

লায়লা তখন হেসে মেঝেয় লুটিয়ে পরার উপক্রম। সে হাসি থামিয়ে বলল, দেখেছ আমার ক্যালকুলেশন কত সত্যি? তোমায় যে আমি ইডিয়ট্ বলেছি – তা সম্পূর্ণ সত্যি, তা তুমি তোমার রিভলভারে হাত দিয়েই প্রমাণ করে দিলে।

'হোয়াট্' – ?

আচ্ছা জিয়াস – তুমি এমন ধারা রক্তচক্ষু নিয়ে তোমার রিভলভারে হাত যে লাগালে – তুমি নিজে হাতে আমায় গুলি করে মারতে পারবে?

নিশ্চয় পারি –

লায়লা ভ্রু কুঁচকে বলল, পার –?

'ইয়েস'; আমার সরকারের স্বার্থের জন্য আমি সব কিছু পারি – ।

লায়লা তখন জিয়াস খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বুকের কাপড় সরিয়ে বুক পেতে দিয়ে বলল – নাও! চালাও গুলি –! দেখি তোমার কত ক্ষমতা – চালাও তো আমার এই বুকে গুলি?

লায়লার এই ব্যবহারে জিয়াস খাঁ আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে মাথা নামিয়ে নিল এবং গালে হাত দিয়ে চিন্তিতভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসল। সে যেন মুহ্যমান, নির্ব্বাক ও নির্বিকার হয়ে পড়ল।

কিয়ৎক্ষণ পরে লায়লাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জিয়াসের পায়ের কাছে মেঝেয় বসে পরে সজল নেত্রে ওর হাঁটুর উপর মাথা রেখে অশ্রু সম্বরণ করার চেষ্টা করতে লাগল। উভয়ে নীরব এবং নিস্পন্দ! ঝটিকার পূর্বাভাস অথবা প্রচণ্ড কালবৈশাখীর পর শান্ত সমাহিত পরিবেশ যেন।

লায়লাই প্রথমে মুখ খুলল। বলল জান জিয়াস, আজ তোমায় কথা বলতেই হবে। আজ তুমি কথা না বললে আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না। তার কারণ, আমি জানি – তুমি আমার! তোমার উপর আমার পূর্ণ অধিকার আছে। তোমার

ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় বিচার আচার সবকিছুই আমায় খতিয়ে খতিয়ে দেখতেই হবে। আর আমার এই দেখবার অধিকার তুমিই আমায় দিয়েছ। অবশ্য এর আগে তোমায় আমি নিশ্চিন্ত করে দিচ্ছি, তোমার ভাবনার কিছু নাই। তার কারণ আমি এই ক্যান্টনমেন্টে এখন বন্দিনী। বন্দিনীই থাকতে চাই – এখান থেকে আমি আর কোথাও যেতে চাই না – তাছাড়া গেলে কোন লাভও হবে না। যেহেতু আমার জীবনটা তুমি উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছ – তার মানে, 'ইউ রব্ড্ মি', তাছাড়া তোমার মত এতবড় একজন অফিসারের সঙ্গে আমার সাদি হলে আমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলেই মনে করব।

জিয়াস খাঁ সামরিক অফিসার – সে লায়লার প্রতিটি কথাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুধাবন করছিল। সে লায়লার কথার মাঝখানেই বলল, তার মানে? তোমার 'লাইফটা' আমিই কেবল বরবাদ করেছি – আর কেউই করে নাই?

লায়লা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, নাঃ –!

জব্বর –?

না! সে বহু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাকে আমি কোনদিন আমার বিছানায় উঠতেও দিই নাই। তার সঙ্গে আমার কথা ছিল আমাদের সাদি না হওয়া পর্য্যন্ত সে আমায় বোনের মর্য্যাদা দেবে। তাই তার সঙ্গে আমি এখানে এসেছিলাম, এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সে তার প্রতিজ্ঞা রেখেছিল।

কিন্তু আমি তো শুনেছি, তুমি আরও তিন চারটে মর্দানার সঙ্গে মেলামেশা করেছ।

তুমি ঠিকই শুনেছ! আমার কাছে কয়েকটা সামরিক অফিসার আসা যাওয়া করত। কিন্তু আমি তাদের কাউকেই আমল দিই নাই। একমাত্র তোমাকেই কেবল আমি ভাল বেসেছি। এছাড়া –

সেই বালুচ কর্ণেলটা –?

সে কি করেছে না করেছে – তা তুমিই জান। কারণ, আমার মানসিক অশান্তির জন্যে সেদিন আমি এত মদ খেয়েছিলাম যে আমার কোন জ্ঞানগম্যিই ছিল না। আমার সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যদি কেউ আমার উপর টর্চার করে থাকে তা হলে তার জন্যে দায়ী আমি নই – দায়ী তুমি। কারণ, তুমি যখন আমায় ভাল বেসেছ, তখন আমার নিরাপত্তার দায়িত্বও তোমার।

লায়লার কোন কথারই জবাব দিতে পারছিল না জিয়াস খাঁ! সে স্থানুর মত চুপ করে বসে রইল।

লায়লা বলল, জিয়াস! আমি তোমায় ভালবাসি। এর বেশী আর কিছু বলবার আমার কোন ক্ষমতাই নাই জিয়াস! তবে এইটুকু জানি – এ পৃথিবী বড় সুন্দর। এখানে আছে ফুল, ফল, আলো, বাতাস, স্বর্গ আর আনন্দ। এখানে ফোটা ফুলে ভ্রমর বসে, গুন গুন করে গান গায় আর মধু খায়। ভ্রমর যেমন ফুল না পেলে বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনি ফুলের মধু ভ্রমরে না খেলে তার জীবনও ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই রকম মানুষ মানুষকে ভাল না বাসলে সে জীবনেরও কোন দাম থাকে না, জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় – মরুভূমি হয়ে যায়।

লায়লা এই কথাগুলো বলে যেন দম নেবার চেষ্টা করতে লাগল। ও আরও কিছু বলার চেষ্টা করতেই জিয়াস খাঁ তাকে জড়িয়ে ধরে বলল –

'প্লিজ এক্সিউজ মি! আই হ্যাভ কমিটেড্ এ ন্যুইসেন্স প্লিজ!' তুমি আমায় ক্ষমা কর লায়লা।

জিয়াসের এই আবেগপ্রবণ আচরণে লায়লা বলল – থাক, তুমি অমনভাবে ব্যাকুল হয়ো না। আমি তোমায় জানি বলেই তোমায় ভাল বেসেছি। আর এও জানি, তোমরা সামরিক বিভাগের লোক – তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সবই সামরিক ধাঁচে তৈরী। তার মানে কঠিন কিছু দিয়ে নরম পেলব জিনিষ তৈরী হয় না, তা করতে গেলে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। এ পৃথিবী শুধু গোলাগুলি বোমা মাইন আর ট্যাঙ্কে ভর্ত্তি নয় – এখানে আরও অনেক কিছু আছে। এখানে আছে প্রেম, ভাসবাসা, প্রীতি – আর কি জান? আরও আছে সুখ আর স্বপ্ন।

লায়লার এই কথায় জিয়াস খাঁ তাকে ছেড়ে দিয়ে, কয়েক পা সরে এসে দাঁড়িয়ে তাকে আপাদ মস্তক কয়েকবার দেখে নিয়ে আবার কাছে এগিয়ে এসে সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আর্ত্তকণ্ঠে বলল – তুমি আমায় ক্ষমা কর লায়লা! আমি নির্বোধ! 'ইল্লিটারেট্ ব্রুট্! সত্যি লায়লা, তুমি বিশ্বাস কর, আমার মত একটা নরাধম পশুর কত যে সৌভাগ্য – তাইতো তোমায় পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি – আমার জন্ম বন্দুক আর তলোয়ারের উপর। তবু আমি তোমার কাছে শিখব – অনেক কিছু শিখব। আমি ফিলজফি শিখব, গান শিখব, ভালবাসতে শিখব।

জিয়াসের এই কাতর প্রার্থনায় লায়লা তাকে সস্নেহে বুকে তুলে নিয়ে বলল, তুমি আমার জীবন – তোমার কোন অনুতাপই আমি সহ্য করতে পারব না। তা যদি হয়, তাহলে আমার মরণও ভাল। প্রিয়জনের দুঃখ ও অনুতাপ সহ্য করা বড় শক্ত – জান জিয়াস!

জিয়াস খাঁ অবোধ শিশুর মতই লায়লার বুকে মাথা রেখে বলেছিল, 'প্লিজ গাইড মি! প্লিজ গাইড মি!' তুমি আমায় যেমন চালাবে আমি তেমনই চলব।

লায়লা সহাস্যে বলেছিল, তাই হবে। প্রিয়জনকে যদি কিছু না কিছু ভাবতে আর করতে না শেখালাম – তবে জীবনের সার্থকতা আর থাকল কি?

লায়লার কথায় জিয়াস খাঁ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। সে ভাবাতিসয্যে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি! এক্সট্রাঅর্ডিনারি!' সত্যই লায়লা, তুমি অদ্ভুত!

লায়লা জিয়াসের এই প্রশংসায় যেন আরক্তিম হয়ে উঠল। সে লজ্জাবনত মুখে কি যেন এক অস্বস্তির আগুনে একটু ঝলসে গেল। মুখ না তুলেই সে ধীরে ধীরে বলল, না-না, অমন কথা বল না জিয়াস! আমি একটা অতি তুচ্ছ বাঙ্গালী মেয়ে মাত্র। আমাদের তুলনায় তোমাদের দেশের মেয়েরা আরও সুন্দর, আরও বুদ্ধিমতী, আরও জ্ঞানী ও গুণী। এখন তুমি আন্ম্যারেড্ মিলিটারী অফিসার, প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। তোমার বিদ্যে, বুদ্ধি, জ্ঞান গরিমা, কর্ম্মদক্ষতা সবই প্রশংসনীয়। তুমি তোমার গভর্ণমেন্টের যে কাজের ভার নিয়ে এখানে এসেছ, তাতে তুমি পুরোপুরি কৃতকার্য। সুতরাং এর আনন্দ ও কম নয়। অপরধারে তুমি যুবক, তুমি সুন্দর, তুমি বলিষ্ঠ উন্নতশির বীর; তোমার বাহুতে রয়েছে প্রচুর বল, মনে রয়েছে আগুনের মত তেজ, প্রাণে রয়েছে বল্গাহীন অশ্বের মত ধাবমান উচ্ছ্বাস! তুমি বলতো জিয়াস, তোমার মত স্বামী পাওয়া এই সামান্য একটা নেটিভ গার্লএর পক্ষে কতবড় সৌভাগ্যের কথা?

লায়লার এই কথায় জিয়াস খাঁ যেন আরও অভিভূত হয়ে পড়ল। সে প্রবল আবেগের সঙ্গে বলে ফেলল, ভুল করছ লায়লা – তুমিও কিছু কম নও; তুমি একটা পুরোপুরি জুয়েল! আমি জানি – আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দেশের মেয়েদের থেকে তোমার শিক্ষা-দীক্ষা-মানে কালচার, অনেক-অনেক বেশী। তুমি যেন একটা সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ –!

জিয়াসের এই কথায় লায়লার রক্তরাঙা অধোরোষ্ঠে একটু হাসির ক্ষণপ্রভা তরঙ্গায়িত হয়েই যেন মিলিয়ে গেল। সে বলল – জিয়াস! তুমি না এডুকেটেড্। তোমায় একটু আগেই আমি বললাম না – বাঙ্গালী মেয়েরা তার স্বামীর কোন রকম দুর্বলতা সহ্য করতে পারে না! সত্যি কথা বলতে কি আমার ধারণা, ঐটাই বাঙ্গালী নারীর যেন সবথেকে বড়

মূলধন। আমি তোমার পায়ে পড়ি জিয়াস, অন্ততঃ আমার সামনে তুমি নিজেকে একরত্তিনও ছোট ক'র না; আমার প্রসংশা ক'র না – কোন সময়, কোন দিন!

লায়লার এই সমস্ত কথায় জিয়াস যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। তার উন্নত বক্ষ, প্রশস্ত ললাট, বজ্রকঠিন কলেবর সবই যেন বাতগ্রস্ত পঙ্গু বৃদ্ধের মতই নুইয়ে পড়ল। সে লায়লার সামনে নিজেকে যেন বড় অসহায় বোধ করল এবং বলল, লায়লা – 'প্লিজ ষ্টপ্! সিজ ইওর টাঙ্গ!' আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার রাজ্য থেকে আমায় অন্য কোন এক অজানা রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু আমার তো সেখানে গেলে চলবে না – আমার ওপর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের একটা পাঁজর ভেঙ্গে যাবে যদি আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে না পারি। লায়লা আমি জানি আমাদের জগতের বাইরেও আর একটি জগৎ আছে। কিন্তু সে জগতের খবর নিয়ে লাভ কি! যখনই তার খবরাখবর নেব তখনই তো আমি আর মিলিটারী ম্যান থাকতে পারব না। তাই বলছি কি তুমি আমার, তোমার যা আছে তাও আমার! আমার যা ছিল না আমি তাই-ই পেলাম। এর বাইরের চাওয়া পাওয়ার আর কিছু দরকার নাই, দরকার হলেও তা নেওয়ার প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়।

তুমি মন্দ বল নাই জিয়াস –! তুমি যদি তাই-ই চাইতে তা হলেও আমি জীবন থাকতেও তা হতে দিতাম না। তার কারণ, আমি চাই তোমাকে – আর তোমাকে চাই বলেই কথা বলি, আর কথা বলতে পারি বলেই তোমায় ভালবাসতে পেরেছি। আর ভালবাসি বলেই চাই তোমার আনন্দ ও উন্নতি।

লায়লার এই কথায় জিয়াস বলল, ঠিক বলেছ – ! আমাদের চাই প্রচুর উন্নতি, আনন্দ, আতিশয্য, ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর সব কিছু। আমরা ভোগ করতে এসেছি, ভোগ করার জন্যেই জন্মেছি – ভোগ করব, এর বাইরের কিছু দেখার ও জানার কোন প্রয়োজন নেই থাকবেও না কোন দিন।

লায়লা বলল, ঠিক বলেছ – 'ইউ আর রাইট্!' তোমার চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তাও মিলছে।

মিলবে, মিলবে লায়লা – সব মিলে যাবে। একদিন দেখবে মিলিটারী রুল – সে মিলিটারী রুলই, ওর ছোঁয়ায় সব কিছু পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে।

লায়লা বলল, তা যায় –! আর তা যায় বলেই আমি তোমায় আমার আঁচলে চিরকাল ঢেকে রাখতে চাই। যাতে তোমার আদর্শ, তোমার কর্ম্মনিপুণতা ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা থাকে। তোমার নাম ইতিহাসে লেখা হলে যুগ যুগ ধরে মানুষ তা পড়বে, তোমায় জানবে তোমায় বুঝাবে। তাহলে আমার আনন্দেরও সীমা থাকবে না, আমি মরে গেলেও ঐ 'ক্রেডিট্' ভাঙ্গিয়ে আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে।

লায়লার এই কথায় জিয়াস বলল, বেশ তাই হবে। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

লায়লা তখন বলল, বেশ! সেটা আমার সৌভাগ্য। তোমার জয় তো আমারই জয়। কিন্তু জিয়াস – আজ তোমায় আমি একটা প্রশ্ন না করে কিছুতেই থাকতে পারছি না – সত্যি করে বল তো জিয়াস, তুমি আমায় কতটা ভালবাস?

'হোয়াট্' –? তার মানে –? তুমি কি বলতে চাও আমি তোমাকে ভাল না বেসে ভালবাসার অভিনয় করছি?

না –? তা বলছি না – আমি অত বোকা নই। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। তবু একটা জিনিষ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না জিয়াস, আমি যখন তোমার কিছু জানতে চাই – তখনই তুমি যেন কেমন ধারা হয়ে পড়। হয়ত এও সংস্কারের তারতম্য। কারণ আমি জানি, তুমি যখন আমার, তখন তোমার সব কিছুই আমার। সুতরাং আমি কিছু জানতে চাইলে তোমার গোপন করা উচিত নয়। যদি গোপন কর তা হলে জানব, তুমি আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাস না। তুমি কোন

দিন আগ্রার তাজমহল দেখেছ জিয়াস? চোখ দিয়ে দেখেছ – না মন দিয়ে দেখেছ? যে মানুষ দিব্যদৃষ্টিতে তাজমহল দেখতে না পারে, সে ভালবাসতেও পারে না।

'হোয়াট' –? তার মানে?

তার মানে ভালবাসা চির পূতঃ, পবিত্র ও অনবদ্য। 'লাভ ইজ হেভেনলি!'

'রাইট–! রাইট –! ইউ আর রাইট লায়লা! লাভ ইজ হেভেনলি। হোয়াট এ ডিলিসিয়াস্ – –! ওয়াণ্ডারফুল –!'

লায়লা বলল, তাহলে এতক্ষণে বুঝেছ? এর আগে বোঝ নাই নিশ্চয়! যদি বুঝতে, তা হলে তুমি তোমারই লাভার-এর উপর কখনো বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করতে পারতে না – ।

লায়লার এই কথায় জিয়াস বলল, বুঝেছি! 'ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল!

লায়লা বলল, তবে তুমি বোস – আমি আগে তোমায় কিছু খাওয়াই – তারপর আবার কথাবার্ত্তা আনন্দ আহ্লাদ সব হবে। এই বলে লায়লা উঠে গিয়ে বেল টিপতেই বেয়ারা এসে গেল। লায়লা তাকে দু'প্লেট খাবার আনতে বলে ঘুরে এসে আবার জিয়াসের পাশেই বসল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে সানন্দে খাবার খেয়ে অবসর বিনোদনে মনোনিবেশ করল। অবসর বিনোদনের মাঝখানে লায়লা বলেছিল, দ্যাখ! আমার আর এখানে একা একা একদম ভাল লাগে না। তুমি আমায় এবার বাইরে নিয়ে চল। আমি আলো বাতাস, নদী-নালা, ফুল ফল সবকিছু দেখতে চাই। সেই ব্যবস্থা তুমি যদি না করে দাও, তা হলে জানবে – আমি পাগল হয়ে যাব।

লায়লার এই কথায় জিয়াস বলেছিল, তাই হবে, তুমি কাল থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাবে। দিন কয়েক ঘুরে এলেই তোমার মনটা ঠিক হয়ে যাবে।

চৌদ্দ

লায়লা বলছিল – জিয়াস, তুমি আমায় অনেকদিন পরে আবার আলো, বাতাস, গাছপালা, মাঠ সবই দেখালে – কিন্তু ফোর্টের ভিতরটা আর সৈন্য ব্যারাকগুলো দেখালে না তো – !

জিয়াস বলেছিল – ওর আর কি দেখবে? ওখানে দেখবার মতন তেমন কিছু নাই। আছে কেবল অস্ত্রশস্ত্র – ব্রুট সোলজারে ভর্ত্তি, আর –

আর কি –?

আর –? আপাততঃ প্রতিটি ব্যারাকেই – বাঙলার অর্ধনগ্ন নারী। সে সব তোমার না দেখাই ভাল! দেখলে মন খারাপ হয়ে যাবে।

না – তা যাবে না! যে দেশ অসহায় শিশু হয়ে একটা প্রচণ্ড রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় – সে দেশের মেয়েরা নির্যাতিতা হবে না তো কি আমি হব? ঠিক হয়েছে – তুমি তোমার সৈন্যদের বরং নির্দেশ দাও – 'ক্রাশ বেঙ্গল!' বাংলাদেশ ধ্বংস করে দাও! লুঠ কর ওদের ইজ্জৎ, লুঠ কর ওদের ধন সম্পদ, লুঠ কর ওদের মান সম্মান – সব কিছু! আমি চাই – 'লঙ্ লিভ জিয়াস।' 'প্লেনটি ফরচুন ফর মাই বিলাভেড জিয়াস –!' এর বাইরের কিছু ভাববার আর করবার আমার কোন আবশ্যক নাই, আর প্রয়োজনও কোনও দিন হবে না।

লায়লার এই কথায় জিয়াস বলেছিল – তবে তুমি যেতে পার। কিন্তু সে সব নারকীয় দৃশ্য না দেখাই ভাল, কারণ দেখলে মন খারাপ হয়ে যাবে।

বল কি –? তুমি একটা মিলিটারী অফিসার হয়ে ও কথাটা কি করে মুখে আনলে তা তো বুঝতে পারছি না! আমার ভয় হচ্ছে – হয়ত তোমার পদস্খলন হচ্ছে।

না-না! তোমার সে ভয় নাই। আমি মিলিটারী ম্যান – আমি সে সব আদব কায়দা পুরোপুরি মেনে চলি।

লায়লা তখন সানন্দে বলল, গুড্! এটা আমার চরম সৌভাগ্য।

লায়লার এই কথায় জিয়াস খাঁ বলল, তবে চল – তোমায় ক্যাণ্টনমেণ্টের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে আমার স্ত্রী বলেই পরিচয় দিতে হবে – এটা যেন ভুলো না। কারণ এটা না করলে তোমার পক্ষে ঐ ক্যাণ্টনমেণ্টের ভিতর থেকে ফেরা আর সম্ভবপর হবে না। এখন রয়েছ মিসেস জিয়াস, এক মিনিট পরে হয়ত হয়ে যাবে মিসেস আব্বাস। অবশ্য তাও পারমানেণ্ট নয়, পিওরলি টেমপোরারি।

লায়লা জিয়াসের এই কথায় তার গায়ে চিমটি কেটে দিয়ে বলল, যাঃ –! কি অসভ্য –!

লায়লার এই কথায় জিয়াস হা-হা করে হেসে উঠে লায়লার পিঠে চাপড় মেরে বলেছিল, তুমি খুব দুষ্টু!

তখন উভয়ের হাস্যরোলে গোটা জিপটি যেন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। জিয়াস বলেছিল, আজই তোমার 'আইডিণ্টিটি কার্ড' করে দিচ্ছি। ঐটা নিয়ে তুমি রোজই ক্যাণ্টনমেণ্টের ভিতরে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে।

জিয়াস লায়লাকে তাই-ই করে দিয়েছিল। লায়লার এখন অবাধ গতি। লায়লা এখন বেগম জিয়াস, তার ক্ষমতা অপ্রতিহত, গতি অবাধ-পরিচিতি প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত। তবু লায়লা বলেছিল, তুমি ছাড়া আমার কোথাও যেতে একদম ভাল লাগে না।

জিয়াস বলেছিল, তাই কি হয়? আমার অনেক কাজ! প্রায় সর্বদাই ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়, তার উপর অফিসেরও প্রচুর ঝামেলা। বিভিন্ন খবরাখবর ও যোগাযোগের উপর কড়া নজর রাখতে হয়। আমার কাজে একটু মাত্র গাফিলতি হলেই – বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

জিয়াসের এই কথায় লায়লা বলেছিল, তুমি ভেবো না, তোমার অফিসিয়াল কাজে আমি তোমাকে অনেক সাহায্য করতে পারব। তা হলে তোমার অনেক সুবিধা হবে – তাছাড়া এ না করে উপায়ই বা কি? কারণ, তোমাকে প্রমোশন নিতেই হবে। তোমার একটা 'লিফ্‌ট' না হওয়া পর্য্যন্ত আমার যে ঘুমই হবে না। আর 'স্যাটিসফ্যেকসন্‌-ই' বা কি? তোমার 'লিফ্‌টিং চাই-ই চাই –!

জিয়াস খাঁ – আর কিছু বলতে চায় নাই, আর বলতে চাইলেও – তা প্রকাশ করার মত ভাষা খুঁজে পায় নাই। তাই সে বলেছিল, বেশতো – তুমি যা বোঝ তাই-ই করবে – ও বিষয়ে আমি কোন মন্তব্য করতে চাইনা, আর তার প্রয়োজনও নাই।

লায়লা জিয়াসকে বলেছিল, ক্যান্টনমেন্ট তো দেখালে, আর রোজ রোজ দেখার মত ব্যবস্থাও তো করে দিলে। কিন্তু তোমায় আজ আমি আর একটি অনুরোধ করব, সেটা তোমায় রাখতেই হবে।

লায়লার এই কথায় জিয়াস বলেছিল, বল! আমি তোমার কথা নিশ্চয়ই রাখব।

লায়লা তখন জিয়াসের হাত দু'টো দু'হাতে চেপে ধরে বলেছিল, আজ রাতটা তোমায় আমার কাছে থাকতে হবে। তার কারণ, আমার কাছে আজ রাতটার গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি – সবচেয়ে আনন্দের। তাই আমি চাই, আজ রাতেই আমাদের 'হনিমুন' হবে। আমরা উভয়েই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠব। আমরা আজ মিলে মিশে একাকার হয়ে যাব। আমাদের কৃষ্টি, আমাদের ধর্ম, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে – । তুমি রাজী –?

জিয়াস বলল, রাজী – ।

লায়লা তখন বলল, আমার আর একটা অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে।

জিয়াস বলল, সেটা কি বলে ফেল – আমি প্রাণ দিয়েও তা রাখব।

লায়লা তখন বলল, তুমি একজন বড় অফিসার। তাই আমি নিশ্চয়ই তোমার কথার উপর আস্থা রাখতে পারি। এই যুদ্ধে অতীতে কি হয়েছে, বর্ত্তমানে কি হচ্ছে, আর ভবিষ্যতেই বা কি হবে – এই গল্পটি তোমায় আনুপূর্বিক বিশদ ভাবে বলতে হবে।

লায়লার এই কথায় জিয়াস বলেছিল – তথাস্তু।

জিয়াস খাঁ বলেছিল, তা হলে আজকের প্রোগ্রামটা ফাইনাল করার ভার তোমারই উপর। তুমিই যখন উদ্যোক্তা, তুমিই নায়িকা – 'এ্যাবাভ অল' তুমি প্রিন্সিপ্যাল, তখন তোমাকেই প্রোগ্রামটা 'পুট আপ' করতে হবে।

জিয়াসের এই কথায় লায়লা বলেছিল, বেশ তো! তোমার মিনিস্ট্রিতে আমি যখন চিফের পদ পেলাম তখন তা আমায় পালন করতে হবে বৈ কি!

জিয়াস খাঁ বলেছিল – তাহলে এই সাতসকালে আমার উপর কি আদেশ –?

আজ্ঞা জাঁহাপনা – আজকের প্রথম কাজ হ'ল তোমার জিপেই আমি ক্যাণ্টনমেণ্ট পরিভ্রমণ করব। আপটু ১২ এ, এম পর্য্যন্ত, তারপর বেলা ৩টা পর্য্যন্ত স্নানাহার ও নিদ্রা। তারপর ৪টা হতে ৬টা পর্য্যন্ত আবার ক্যাণ্টনমেণ্ট। ৬-৩০ টা হতে ৭-৩০ পর্য্যন্ত নাস্তা খানাপিনা ইত্যাদি। ৭-৪৫ থেকে ৯ টা পর্য্যন্ত যুদ্ধের গল্প। ৯টা থেকে ১০-৩০ টা পর্য্যন্ত হনিমুন, ১০-৩০ টায় নৈশ ভোজন ও শয়ন। 'মে মাই এজেনডা বি এ্যাপ্রুভড্ বাই ইওর অনার –!'

জিয়াস খাঁ সহাস্যে বলেছিল, এ্যাপ্রুভড্, হেড অফিস-এর অর্ডার – সাব অফিস মেনে নিতে বাধ্য। এই কথায় উভয়ের উচ্চ হাস্যরোল গোটা বাড়ীটাকে মুখরিত করে তুলল এবং উভয়ে হাত ধরাধরি করে নীচেয় নেমে এসে জিপে ষ্টার্ট দিল।

জিপ ক্যাণ্টনমেণ্টের ভিতরে প্রবেশ করল। জিয়াস খাঁ সৈন্য ব্যারাক হতে আরম্ভ করে অফিসারদের কোয়ার্টার এবং অফিস, ষ্টোর ইত্যাদি সবই দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াল। লায়লা সবকিছুতেই মনঃসংযোগ করে দেখতে লাগল এবং এটা কি, ওটা কি ইত্যাদি প্রশ্ন করতে লাগল ও জানতে লাগল।

ক্রমশঃ ওরা ব্যারাকের ভিতরে একটা জায়গায় এলে লায়লা বলল, ওধারের ঐ ঘরগুলোয় কি আছে?

জিয়াস খাঁ বলল, ওধারটায় সেল –! ওখানে অপরাধীদের বন্দী করে রাখা হয়।

তবে চল না ঐ সেলগুলো দেখি।

জিয়াস খাঁ বলল, ওতে দেখবার আর কিছুই নাই। ওগুলো আপাততঃ বন্দিনী নারীতে পরিপূর্ণ।

জিয়াসের কথায় লায়লা যেন তড়িতাহত হয়ে পড়ল। বলল, বল কি কেন – কেন? ওখানে মেয়েদের বন্দিনী করে রেখেছে কেন? ওরা কি রাজদ্রোহী?

না – তা নয়।

তবে –? তবে ওদের বন্দিনী করে রেখেছে কেন?

লায়লা – তোমার এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই মুস্কিল। তার কারণ, সত্যি কথা বলতে কি-ওদের বন্দী করার পিছনে কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ বা যুক্তি নাই। তবে –? তবে ওদের ওখানে বন্দী করে রাখল কেন? বলনা জিয়াস, তুমি বল – এগুলো কি অন্যায় নয়?

দ্যাখ লায়লা, কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় এর বিচার করবার অধিকার আমাদের নাই। আর ঐ অধিকার রাখলে সামরিক বিভাগে কাজ করা চলে না। আমাদের লাইফ হচ্ছে-আজ্ঞা পালনের জন্যে। 'উই হ্যাভ বরণ্ টু ক্যারি আউট অর্ডার অফ হাইকমাণ্ড', এর বেশি তোমায় আর কি বলব?

লায়লা বলল, ওঃ –! তাই নাকি –? তাহলে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এটা পাকিস্তানী গভর্ণমেণ্টের একটা অলিখিত ইঙ্গিত? – মানে, ধ্বংস –?

লায়লার কথায় জিয়াস বলেছিল, তোমার এই সমসত প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই শক্ত। তাছাড়া ‘বিয়িং এ মিলিটারী ম্যান আই এ্যাম রেষ্ট্রিকটেড্ টু সাচ্ ডিস্কাসন্।’

লায়লা বলেছিল, তাহলে তোমায় জবাব দিতে হবে না, তোমার জবাবটা আমিই দিয়ে দেব। এখন আমায় ঐ বন্দীশালাগুলোয় নিয়ে যেতেই হবে। ওর ভিতরে কত বন্দী আছে না আছে, ওরা কেমন আছে না আছে, ওরা কেন বন্দী হ’ল কেমন করে হ’ল – এ তথ্য আমায় জানতেই হবে জিয়াস!

জিয়াস বলেছিল, বেশ –! তবে চল, তোমায় সব কিছু দেখানোর প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি-এখন দেখাব।

ওরা উভয়ে একটা ব্যারাকের রুদ্ধ কক্ষে এসেই জিয়াস লজ্জিত হয়ে নিজের জিপে ফিরে এলো। লায়লা দেখল একটি ঘরে কমপক্ষে ষাট-সত্তরটি মহিলা। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যুবতী ও সুন্দরী। তাদের মুখে চোখে নির্যাতনের প্রচণ্ড ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে।

লায়লা ওদেরই কাছে জেনেছে, প্রতিদিন রাত্রে পাষণ্ড সৈনিকের দল আসে আর ঘরের তালা খুলে ওদের নিয়ে যায়, বিভিন্ন ঘরে একটি একটি করে চালান করে – তারপর চলে পাশবিক অত্যাচার – মেয়েরা মদ ও মাংস খেতে বাধ্য হয়। ঐ বর্ব্বর অত্যাচারে যারা মরে যায়, তারাই যেন বাঁচে। লায়লা ওদের কথা আর শুনতে পারে নাই; শোনার ক্ষমতা ছিল না, চোখ খুলে দেখার মত ধৈর্য্য তার ছিল না – তাই সে কোন রকমে চোখ বুজে কানে আঙ্গুল দিয়ে ছুটতে ছুটতে জিয়াসের জিপে ফিরে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল।

লায়লার ঐ অবস্থা দেখে জিয়াস খাঁ বলেছিল, কি হ’ল? তুমি এমন হাঁপাচ্ছ কেন?

লায়লা নিজের বুকে হাত দিয়ে তখনও দম নিচ্ছিল। বলল, সে পরে বলব। এখন এখান থেকে আমায় নিয়ে চল।

জিয়াস খাঁ তাই-ই করেছিল। কিন্তু লায়লার সেই যাত্রাটা শুভ যাত্রা হয় নাই। পথিমধ্যে সেই ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে একটা নধরকান্তি চার পাঁচ বছরের ছেলেকে খেলা করে বেড়াতে দেখে লায়লা বলল, জিয়াস তুমি গাড়ীটা একটু থামাও না। লায়লার কথায় ছুটন্ত জিপ ক্যাঁচ করে থেমে গেল। গাড়ী থামতেই ছেলেটি খেলা ফেলে জিপের কাছে ছুটে এসে মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করে বলল, তুমি কে?

লায়লা জিপ থেকে নেমে ছেলেটিকে আদর করে বলল, আমি মিসেস জিয়াস খান! তুমি কে?

আমি মাষ্টার খান! আমার মায়ের নাম নারায়ণী সোম। দ্যুৎ –! সোম নয় – খান। এখন আমার মায়ের নাম সাফিয়া খান।

লায়লা বলল, তোমার বাবার নাম?

বাবা তো মরে গেছেন। আমার বাবাকে তো পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলি করে মেরে দিয়েছে।

লায়লা বলল, তা হলে তোমার বাবা নাই?

এখন আমার বাবার নাম মিষ্টার খান্, আমায় খুব ভাল বাসেন।

বেশ তো! তোমার মায়ের সঙ্গে আমায় একটু আলাপ করিয়ে দেবে?

তা আবার দেব না কেন? চলুন না – ঐ ঘরটিতেই তো আমার মা আছেন।

চল! এই বলে লায়লা সেই খোকার হাত ধরে যেতে যেতে বলল, আচ্ছা খোকন! তুমি বড় হয়ে কি হবে?

আমি? আমি বড় হয়ে অফিসার হব। অফিসার হয়ে-সমস্ত পাকিস্তানী সৈন্যগুলোকে মেরে ফেলব। এমন সময় সামনের একটা বাড়ী হতে একটি সুন্দরী বধু বেরিয়ে এসে ডাক দিল 'খোকন!'

ছেলেটি চিৎকার করে বলল, যাচ্ছি মা! এই দ্যাখ কাকে এনেছি –!

ছেলেটির মা লায়লাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে – স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সজলঘন চোখ হতে অবিশ্রান্ত অশ্রু দুর্দমনীয় বেগে গণ্ডস্থল বয়ে ঝরতে লাগল। তার কান্না দেখে লায়লাও না কেঁদে পারল না।

একটি নির্যাতিতা বাঙ্গালী বধু ক্যান্টনমেন্টে সপুত্রক বন্দিনী। সে আজ এক খান অফিসারের পত্নী – পুত্রের জীবন রক্ষার সর্তে সে স্বেচ্ছায় এক সামরিক অফিসারের গৃহিনীর মতই সর্তবদ্ধ জীবন যাপন করছে। তাই সেই হিন্দু কুলবধু ক্যান্টনমেন্টের অসহনীয় জীবন যাত্রার মাঝখানে একটি বাঙ্গালী তরুণীর সন্দর্শনে যেন মূক ও বধির হয়ে পড়েছিল। যে ঘৃণ্য জীবনকে মানা যায় না, যার ঘৃণ্য জঘন্য ছোঁওয়া লাগলেও পাপ হয়, সেই জীবনের জীবন হয়ে একমাত্র সন্তানকে বাঁচানোর আশায় আজ ঐ তরুণী বধূ বেগম খান্।

লায়লা চোখ রগড়ে বলেছিল, কাঁদছেন কেন? এতে কান্নার কি আছে? বেশ তো রয়েছেন – যেমনি রয়েছি আমি। এতে – আমাদের দুঃখ কিসের?

লায়লার এই কথায় মেয়েটির চোখের জল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, সে আর কোন কথাই বলতে পারে নাই।

লায়লা বলেছিল, মানুষের ললাটের লিখন তো আর কেউই বদলাতে পারবে না। যা হবার তা হয়ে গেছে – আবার যা হবার তাও হবে।

লায়লার কথায় মেয়েটি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লায়লার মুখের দিকে। একটি কথাও সে বলতে পারল না। লায়লা আবার বলল, এইতো আমি ছিলাম বাঙ্গালী, এখন হয়ে গেছি অবাঙ্গালী। বাবা-মা-বোন সবাই ম'ল গুলিতে আর অত্যাচারে – তবু আমি বেঁচে রইলাম, বাঁচতে চাইলাম, নির্য্যাতিত জীবনটাকে মেনে নিলাম সানন্দে! আমি এখন বাঁচতে চাই, খেলতে চাই, খেলাতে চাই। আমি জানি নিয়তির চাকা ঘুরছে, সে ঘুরবে। আজ যে উপরে কাল সে নীচে নামবে, যে নীচেয় রয়েছে কাল সে উপরে উঠবেই। তাই ভাই তোমায় আমি বলছি শোন, শান্ত চিত্তে বর্ত্তমানকে মেনে নাও। এখন আমার জানতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার জীবনের বিপর্য্যয়ের ইতিহাসগুলো। আমায় খুলে বল!

লায়লার এই কথায় মেয়েটি কেঁদে ফেলল। লায়লা তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সস্নেহে বলল, লক্ষ্মী বোনটি আমার কেঁদো না।

লায়লা একটি খাটে বসে পড়ল এবং ক্রন্দনরতা বধূটির মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলল, অত অধির হয়ো না বোন।

বধুটি চোখ মুছে বলল, সে সব কথা কি করে বলি বলুন। আমি তার বর্ণনা করতে পারব না।

লায়লা বলল, না-! তোমায় বর্ণনা করতেই হবে। তুমি আমার বোন! তোমার এই আঁখিজল, তোমার এই বর্ণনা একদিন পাষাণে গাঁথা হয়ে থাকবে। দেশ জানবে, দশ জানবে, জগৎ জানবে। এই লৌহ কঠিন ক্যান্টনমেন্টের অন্তরালে একটি কূলবধূর চোখের জল, শান্ত দীর্ঘশ্বাস, অন্তরের বেদনাক্লিষ্ট হা-হুতাশ, এর বাইরে যেতে পায় না। এই বেদনা

লোহার প্রাচীরে ঘা খেয়ে ফিরে আসে। তাইতো লক্ষ্মী বোনটি আমার, আমায় খুলে বল, তোমার উপর অত্যাচারের সব কথা।

মেয়েটি তখন যেন বজ্রকঠিন হয়ে উঠল। বলল, প্রায় দু'মাস আগেকার কথা। আমার বাড়ী মীরগড়, অটোয়ারী থানায়। পঞ্চগড়, মীরগড়, মির্জাপুর, লক্ষ্মীপুর, ধামার, সোনাপাড়া, সর্দ্দারপাড়া, ঝুলঝুলি – গ্রামগুলোর উপর এক অমানুষিক অত্যাচার হয়ে গেছে। সে সব অত্যাচারের বর্ণনা আমি করতে পারব না। তার কারণ, আমি মেয়ে মানুষ, সব কিছু চোখে দেখিও নাই। তবে আমি শুনেছি অটোয়ারী থানায় পাকিস্তানী ডিফেন্স নাকি মারাত্মক ছিল।

ওরা, মানে পাকফৌজ একদিন মীরগড় গ্রামটা আক্রমণ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলল। আগুন, লুঠতরাজ এবং হত্যা, সমানভাবে চালিয়ে ঐ অঞ্চলটা যেন শ্মশানে পরিণত করে দিলে ওরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

আমরা লুণ্ঠিতা এবং ধর্ষিতা হ'লাম। কাছেই তো ঠাকুর গাঁ এয়ারপোর্ট, আর রুহিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনটাও খুব বেশী দূর নয়। ঐটাই ছিল বোধ হয় ঐ অঞ্চলের পাকফৌজদের যাতায়াতের শক্ত ঘাঁটি।

লায়লা বলল, ওসব কথা শুনে আমার লাভ নাই। আমি খালি জানতে চাই – তোমায় ওরা কখন নিয়ে এলো কিভাবে নিয়ে এলো, কাদের সঙ্গে নিয়ে এলো এবং কোথায় তুলল, ইত্যাদি ইত্যাদি – ।

লায়লার এই কথায় মেয়েটি বলল, তবে শুনুন – আমাদের গ্রামটা ধ্বংস করে ওরা প্রায় পনের কুড়িটা মেয়ে ধরে এনে জীপে তুললে, আর তার সঙ্গে কিছু লুঠের মাল। ওরা গিয়েছিল প্রায় ত্রিশ চল্লিশটা জিপ নিয়ে। আমার চোখের সামনেই ওরা আমার স্বামী, শ্বশুর, দেওর সবাইকেই হত্যা করল এবং আমাদের গ্রামের বাছাই বাছাই সুন্দরী ও যুবতী মেয়েগুলোকে তুলে নিলে একটা লরীতে – তারপর এখানে নিয়ে এসে একটা ঘরে পুরে রাখল।

লায়লা বলল, তোমার সঙ্গে তো ছেলে ছিল। আর কারোর কোন ছেলে ছিল?

না –! আর একটা মেয়ের একটা কচি মেয়ে ছিল। একটা সৈন্য সেই মেয়েটাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে দিয়েছিল।

লায়লা বলল, তা তোমার ছেলেটাকে মারতে চায় নাই?

চেয়েছিল! ওরা আমার ছেলেটাকে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করতে চেয়েছিল। তখন আমি একজন অফিসারের পায়ে পড়ে কেঁদে বলেছিলাম, সাহেব –! আমার সবই চলে গেছে। এখন এই কচি ছেলেটার প্রাণ ভিক্ষা চাইছি, এর বদলে তুমি যা চাও – আমি তাই দেব। এই ছেলেটাকে অন্ততঃ বুক থেকে কেড়ে নিও না! সেই সাহেবটা তখন আমায় দয়া করেছিল। তাই আমার খোকা এখনও বেঁচে রয়েছে।

লায়লা বলল, বেশ তো ভালই হয়েছে। তারপরদ?

তারপর! তারপর – এই ক্যান্টনমেন্টের একটা ঘরে আমাদের বন্দী করে রাখল।

তারপর –?

পরদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘরের তালা খুলে কয়েক জন সৈনিক ঘরে ঢুকল এবং কয়েকটা মেয়েকে টেনে বার করে নিয়ে গেল – আবার সকাল বেলায় তাদের ফিরিয়ে দিয়ে গেল। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে – সীমাহীন। মেয়েগুলো প্রায় অর্দ্ধমৃত হয়ে পড়েছিল।

তারপর – ?

সেইদিন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। পাঁচ সাতটা মেয়ে নিজের নিজের কাপড় গলায় বেঁধে কড়িডোরে ঝুলে আত্মহত্যা করল। আর ঐ দিনই আমায় অন্য ঘরে সরিয়ে দিল। যে অফিসারটা আমার ছেলের প্রাণরক্ষার হুকুম দিয়েছিল – সেই অফিসারটাই আমায় বল্লে, তোমার ছেলের অন্য জায়গায় স্কুল হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা করেছি। আর – তুমি আজ থেকে আমার ঘরে থাকবে। কিন্তু তার প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি নাই।

লায়লা সাগ্রহে বলল, তারপর কি হল?

সেই অফিসারটা তখন মাতাল। আমায় বললে, ঠিক আছে, তুমি নিজেই আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে।

তারপর – ?

তাঁর ইঙ্গিতে কয়েকটা সৈনিক এসে আমার খোকনকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আর আমাকে অন্য একটা ঘরে পুরে দিল। সে দৃশ্য আমি বলতে পারব না, বোঝাতে পারব না।

কি রকম – ?

আমরা প্রত্যেকেই বিবস্ত্রা ছিলাম। তার কারণ, তখন ঐ ক্যান্টনমেণ্টে ধর্ষিতা নারীরা পাইকারী হারে আত্মহত্যা করতে আরম্ভ করেছিল।

তারপর – ?

আবার রাত্রির সেই নৃশংস বীভৎসতা। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, ওরা এক একটা নারীর উপর কিভাবে দল বেঁধে অত্যাচার করেছে দিনের পর দিন। সে না মরা পর্য্যন্ত ছাড়ে নাই।

লায়লা বলল, তুমি কি ঐ অত্যাচারে কাউকে মরতে দেখেছ?

লায়লার কথায় মেয়েটি বলল, দেখেছি – একটা আধটা নয়, গাদা গাদা।

এমনও দেখেছি অর্দ্ধমৃত মেয়েগুলোকে ওরা গুলি করে হত্যা করেছে, লরি বোঝাই করে তাদের লাশ নিয়ে গেছে নদীতে ফেলে দেওয়ার জন্যে।

লায়লা বলল – বেশ হয়েছে, ভালই হয়েছে – তুমি ঐ রকম অবস্থায় পড় নাই?

মেয়েটি বলল – আপনি কি ভাবেন, ওরা কাউকেই রেহাই দেয়? ওরা কাউকেই ছাড়ে না – আমিও ছাড়ান পাই নাই।

ওর কথায় লায়লা বলল, তুমি আত্মহত্যা করার চেষ্টা কর নাই?

করেছিলাম। কিন্তু আত্মহত্যা করবার আর কোন রাস্তাই আমাদের কাছে খোলা ছিল না। মরবার একটু যদি সুযোগ পেতাম তা হলে বেঁচে যেতাম।

তারপর – ?

তারপর বিভিন্ন ঘর থেকে আনা দু'তিনশো নির্যাতিতা মেয়েকে একদিন একটা বড় আণ্ডারগ্রাউণ্ড ঘরে আনা হল। আমরা আবার পরতে কাপড় জামা পেলাম, মাংস রুটি খেতে পেলাম, তেষ্টার জল পেলাম।

তারপর কি হ'ল?

আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা সেই রাতটা সেই বর্ব্বর নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেলাম। ভাবলাম হয়ত আমাদের মুক্তি হবে।

লায়লা বলল, কেন মুক্তি হল না –?

না –! ওখানে যারা যায় তারা আর মুক্তি পায় না।

লায়লা ব্যগ্র হয়ে বলল, কি রকম?

আর – কি রকম! শয়তানরা নূতন চাল চালার জন্যে আমাদের ঐ হল ঘরটায় জড় করেছিল।

লায়লা বলল, তাই না কি?

হ্যাঁ –! তাই-ই।

কি রকম –?

ওরা বেশ কিছু ফৌজ আর কয়েকজন অফিসার আমাদের ঘরে ঢুকে আমাদের বেছে বেছে আলাদা করতে লাগল। প্রচণ্ড নির্যাতনে যারা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল, যারা রক্তাক্ত কলেবরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল, তাদের ছাঁটাই করে আমাদের কাছ হতে আলাদা করে নিয়ে গেল এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তাদের সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করল আমাদেরই চোখের সামনে, এবং লরী বোঝাই করে তাদের মৃতদেহগুলো কোথায় নিয়ে চলে গেল জানি না।

লায়লা বলল, তা তো যাবেই। অচল মেয়েগুলো রাখলে খেতে দিতে হবে – অথচ তারা কোন কাজেই আসবে না। তাই তারা মেরে দিয়েছে, লাশগুলো হয়ত নদীর জলে ফেলে দিয়েছে – নয়ত খাল কেটে পুঁতে দিয়েছে। যাকগে – যেগুলো মরেছে, তারা মরে নাই – বেঁচেছে, তাদের হাড় জুড়িয়েছে।

মেয়েটি বলল, ঠিক বলেছেন, তারা মরে নাই – বেঁচেছে! আহা ওরকম মরা যদি আমিও মরতে পেতাম –!

লায়লা বলল, সে কি কথা? তুমি তো খাসা সুখেই রয়েছ। মরবে কেন? আমিও তো খাসা সুখে রয়েছি।

লায়লার এই কথায় মেয়েটি বলল, সুখ! হায় ভগবান, আমি কি করে বোঝাই – আমার এ ঘৃণ্য জীবনের কথা –!

মেয়েটির এই কথায় লায়লা বলল, না –! তোমায় আর বোঝতে হবে না, আমি বুঝতেও চাই না। তুমি খালি বল, তারপর কি হল?

হ'ল আমার ছাই – মাথা আর মুণ্ডু।

অর্থাৎ –?

সেই দিন বিকালে চার পাঁচ খানা লরী এসে আমাদের সেই ঘরের সামনে দাঁড়াল। আর এলো প্রায় একশ জন বন্দুকধারী ফৌজ। তারা আমাদের ঘরের তালা খুলে সব মেয়েগুলোকে লরীতে উঠতে বললে। আমরা তাই-ই করলাম।

তারপর – অনেকক্ষণ পরে আমাদের একটা নদীর ঘাটে নিয়ে এসে জাহাজে উঠতে বললে। আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের আর এ দেশে রাখা হবে না, বিদেশে চালান করা হচ্ছে আমাদের –!

তারপর –?

আমি তখন সেই তদারককারী অফিসারটির পাদুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, সাহেব এই ক্যান্টনমেণ্টে আমার ছেলে আছে। দয়া করে আমায় অন্ততঃ এইখানে রাখুন। সাহেব কিন্তু নারাজ।

তারপর কি হল?

সাহেবকে তখন সেই অফিসারটির নাম করে বললাম, তাকে একটা টেলিফোন করে ডেকে দিন। তিনি যদি এখানে থাকার অনুমতি না দেন তাহলে আমি জাহাজে উঠব। অফিসারটি সেদিন আমায় খুবই দয়া করেছিল। বর্ত্তমানে যে আমার রক্ষক, সে বলেছিল – আমার ঘরে স্ত্রীর মতই থাকতে হবে। আমি বলেছিলাম 'থাকব'।

মেয়েটির এই সমস্ত কথার পরব লায়লা বললে, ভালই করেছ। বাঙলার মাটিতে অন্ততঃ থাকতে পেলে। বাকী মেয়েগুলো হয়ত এতদিনে পশ্চিম পাকিস্তানে এক একজন জল্লাদের বেগম হয়ে নির্যাতিত জীবন যাপন করছে, হয়ত কেউ কেউ আবার মরবার সুযোগও পেয়েছে। যাকগে ওসব কথা। আমি এখন চলি, আমার স্বামী দেবতাটি গাড়ীতে বসে রয়েছে। তোমার সঙ্গে আবার আমার একদিন দেখা হবে। এই বলে লায়লা ওঠার উপক্রম করতেই মেয়েটি আবার বললে, আপনি তো আমার কথা সবই শুনলেন। কিন্তু আপনার কথা তো কিছুই বললেন না?

লায়লা বললে, তাইতো! আমার কথা তোমায় কিছুই বলা হ'ল না। এখন আমার হাতে সময় খুবই কম, পরে একদিন এসে সব বলব। তবে যাবার সময় সামান্য একটু বলে যাই – আমি কাঁদতে জানি না – আমি জানি কাঁদাতে, আমি ছাড়তে চাই না – চাই পেতে; আমি ত্যাগ করি না – আমি ভোগ করি; আমি চাই বাঁচতে – বাঁচাতে নয়; আমি চাই জ্বালাতে, জ্বলতে নয় –।

ওদের ধর্ম্মসম্মত বিবাহ না হলেও লায়লা আর জিয়াস বিবাহ হবেই হবে জেনে নিয়েছিল এবং হয়ত এতদিন হয়েও যেতো; হয় নাই তার একমাত্র কারণ যুদ্ধটা। যদিও এটাকে পুরোপুরি যুদ্ধ বলা যায় না – একে এক তরফা গণ-হত্যা এবং শারীরিক, আর্থিক ও বৈষয়িক চাপ সৃষ্টি করে প্রবল ক্ষমতাশালী সরকারের কাছে নিরস্ত্র সহায়-সম্বলহীন জনতাকে বশমানানোর পরিকল্পনা বলা যেতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ গোটা পূর্ব্ববঙ্গের জনতা হার না মানছে এবং মুজিবের নির্দেশ অমান্য করে পাক সামরিক জুণ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করে না বলছে যে তোমরাই আমাদের প্রকৃত প্রভু – আমরা গণতন্ত্র মানি না, আমরা স্বাধীনতা চাই না, আমরা কায়মনোবাক্যে বলছি আমরা তোমাদের তাঁবেদার হয়ে থাকব ইত্যাদি ইত্যাদি-ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে পাকফৌজনের ধ্বংসলীলা চলবেই চলবে – আর তা চলবে বলেই জিয়াস খাঁর বিয়েটাও বৈধমতে হয়ে উঠছে না।

লায়লাও বলেছিল – বৈধতার ব্যাপারে তার ঔৎসুক্য এক বিন্দুও নাই। তার কারণ, সে জানে – মানুষের আসল পরিচয় মনে – বিশেষ করে যেখানে প্রেমের লেন-দেন আছে সেখানে অন্তরের বাঁধনকে বাইরের বাঁধন ছাঁপিয়ে যেতে পারে না। তাই উভয়েই দাম্পত্য জীবনের মুখরোচক পরিবেশ, রচনায় ব্যপৃত হতে না পারায় যুদ্ধটাই যেন ছিল প্রধান কারণ। তাই লায়লা ভেবে চিন্তেই বলেছিল, আজ তারা হনিমুন করবেই। যদিও হনিমুন অর্থাৎ মধুচন্দ্রিকা বলতে এমন একটা জিনিষ বোঝায় যা যৌবনের তরঙ্গে ওর ছোঁয়া লাগলেই উত্তাল উদ্বেলিত হিল্লোলিত – সুখ সাগরের সফেন তরঙ্গমালা ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। ঐ কথাটার নাম শুনলেই মনটা যেন একটুখানি আন্চান্ করে। কিন্তু যেখানে জীবনের গতি সীমিত এবং রূপায়িত – যেখানে সেই অল্পপরিসর জায়গাতেই সেই রকমই মধুচন্দ্রিকা করতে হবে বই কি!

তাই-ই তো লায়লা হনিমুনের প্ল্যানটা ঠিক করেছিল আর জিয়াস তা এ্যাপ্রুভ করেছিল তাই সন্ধ্যার সময় যাবতীয় ভ্রমণপর্ব্ব সারা হওয়ার পর লায়লা যখন বলেছিল জিয়াস – এই যুদ্ধটার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সবই তোমায় বিশদভাবে বলতে হবে – এবং আজ আমাদের জীবনের মধুর লগনের মধুচন্দ্রিমাকে সুস্বাগতম্ জানাতে হবে, এবং এর পরেই হবে আমাদের নৌযাত্রা – যাতে আমাদের জীবনের আনন্দ, আতিশ্যয্য পুতপ্রেমের পবিত্র রূপায়ণ সবকিছু যেন ভরপুর হয়ে থাকবে – জীবন হয়ে উঠবে মদিরাচ্ছন্ন, বসন্তের অন্তঃরাগ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠবে জীবন বীণায়। জিয়াস! আমার মনে হচ্ছে কি জান – আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আজ তোমার বুক থেকে আমার মাথাটা একবারও তুলব না। তোমার বুক থেকে আমি মাথাটা ক্ষণিকের জন্যও সরিয়ে নিলে আমার সেই মুহূর্ত্তটাই যেন লস্ হয়ে যাবে জিয়াস! এই বলে লায়লা সানন্দে জিয়াসকে একবার আলিঙ্গন করেই বলল, আমি আজ নিজে হাতে তোমায় খাওয়াব।

লায়লা তাই-ই করেছিল। জিয়াস খাঁকে প্রচুর মদ্যপান করিয়ে নিজের কোলের উপর তার মাথাটা রেখে হাত বুলুতে বুলুতে বলেছিল, প্রিয় –! এইবার বল, যুদ্ধের ইতিহাসটা। লায়লার এই কথায় মদ্যপায়ী বলেছিল, তবে শোন – ।

সত্যিকথা বলতে কি জান লায়লা, পিয়ারী লায়লা – মেরী জান – লায়লা – এই যুদ্ধটা আমরাও – ঠিক চাই না। এটাকে কি যুদ্ধ বলা যায়? যুদ্ধ করব কার সঙ্গে? মুক্তিফৌজের সঙ্গে? কোথায় সেই মুক্তিফৌজ? যে মুক্তিফৌজ আমাদের সামরিক বাহিনীর সামনে আসতে সাহস পায়না – যাদের না আছে অস্ত্র, না আছে ট্যাঙ্ক, না আছে জাহাজ, এরোপ্লেন, মোটর ইত্যাদি; তারা কি নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? যুদ্ধ করতে গেলে যা যা প্রয়োজন তার কি কিছু মাত্র আছে মুক্তিফৌজের? নাই – তার কিছুই নাই। তবু তারা যুদ্ধ করছে – সামনে নয় পিছনে, গোপনে। হয়তো তারা যুদ্ধ করবে নয়তো বা করবে না। আমার ধারণা ওরা যুদ্ধ করতে পারবে না। তার কারণ যুদ্ধ করতে গেলে সামরিক সরঞ্জামের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। কিন্তু ওরা তা পাবে কোথায়? কোন দেশই ওদের তা দেবে না, আর দেবে না বলেই ওরা হার মানবেই মানবে। তুমি তো শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী মেয়ে! তুমি তো এটা সহজেই অনুমান করতে পার, একটা জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে গেলে তার মনোবল যতটা প্রয়োজন তা থেকেও বেশী প্রয়োজন 'আর্মস্ এ্যাণ্ড উয়্যেপন্স' এর। এ যুগে শক্তি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না – আর পারবেও না। এখন কথা হচ্ছে আওয়ামী লীগ একচেটিয়া ভোটাধিক্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহিয়া যখন তাকে ক্ষমতা হস্তান্তরে নারাজ হল তখনই মুজিবের ভাবা উচিত ছিল – ক্ষমতার প্রয়োজন।

মাই ডারলিং লায়লা! ভাবতো একবার এর ভিতর কি লুকিয়ে আছে? একটা পাঁচ বছরের শিশু, সেও এটা সহজেই অনুমান করতে পারে যে ন্যায়, নিষ্ঠা এবং সততার যুগ আর নাই, আর তা নাই বলেই ইয়াহিয়া-ভুট্টোর পরামর্শে মুজিবকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং নির্দেশ দিল 'ক্র্যাশ্ বেঙ্গল'!

ইয়াহিয়া তার অনুগত সৈন্যবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে ইস্তাহারে বলেছিল :–

"আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা – পাকিস্তানের গর্ব, পাকিস্তানের সম্পদ প্রিয় জওয়ানেরা, আজ তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি – আমাদের দেশের কথা, আমাদের মুশ্লিম ধর্ম্মের কথা, আমাদের আল্লার কথা। দেশ, ধর্ম, আল্লা সবই আমাদের অতি প্রিয়, অতি সুন্দর, অত্যন্ত ভালবাসার। সেই ধর্ম, সেই দেশ, সেই আল্লাকে যারা বিনষ্ট করতে চায় – তারা আমাদের শত্রু, তারা আমাদের দেশ ও জাতির শত্রু, তারা আমাদের ধর্মের শত্রু, আমাদের আল্লার শত্রু।

দেশ দশ ও জাতির শত্রুকে আল্লা কখনই ক্ষমা করবেন না – করতে পারেন না। তাঁর হাতে রয়েছে তুলাদণ্ড। সেখানে ন্যায় অন্যায় মেপে বিচার করা হয়। যারা অপরাধী, যারা আল্লার শত্রু তাদের ক্ষমা করা হবে না, হয় না – হতে পারে না।

আমরা যদি মাত্র পাঁচশো বছর পিছনে চলে যাই, তা হলে কি দেখব? দেখব এ দুনিয়াকে শাসন করেছে মুশ্লিম, আমাদের অন্তরের আল্লা। তাই মুশ্লিম চির অমর, চির অক্ষয়।

কিন্তু আজ কি হচ্ছে? দেশোদ্রোহী, রাজোদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী শয়তান মুজিব – আমাদের প্রিয় আল্লার শত্রু। সে চেয়েছিল, আমাদের এই সোনার দেশটাকে কাফেরদের হাতে বিকিয়ে দিতে। ও ক্ষমতা পেলেই গোটা দেশটাকেই হিন্দুস্থানের কাছে বিকিয়ে দেবে। আমাদের আমরণ শত্রু, যুগযুগান্তরের শত্রু কাফেররা চায় আমাদের ইসলামকে ধ্বংস করতে – গোটা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে – আমাদের আল্লাকে ধ্বংস করতে।

কিন্তু তা কি আমরা দেব? আমাদের মুজাহিদরা, জওয়ানেরা কি তাই দেবে? কখ্খনো না। গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমরা কাফেরদের কাছে বিকিয়ে যাব না – আমাদের দেশকে বিকিয়ে দিতে দেব না, আমাদের মা, ভগ্নীদের ইজ্জত লুঠ করতে দেব না। আমাদের অমিত বিক্রমশালী জওয়ানরা মেরে কাফেরদের হাড় গুঁড়িয়ে দেবে – এ বিশ্বাস আমার আছে।

তোমাদের আরও কিছু বলতে চাই। আমি জানি আমার সৈন্যরা দেশ ও জাতির জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত এবং আমরা আজ এমন দুর্ভেদ্য ও প্রশংসনীয় রণসাজে সজ্জিত – পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে আমাদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বে।

আমাদের আরও তৈরী হতে হবে, এবং আমরা ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করব না যতক্ষণ না সমগ্র দুনিয়ার বুকে মুশ্লিম শাসন কায়েম হচ্ছে। এ আমার কথা নয় – এ আমার আল্লার কথা, আমার মুশ্লিমের বাণী। আমরা শাসকের জাত – শাসন করতে জানি, শাসিত হতে নয়। তাই বলছি – ভাই সব! তোমরা এই বেইমান বাংলাকে শিক্ষা দাও – ধ্বংস করে দাও, ওদের শয়তানির হাত গুঁড়িয়ে দাও; লুঠ করে নাও ওদের ধন-মান-জান সবকিছু! 'ক্র্যাশ্' –! 'ক্র্যাশ্ বেঙ্গল' –!

তোমরা পাকিস্তানের গর্ব্ব। তোমাদের হাতে ক্ষমতা অপরিমেয়। এই শয়তান জাতটাকে এমন শিক্ষা দাও, যেন সে একদম পঙ্গু হয়ে যায় – আর কোন দিনই বেইমানি করতে না পারে!

আমার হাতে সময় খুবই কম। তাই আজ আমি আর কিছু বলতে চাই না। আবার দেখা হবে – বাংলা দেশ জয় করার পর, – আমি নিজে তোমাদের অভিনন্দন জানাব। বিদায়!"

জিয়াস খাঁ এই কথাগুলো বলে একটু দম নিয়ে আবার বলল, লায়লা – তুমি লায়লা নও, রোজি – রোজ-থেকে রোজি। তুমি তো গোলাপের মতই সুন্দর। যেমনি সুন্দর তেমনি মনোহর।

লায়লা বলেছিল – বেশ তো, তোমার যা ভাল লাগে তাই-ই বলবে। এই বলে লায়লা জিয়াসকে আরও মদ খাইয়ে দিয়েছিল।

লায়লা এই কথায় মদ্যপ জিয়াস প্রচণ্ড হাসির তরঙ্গে গোটা ঘরখানি যেন ফাটিয়ে তুলল।

লায়লা তখন তাকে আরও আদর করে বলল – জিয়াস আজ যে আমাদের 'হনিমুন্'!

'ড্যাম্ ইওর হনিমুন'! আগে শুনবে তো – আমাদের জেনারেল কি বলেছে – ।

লায়লা বলল – বল।

জিয়াস বলল – জান লায়লা, ইয়াহিয়ার সাকরেদ আমরা, গুরুর কথা মেনে চলি। বাংলার সম্পদ, বাংলার নারী – বাংলার সবকিছু ভোগ করার জন্য আমরা এসেছি – আমরা ভোগ করব। আমাদের ফৌজরাও তো তাই করছে, এর বেশী কিছু নয়।

এই কথাগুলো বলে মদ্যপ জিয়াস আর খানিকটা মদ খেয়ে নিয়ে আবার বলল, জান লায়লা – তুমি কিন্তু বাঙ্গালী নও। তোমার মত মেয়ে কি কখনও বাংলা দেশে জন্মায়? বাজে কথা। তোমার পূর্ব্বপুরুষরা নিশ্চয়ই অবাঙ্গালী ছিল। তা না হলে এমন মেয়ে হল কেমন করে?

লায়লা জিয়াসের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, তা হয়তো হবে – ।

হয়তো কেন –? হয়তো কেন –? নিশ্চয়ই তুমি একটা লোটাস – 'পদ্ম!' পদ্মতো পাঁকেই জন্মায়। পাঁক কত নোংরা জিনিষ, আর পদ্ম কিনা তাতেই জন্মায়! ঠিক তেমনি – বাংলার মত নোংরা জায়গায় তোমার মত সুন্দর মেয়ে কি করে জন্মাল বল দেখি লায়লা!

লায়লা বললে, ঠিক বলেছ! কিন্তু এখন তুমি বড্ড ক্লান্ত। একটু খনি পান করে নাও।

দাও! তুমি যত দেবে, আজ আমি ততই খাব। আজ আমাদের হনিমুন! আজ আমাদের অভিধানে একটু আধটু বলে কোন কথা থাকলে চলবে না – আজ প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর হয়ে উঠবো লায়লা – ।

লায়লা বলল, ঠিক বলেছ – ।

ঠিকই তো! আমার একটা কথা মনে পড়ে বড্ড হাসি পাচ্ছে। সে কি জান?

জানি না তো –?

জান না –? না জানালে জানবেই বা কি করে? তবে শোন – আমরা একটা প্ল্যান করেছি, সেটা হচ্ছে মাষ্টার প্ল্যান।

কি রকম –?

তা বলব না – । আগে এক গেলাস ব্রাণ্ডি দাও – তার পর আর একটা জিনিষ দাও। সেটা কি বলতো?

জিয়াসের কথায় লায়লা যেন থতমত খেয়ে গেল। সে জিয়াসের হাতে মদের গেলাসটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, পারলাম না – ।

জিয়াস মদের গেলাস হাতে নিয়ে লায়লার কথায় হো হো করে হেসে উঠল। প্রবল হাসিতে তার শরীরটা তরঙ্গায়িত হতে লাগল – আর মদের খানিকটা চল্‌কে পড়ে গেল প্যাণ্ট জামা আর বিছানায়? সে হাসি থামিয়ে বলল, মদ কখনও শুধু খেতে নাই লায়লা! তাই আজ মদের সঙ্গে কি খাব জান তো? তুম –! "কিস্!"

লায়লা বলল, বেশ তো! খাওয়া! যত পার খাও; পেট ভরে চুমু খাও। এই বলে লায়লা তার বিচ্ছুরিত দেহতনুটা তার বুকের উপর এলিয়ে দিল। জিয়াস খাঁ তার মদের গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে দিতেই লায়লা বলল – কিন্তু তোমার সেই মাষ্টার প্ল্যানটার কথা তো বললে না –?

ও – আই সি! সেটা কি জান? সেটা হচ্ছে – আমরা এখান থেকে জেনানাগুলোকে নিয়ে যাব আমাদের দেশে। সেখানে আমরা ওদের গর্ভে প্রজনন করব একটা জেনারেশন্‌। তারাই হবে ওয়েষ্ট পাকিস্তানের ‘স্লেভ্‌’।

লায়লা বলল – কি সুন্দর প্ল্যান! এর জন্যে আমি তোমায় আর একটা কিস্‌ উপহার দিচ্ছি।

জিয়াস বলেছিল – তোমার বুদ্ধি তুলনাহীন।

দ্যাৎ –! এ সব কথা ভাল নয়।

কেন – কেন, ভাল নয় কেন?

কেন আবার! আমার এসব একদম ভাল লাগে না – তাই!

জিয়াস বলল, না–না–লায়লা, আজ যে ভাল লাগতেই হবে। আজ আমাদের ‘হনিমুন’। ভালতে ভালতে আজ সব ভরিয়ে তুলতে হবে –! আচ্ছা লায়লা, বলতো – আমরা কি হলে আরও ভালো হত?

জিয়াসের কথায় লায়লা বলল, বলব – ? টিয়ে পাখী।

হ’ল না –

ফিঙে –

হ’ল না –

বাদ্‌শা আর বেগম –?

হ’ল না –

তবে কি বলতো? কপোত-কপোতী – ?

তাও হল না –?

তবে কি গো? এই বলে লায়লা একটু ভেবে চিন্তে নিয়ে বলল – বলব? ভ্রমর!

হ’ল না – হ’ল না – । এই বলে জিয়াস বলল, আগে একটু ব্রাণ্ডি দাও তবে বলব। লায়লা এক গেলাস ব্রাণ্ডি জিয়াসের হাতে দিল। তখন জিয়াস চিৎকার করে উঠল – আবার –?

লায়লা যেন থতমত খেয়ে গেল। সে তার ভুলটা কি হ’ল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসুনেত্রে জিয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জিয়াস তখন হেসে উঠল। বলল, তোমায় বলেছি না – খালি পেটে ব্রাণ্ডি খেতে নাই।

তাই তো –! আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে, এই বলে লায়লা সহাস্যে জিয়াসের বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

জিয়াস তার কপোল চুম্বন করে গেলাসের মদটা শেষ করে বলল, এইবার বলব –?

বল –

তুমি পারলে না তো?

কই আর পারলাম!

আর একটু না হয় ভেবে চিন্তে বল – ।

তখন লায়লা আর একটু ভেবে নিয়ে বলল, প্রজাপতি – ।

জিয়াস লায়লার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বলল, এবারও হ'ল না।

তবে –? তবে-ছারপোকা –!

ছারপোকা –? সে আবার কি জিনিষ?

লায়লা বলল – আরে ছারপোকা কি জিনিষ জাননা? ছারপোকা মানে 'খাটমল,' ইংরাজীতে যাকে বলে 'বাগ'। জান জিয়াস, ওদের মিঞা আর বিবিতে খুব ভাব। তাই প্রতিদিন ওদের সাতবার করে বাচ্চা হয়।

তখন জিয়াস হো হো করে হেসে উঠে লায়লার পিঠ চাপড়ে বলল, খুব ভাল বলেছ। আমার মনে হয় তোমারটাই ভাল হয়ে গেল।

তার মানে –? তুমি অন্য কিছু ভেবেছিলে নাকি?

তা ভেবেছিলাম বৈকি –?

কি ভেবেছিলে – শুনি –?

তখন জিয়াস বলল – ব্যাঙ্! কুনো ব্যাঙ্! ওদের স্বামী স্ত্রীতে খুব ভাব; দিনরাত গায়ে গা লাগিয়ে থাকে মাটির তলায়। ওদের কেউ মারতে পারে না।

লায়লা তখন বলল – ঠিক বলেছ। তোমারটাই ভাল হয়েছে। কিন্তু আমাদের হনিমুনের যে সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চল – আমরা এখন নৌ-বিহারের জন্যে গা-তুলি!

চল –! ব্রাণ্ডির বোতলটা যেন সঙ্গে নিও।

সব কিছুই নিয়েছি। এই বলে লায়লা ওর হাত ধরে ধীরে ধীরে নীচেয় নামিয়ে নিয়ে এলো এবং জিপে তুলে ষ্টার্ট দিল। ওরা নদীর ঘাটে এসে অপেক্ষমান একটা মোটর লঞ্চে উঠে দু'জনার গুনগুন করে গান করতে করতে ষ্টার্ট দিল হনিমুনের উদ্দেশ্যে।

লায়লাকে জিয়াস খাঁ বলেছিল, জান পিয়ারী, মেরী জান্ – এইসা সোচবিচার হামেসা হোতা হ্যায় – ইয়ে লড়াই, মেরা সার্ভিস, এ দুনিয়াকা সব কিছ ছোড়কে উঁও দূর আসমানমে চলা যায়গা, সাথমে রহোগী তুম্ –! আউর কোই নেহি – বিলকুল একেলী তুম, আউর হাম্। আউর রহেগা উঁও চাঁদ আউর চাঁদনি – হামারা গোদমে রহেগী মেরী জান্, মেরা চাঁদ – তুম্! আউর পাশমে রহেগা আসমানকা উঁও চাঁদ –!

জিয়াসের কথায় লায়লা বলেছিল – এখন দেখছি তুমি একটা মস্তবড় যোদ্ধাই শুধু নও, তুমি – প্রাণবন্ত, জীবন্ত প্রহেলিকা – । আমার ধারণা ছিল তোমাদের ঐ 'সাফি' আর 'প্যাটন' ট্যাঙ্কের মতই তুমি একটা কঠিন পদার্থ। জান 'ডারলিং' জিয়াস – আমি ভাবতাম, এই পাক সামরিক জুন্টাটা বুঝি বিলকুল পাত্থর হ্যায়, পাত্থর। পরে বুঝলাম, না –! এই জুন্টারও হার্ট আছে, ইমান আছে, ঔদার্য আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে – আর আছে সখ আর সাধ। সুন্দর –! আমারা যে কি ভাল লাগে তা তোমায় কি করে বোঝাব জিয়াস-!

লায়লার কথায় মদ্যপ জিয়াস মদের ঘোরে অর্দ্ধনমিত নেত্রে লায়লার দিকে তাকিয়ে বলেছিল – তুম্ দূর মাৎ রহো! তোমার ঐ সুন্দর কথাগুলো আমার কোলে শুয়ে শুয়ে বল না 'ডারলিং' লায়লা।

লায়লা চলন্ত মোটর বোটের দোলায় দুলতে দুলতে টলতে টলতে এসে অর্দ্ধশায়িত জিয়াসের কোলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলেছিল, জিয়াস – আজ আমাদের হনিমুন! আমি চাই আজ আমাদের এই জলবিহারের সঙ্গী যেন আর কেউই না রয়। 'ইভ্‌ন দি ড্রাইভার অল্‌সো – ।'

লায়লার কথায় জিয়াস বলেছিল – 'হোয়াট্' –?

'লায়লা বলেছিল – হোয়াট্ মোয়াট্ নয় জিয়াস্ –! আজ তুম আউর হাম, রহেঙ্গে। আউর কোই নেহি – আউর কোই নেহি –!

জিয়াস বলেছিল – এইসা কেইসে হোগা?

হোগা জিয়াস, হোগা –! হাম খোদ ড্রাইভ করেংগে। তুম রহেগা – মেরা পাশ, আউর রহেগা আসমানকা উঁও চাঁদ – নদীকা পানিমে রহেগা আসমানকা উঁও তার্‌কা –! সব তারে নাচেগা, গাহেগা, চাঁদভি নাচেগা – আউর তুম অর হাম এক হো যায়গা – বিলকুল এক – দো নেহি!

লায়লার এই কথায় জিয়াস মদের গেলাসে আর একটু চুমুক দিয়ে বলেছিল, ঠিক বলেছ! তুম সাচ্ বাতায়া! আভি ড্রাইভার কো হাম ভেজ দেতে হে –!

জিয়াস খাঁ তাই করেছিল। ঐ লঞ্চে আর কেউই ছিল না। লায়লা নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে বহুদূর চলে গিয়েছিল! চলতে চলতে লঞ্চটা যেন কি রকম গোলমাল করছিল – ইঞ্জিনটা বড় বেইমানি করছিল, সে আর ষ্টার্টই নিচ্ছিল না। তখন লায়লার কথায় জিয়াস মেঘনার অববাহিকার এক প্রান্তে নোঙ্গর করে বলল, এইবার –! এইবার কি হবে লায়লা?

লায়লা বলেছিল – তুম্ সোচো মাৎ জিয়াস। আমাদের আল্লা আমাদের রক্ষা করবেন।

জিয়াস বলল – ঠিক বলেছ। কিন্তু এখন যদি মুক্তি ফৌজরা আসে?

এলে কি হবে? আমি তাদের ঠিক অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দেব। মানে 'রিডাইরেক্ট' করে দেব।

জিয়াস বলেছিল – সুন্দর! 'ইউ আর রাইট!'

লায়লা বলল তবে তুমি এক কাজ কর। মিলিটারী ড্রেসটা খুলে সাধারণ পোষাক পর। যদি তারা আসে তা হলে আমরা মুক্তি ফৌজ বলেই পরিচয় দিতে পারব এবং তাদের বোঝাতে পারব। তুমি আর একটা মুহূর্ত্তও নষ্ট কোর না, আজ আমাদের হনিমুন – আজ আমরা রাত ভর আনন্দ করব।

লায়লার কথায় জিয়াস খাঁ – আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল এবং মিলিটারী পোষাক পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র আণ্ডারওয়্যারটা পরে রিভলভারটি হাতে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'ইট ইজ অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারী ফাইন নাইট' লায়লা।

লায়লা বলল – 'নট ওনলি ফাইন, দি ফাইন!' জান জিয়াস – আজ আমাদের রবি ঠাকুরের একটা কবিতা আমার মনে পড়ছে।

জিয়াস বলল – শুনেছি! 'ওয়ার্লড পোয়েট'! 'বাট হি ইজ ব্যাণ্ড ইন পাকিস্তান'।

হ্যা! কিন্তু তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি কবিতাটা বলি।

জিয়াস বলল সার্টেনলি –! তুমি সেই টেগোরের একটা বিউটিফুল পোয়েট্রি রিসাইট করে হনিমুন ষ্টার্ট কর।

তখন লায়লা বলেছিল, 'লেট মি হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক এট ফাষ্ট – এণ্ড টু অফার ইউ এণ্ড দি হনিমুন বি ষ্টার্টেড্!'

লায়লার কথায় জিয়াস বলেছিল – জোভ্ –! জোভ্ –! ফাইন প্রোগ্রাম –!

তখন প্রচণ্ড শক্তিশালী পাঠান বীর জিয়াস খাঁ – প্রচুর মদ খেয়ে চুর হয়ে এবং লায়লাকেও কিছুটা মদ খাইয়ে উভয়ে এসে লঞ্চের ডেকে বসল এবং লায়লাকে এক হেঁচকা টানে কোলের উপর টেনে নিয়ে এবং বিভলভারটা পাশে রেখে দিয়ে বলল, 'নাউ ডেসক্রাইব ইওর টেগোরস্! আই এক্সপেক্ট দ্যাট্ ইউ উইল বি এবল্ টু স্কেচ্ ইওর টেগোর ইন মাই হার্ট।'

লায়লা বলেছিল, নিশ্চয়ই! আমি জানি ফিলজফি চিরন্তন সত্য, তেমনি সত্য আমাদের টেগোর, তা থেকেও বেশি সত্য আমার কাছে তুমি।

লায়লার কথায় জিয়াস কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারল না। ঠিক তেমনি লায়লাও আর একটা কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারল না। তার যেন কেবলই ছন্দপতন হচ্ছিল। আণ্ডারপ্যান্ট পরিহিত প্রায় নগ্ন মাতাল জিয়াসের দৈত্যের মত চেহারাখানা, তার জঙ্গী চরিত্রের – জঙ্গী মনোভাব ও জিদ, এবং পাশেই লোড্ করা রিভলভারটা বারংবার দেখতে দেখতে লায়লা যেন যা কিছু বলার আর করার সব খেই হারিয়ে ফেলেছিল। তাই সে নিজেকে সংযত ও সীমায়িত করে আবৃত্তি করল –

"..

এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি –

ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর ক্লান্ত নমস্কারে

বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে॥"

জিয়াস তখন উন্মাদের মত সহসা চীৎকার করে বলল, 'ডাম ইউর টেগোর –! নাউ, আই সি ফর দিজ ইওর টেগোর ইজ আনওয়ান্টেড ইন পাকিস্তান। আওয়ার গভর্ণমেন্টস্ জাজমেন্ট ইজ ভেরি কারেক্ট।

জিয়াসের এই কথায় লায়লা তখন যেন চুপসে গেল – সে আর্ত্তের মত শুষ্ক গলায় বলল, তবে তুমিই যে কোন একটা ভাল কবির বয়েৎ আওরাও!

লায়লার কথায় জিয়াস হো হো করে হেসে উঠল। তার সেই প্রচণ্ড হাসির শব্দে গোটা নদীবক্ষ যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠল, সেই তরঙ্গের রেস্ প্রতিধ্বনিত হয়ে নদীর অববাহিকায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। তখন জিয়াস সহসা হাসি থামিয়ে বলল, আমি মিলিটারী ম্যান! আমি যুদ্ধ করতে জানি-কবিতা জানি না। আমি মারতে জানি-ধ্বংস করতে জানি, কিন্তু গড়তে জানি না-মরতে জানিনা-। তুমি 'বিউটিফুল ইয়ং গার্ল।' তুমি ফিলজফি জান, তুমি গান জান, তুমি নাচ জান, তুমি বয়েৎ জান, তাই আমি তোমায় ভালবাসি। আমি শুধু যদি আমার যৌবনের খোরাক হিসাবে তোমায় পেতে চাইতাম – তাহলে তোমার সঙ্গে আজ আমি এই মধুচন্দ্রিমায় বেরোতাম না, মিলিটারী পোষাক ত্যাগ করতাম না, ক্যান্টনমেন্টে গাদাগাদা সুন্দরী যুবতী থাকতে তোমার পিছনে ছুটতাম না। তবে-? এই বলে জিয়াস খাঁ পাশে রাখা রিভলভারটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে আবার বলল, 'ইউ ষ্টার্ট ইওর হনিমুন!'

লায়লা তখন বলল, ঠিক আছে! আমায় তুমি আর একটু ব্রাণ্ডি দাও – তুমিও একটু খাও! তারপর! – ইউ ফলো –!

এই বলে লায়লা এক চুমুক মদ খেয়ে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে সেই উন্মুক্ত ডেকের উপর একটা গান ধরল –

"কাঁহাসে আয়া ম্যায়, কাঁহা জাউঙ্গী –
কৌন রহেগা সাথ, কৌন ছোড়েঙ্গে –
কেইসে কেয়া হুয়া, হোতা হ্যায়
আউর হোঙ্গে।"

উন্মুক্ত ডেকের উপর মদ্যপ অর্দ্ধশায়িত জিয়াস অর্দ্ধনমিত নেত্রে লায়লার সুমিষ্ট গানের রেশে – যেন বুঁদ হয়ে পড়েছিল। ও তখন ভাবছিল, 'লায়লা এ জিনিয়াস গার্ল! মাই বিলাভেড্ লায়লা –! ওয়ানডারফুল লায়লা – মাই হেভেন্‌লি লায়লা –!'

নিস্তব্ধ নীরব রজনীর সাথে মন্দ-মন্দ প্রবাহিত বাতাসের স্নেহসিক্ত করখানি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে মধুর শিহরণ এনে দিচ্ছে। নিষ্প্রভ চন্দ্রিমার কোমল চন্দ্রাতপ যেন সুসুপ্ত ধরণীতে চন্দন লেপন করে মাধুরী মণ্ডিত করে তুলছে। নিদ্রিতা তটিনী লায়লার গানের রেশে সুপ্তোত্থিতা হয়ে উঠে উৎকর্ণে আর একটু শোনার নেশায় যেন মাতাল হয়ে পড়েছে। অস্পষ্ট দিগ্বলয়ের গায়ে ঘা খেয়ে খেয়ে লায়লার মধুর কণ্ঠ যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে গোটা নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়ছে। আর সুরের আবেশে, মদের নেশায়, উৎকট্ আনন্দের আতিশয্যে-ভাবাবেগে সমাচ্ছন্ন জিয়াস যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল। তার অন্তরের অন্তঃস্থলে লায়লার সেই সুরের রেশ – 'কাঁহাসে আয়া ম্যায়, কাঁহা জাউঙ্গী' – এই মধুর স্বরলিপি বার বার, লক্ষ বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে তাকে বিবশ করে তুলেছিল। হয়ত তার একটু তন্দ্রাও এসেছিল। তার যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন তার আর কিছুই করার ছিল না। সে চোখ খুলে দেখল, লায়লা তার সেই সুমধুর স্বর্গীয় সঙ্গীত বন্ধ করে তারই সামনে তারই সেই রিভলভারটা ধরে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর সে –? তার বুকে যেন একটু ব্যথা, ফিচ্ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে – সে যেন লায়লার স্বর্গীয় সঙ্গীতের মূর্ছনায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছে।

কিন্তু লায়লা যে কখন তার গান থামিয়েছে – তারই পাশের রিভলভারটা তুলে নিয়েছে – কখন যে সে গুলি ছুঁড়েছে – জিয়াস তার একবিন্দুও বুঝতে পারে নাই। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে সে চোখ খুলল, তখনও সে স্বরমাধুর্য্যে মূর্ছিত। জিয়াস লায়লার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বলল, 'তুমি অত দূরে কেন লায়লা! তুমি আমায় একটু ঘুম পাড়াও!

জিয়াসের এই কাতর প্রার্থনায় লায়লা যেন ককিয়ে উঠল। সে শান্ত ও ভিজে গলায় বলল, আজ আমি সব ভুলে গেছি জিয়াস। তোমায় ঘুম পাড়াতে এসেছি – ঘুম পাড়িয়েছি; আমি এর বেশী আর কিছু – আর কিছু জানি না জিয়াস!

জিয়াসের অর্দ্ধনমিত মাথাটা তখন যেন গড়িয়ে পড়ল ডেকের উপর। সে অতি কষ্টে মিলিটারী কায়দায় লায়লাকে বলল – 'ডারলিং লায়লা'! আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না – ! আ-দা-ব-!

এই বলে জিয়াস যেন ঘুমিয়ে পড়ল। তার বুক থেকে তাজা রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়াটা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন এক বোতল কালি উপুড় হয়ে পড়ে গেছে – আর তা চালু মেঝের দিকে সরুরেখার মত গড়িয়ে যাচ্ছে। লায়লা কতক্ষণ যে ওমনি ধারা স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ছিল তা বলা যায় না। জিয়াস যেন আজ ঘুমিয়ে রয়েছে – অমন ঘুমে ও অনেক দিনই ঘুমিয়ে থাকত তার প্রমোদ কক্ষে, মদের ঘোরে। এ-ও যেন সেই আগেকার মতই ঘুমে ঘুমোনো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিয়াসের তাজারক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে ডেকের পাটাতনের উপর ছড়িয়ে লায়লার পাদস্পর্শ করল – তখন তার চেতনা ফিরে এলো। সে তড়িতাহতের মতই চম্‌কে উঠল এবং রিভলভারটা নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠল, জি-য়া-স –!

নির্জন নদীগহ্বরে বিভীষিকাময় নিশীথের নির্জনতায় তার সেই সভয় চিৎকার – 'জি-য়া-স–!' যেন কম্পিত প্রকম্পিত হয়ে তারই কর্ণকুহরে ফিরে আসতে লাগল বারংবার। সেই রক্ত ধারার স্পর্শ হতে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সে সভয়ে পিছিয়ে গেল এবং দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল 'বাবা-গো' – বলে। তার সেই কান্নার, ফোঁপানির শব্দ – আবার যেন শতগুণ প্রতিধ্বনিত হয়ে তারই কর্ণবিবরে প্রবেশ করতে লাগল মুহুর্মুহু। লায়লা এমনি ধারা কতক্ষণ যে কেঁদেছে – সে নিজেই তা জানে না। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে – তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। তার সম্বিৎ ফিরে আসার পর সে মুখ তুলে দেখল – কাক জ্যোৎস্নায় পূবের আকাশটা যেন সামান্য সাদা হয়ে আসছে ভোর হয়ে আসার মত – দু-একটা পাখীও উড়ে যাচ্ছে ইতস্ততঃ। এই দৃশ্যে লায়লার যেন সম্বিত ফিরে এলো। তখন তার মাথায় যেন দুনিয়ার ভাবনা চিন্তা জট পাকাতে লাগল। অস্পষ্ট অন্ধকারে ভূ-লুণ্ঠিত জিয়াসের দেহটা পড়ে রয়েছে প্রলম্বিত। জিয়াস মৃত না সুসুপ্ত এটা যেন ও কিছুতেই ঠাওর করে উঠতে পারছিল না। লায়লা নিজে হাতে গুলি করে জিয়াসকে খুন করেছে – এ কথাটা যেন ওর কিছুতেই মনে পড়ছিল না। আজকে সে যে মধুচন্দ্রিকায় এসেছিল জিয়াসেরই সঙ্গে – মিলিটারী মোটর বোটে – এও যেন তার কিছুতেই মনে পড়ছিল না। কিন্তু আকাশের ভুলকো তারার ছটায় জিয়াসের মৃতদেহটার বীভৎসতা তার সামনে আরও মারাত্মক বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠ্‌ছিল।

লায়লা নিজে কোন দিনই মানুষ খুন করে নাই। খুন করা তো দূরের কথা মানুষ যে কেমন করে মরে আর মরার সময় কেমন যন্ত্রণা ভোগ করে এবং তার দেহটা কত বিশ্রী ও বিকৃত হয়ে পড়ে – তা তার আদৌ জানা ছিল না। জানা তো দূরের কথা – ভাবতেও পারত না। তাই রক্তাপ্লুত জিয়াসের সেই বিকৃত মৃতদেহটা দেখতে দেখতে লায়লার মাথাও যেন বিকৃত হওয়ার উপক্রম হ'ল। লায়লা ভাবতে লাগল, এইবার – ? এরপর আমি কি করব? আমার কাজ তো সব শেষ! তবে –?

এই 'তবে-র' উত্তর কে দেবে –?

তাহলে লায়লা কি জিয়াস খাঁকে মারার জন্যেই ক্যান্টনমেন্টে গিয়েছিল?

ঐ প্রচণ্ড শক্তিশালী পাকজুন্টার মাঝখান হতে নামকরা অত্যাচারী কয়েকটা অফিসারকে হত্যা করে – লায়লা তার মা-বাবা-বোনকে খুন করার ও ইজ্জত কেড়ে নেওয়ার প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল? হয়ত তাই-ই হবে।

কিন্তু তার পর –? ওর গর্ভে যে রয়েছে অজ্ঞাত পিতার কলঙ্কিত সন্তান! এখন ও কি করবে –?

লায়লা ভাবতে লাগল তার ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু অস্পষ্টালোকে জিয়াসখাঁর বীভৎস চেহারাটা তার চোখের সামনে পড়ে থাকতে দেখে সে যেন পাগল হয়ে উঠল। সে তখন 'মাগো' বলে নদীতে ঝাঁপ দিল।

পনের

নীরব নিস্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম রজনী শশীকলার মন্দমধুর আবেশে যেন বেদনা বিধুর। হয়তো ভোর হয়েছে কিম্বা হবে। ফিকে চন্দ্রিমার পাতলা প্রলেপে ধরণীরাণী যেন চলেছে গোপন অভিসারে – তার চোখে সন্ত্রাসের আবেশ – একাধারে সম্ভোগের আকর্ষণ, অপর ধারে ধরা পড়ার আতঙ্ক। দখ্‌নে বাতাস সবকিছুরই অনাবরণ বক্ষে হিন্দোলিত হয়ে এক অজ্ঞাত শিহরণের সঞ্চার করে চলে গেল। মদিরাচ্ছন্ন চন্দ্রিমা, পাগলপারা বাতাস, ধলেশ্বরীর উন্মত্ত জলরাশির সঙ্গে কচি কচি বুকের তাজা রক্তের সংমিশ্রণের অস্ফুট আর্ত্তনাদ, দিগন্তব্যাপী ঔদাসীন্যের আড়ম্বর, যেন আবার কি একটা সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠেছিল – তার হিসেব নিকেশ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যে মানুষ এই নিশারাণীর রূপ দেখে নাই তার জীবন ব্যর্থ।

নিশাচর –! মুক্তিফৌজদের কচি কচি হাত গুলোর জন্ম মাত্র তিন মাস। ওরাই এখন নিশাচর। নিশাচর না হয়ে উপায়ই বা কি? পাকিস্তানী স্বৈরাচারী গভর্ণমেন্টের বর্ব্বর ও জবরদস্ত হাত দুটো গুঁড়িয়ে দিতেই হবে, ওর হাড় গোড় ভেঙ্গে চূরমার করে দিতেই হবে – ওর ধারকরা মেসিনারীটাকে ভেঙ্গে বিকল করে দিতেই হবে – এইটাই মুক্তিফৌজদের একমাত্র কামনা। কিন্তু যে সামরিক দৈত্য তাণ্ডবনৃত্য করে এই ধরণীকে রসাতলে পরিণত করেছে ও করছে – সেই জুন্টার সামনে মুক্তিফৌজদের ক্ষমতা ও কার্য্যকলাপ এত নগণ্য যে ওকে ভয় পাবার মত কিচ্ছু নাই। তাই তো দানবের দল রণোন্মত্ত পৈশাচিক বর্ব্বরতায় উল্লসিত। কিন্তু মুক্তিফৌজদের আছে হৃদয়, মুক্তির লালসা, দেশের প্রতি মায়া মমতা। পলিমাটিতে গড়া ওদের জীবন নরম – তেমনি বজ্রকঠিন। ওদের বজ্রকঠিন রূপটা যেন সমাহিত-শান্ত। তাই ওরা দিনের বেলায় থাকে চাষীভূষি, গৃহী, ছাত্র, শিল্পী। আর –? আর রাতের অন্ধকারে যৎসামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই ওৎ পেতে বসে থাকে শিকারের আশায় – ঝোপে ঝাড়ে, জঙ্গলে, নদীর ধারে, জনপদে অথবা জনহীন প্রান্তরে। দিনের আলোয় ওরা অতি সাধারণ মানুষ, আর রাতের অন্ধকারে ওরা মুক্তিপাগল বীর্যবান সৈনিক। তখন ওদের ঐ কচি হাতগুলো যেন লোহার হাত হয়ে যায়।

গোটা পূর্ববঙ্গের এখন যা অবস্থা তাতে গা ঢাকা না দিয়ে উপায়ই বা কি? দিতেই হবে – তার কারণ ওখানে রয়েছে অজস্র মিরজাফর। কেউ আলবদর, কেউবা মুসলিম লীগের সমর্থক, কেউবা রাজাকার – আবার কেউ সুযোগ সন্ধানী। তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য দেশ ও দশকে বিকিয়ে দিতে চায়। তারা মিশে রয়েছে জলে, স্থলে, পথে প্রান্তরে – সর্ব্বত্র। আর মুক্তিফৌজরা হয় মরবে – নয়তো মারবে। এই 'হয়' কিম্বা 'নয়তো' এর উপর নির্ভর করছে – বাংলার আর বাঙ্গালীর নূতন ইতিহাসের নূতন অধ্যায়।

ভোর হয়েছে কিম্বা হবে। ধলেশ্বরীর মন্দ মন্দ বীচিমালার বুক চিরে – তিনটি পাক স্পীড্ বোট্ খাদশস্য ঔষধপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলেছে ফুলবাড়ী ও গাইবান্ধা সেক্টরে। খুবই অল্প সংখ্যক সৈনিক ছিল ঐগুলো আনার জন্য। কিন্তু রাতের অন্ধকারে মানিকগঞ্জের কাছাকাছি এক বিপর্যয় হয়ে গেল। হঠাৎ হাল্কা মেসিনগানের গোলায় দু'খানি স্পীড্ বোটের সলিল সমাধি হয়ে গেল। আর বাকীটি হতে নাবিক এবং প্রহরীরা ভারী চোগা চাপকান জুতো পরেই জলে ঝাপ দিল 'আল্লা' বলে, প্রাণের মায়ায়। দু'চার জন যারা ছিল, তারা হতভম্ব হয়ে ওরই ভিতর আত্মগোপন করার চেষ্টা করতে লাগল।

মহিত, রহিম, আমানুল্লা, পরেশ, মফিজুদ্দীন, জালালুদ্দীন সকলেই তখন বাঁশবন থেকে বেরিয়ে এসে জলে ঝাঁপ দিল এবং ডুব সাঁতারে তড়িৎ গতিতে ভাসমান স্পিডবোটটিতে উঠে পড়ল। প্রহরাধীন পাকফৌজগুলো ভেবেছিল, এরা হয়ত আমাদেরই ফৌজ – নিমজ্জমান বোট হতে এসেছে। ওদের রক্ষা করেই তারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। ওরা এখন ভেবেই আকুল মুক্তিফৌজরা এমন অস্ত্র পেল কোথায়। কিন্তু ওদের অত ভাবনা ভাববার আর অবকাশ মিলল না। মুক্তিফৌজরা নিমেষের মধে পাকফৌজদের নদীর জলে ফেলে দিয়ে স্পিডবোটে ষ্টার্ট দিয়ে ডাঙ্গার ধারে লাগিয়ে বাকী

মুক্তিফৌজগুলোকে তুলে নিল। ঐ সময় ওরা নদীর স্রোতে ভাসমান এক অর্দ্ধামৃতা নারী দেহকে দেখতে পেয়ে ঐ স্পিড্‌বোটে তুলে নিয়ে উজানের দিকে ষ্টার্ট দিল। বোটের উপর পত্‌ পত্‌ করে উড়তে লাগল পাকিস্তানী পতাকা – যাতে ওটা দেখে বিভিন্ন সামরিক ছাউনির ফৌজরা ঐ বোটটিকে বাধা না দেয়।

কিন্তু পাক সামরিক জুণ্টা – দুনিয়ার ধনী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কাছ হতে ধার করা আধুনিক রণসজ্জায় সুসজ্জিত। এই দুর্ঘটনাটার কথা জানতে ওদের বেশি সময় লাগে নাই। সামরিক সঙ্কেতধ্বনির রদবদলে এবং ওয়্যারলেস্‌ সংবাদ আদান প্রদানে ওরা জানতে পেরেছিল এই দুর্ঘটনার কথা। কিন্তু যা ঘটে গেছে – তা আর ফিরে পাবার নয়। এর বদলে বড়জোর এই করা যেতে পারে – ঐ অঞ্চলে ব্যাপক ও বীভৎস অত্যাচার করে মুক্তিফৌজদের বার করা বা তার হদিস পাওয়ার। ওরা তাই-ই করেছিল। বিভিন্ন ছাউনিতে ম্যাসেজ পাঠিয়ে বলেছিল – যেমন করেই হোক, যে ভাবেই হোক, যে কোন মূল্যেই হোক, মুক্তিফৌজদের সন্ধান পেতেই হবে এবং তা নির্মূল করতেই হবে। তাই বিভিন্ন সামরিক ছাউনির ফৌজরা কর্ণেল ইনচার্জের নির্দেশ মত মারাত্মক হিংস্র হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্য্যন্ত ওদের বক্তব্যই ছিল, হয় মুক্তি ফৌজ ও আওয়ামি লীগ দের ধরিয়ে দাও – নয়ত জীবন, মান-সম্ভ্রম এমন কি মেয়েদের ইজ্জত ও ধন সম্পদ সবই ছেড়ে দাও।

গ্রামবাসীরা কেউ কেউ তাই-ই দিয়েছিল – দিতে না চাইলেও দিতে বাধ্য হয়েছিল। কেউ কেউ মুক্তি ফৌজের সন্ধান জানলে বলে দিত, না জানলে ভয়ে আবোল তাবোল হদিস বলে দিত – কেউ কেউ বা মুখ বুজে থাকত, যারা মুখ বুজে থাকত তাদের ললাটে নির্য্যাতন ঘট্‌ত বর্ণনাতীত ও সীমাহীন। আর যারা মুখ খুলত – তাদের লাস্যময়ী যৌবনোচ্ছল নারী ছাড়া আর সবই নিরাপদ থাকত। এক কথায় – এ নির্যাতনের কোন তুলনা নাই – প্রকাশ করার কোন ভাষা নাই, ঐ এক ষণ্ডের অত্যাচার – যার মা-মাসী ভাই ভগ্নী জ্ঞানগম্যি নাই।

তাই স্পিড্‌বোট্‌গুলো হারানোর পর ওরা বড় বেপরোয়া – বড় সাংঘাতিক,নির্মম, অসভ্য হয়ে উঠ্‌ল – এবং গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করে নরহত্যা লুঠতরাজ ও ধর্ষণে ব্যাপৃত হ'ল।

মুক্তিফৌজরা নিরাকার ও নির্বিকার। এই সব অত্যাচারে তাদের যেন কোন পরিবর্তনই হয় না। ওরা যেমন চলেছে – তেমনিই চল্‌ছে, চলবেও। ওদের পণ এক ও অদ্বিতীয়।

সকাল হবার আগেই স্পিড্‌ বোটটা ওরা সিরাজগঞ্জের আরও আগে কোন একটা গণ্ডগ্রামের কিনারায় ভিড়িয়ে দিল। তাতে ওরা লাভ করেছে বেশ কিছু ঔষধপত্র, কয়েকটা দূরপাল্লার রাইফেল, গুলিগোলা ও দুটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীন যন্ত্র। ওরা ঐগুলো নিয়েই এবং সেই জলমগ্ন মৃতা বা অর্দ্ধামৃতা মহিলাটিকে ধরাধরি করে ডাঙ্গায় নামিয়েই – সেই স্পিড্‌ বোটটিকে ডুবিয়ে দিল এবং গ্রামের রাস্তায় পা বাড়াল। সূর্য্যি উঠবার আগেই ওরা নিকটবর্ত্তী ক্যাম্পে পৌঁছেছিল এবং সমস্ত দিবালোকে ওরা আত্মগোপন করেই কাটাল।

মেয়েটির যখন জ্ঞান ফিরল তখন রাত অনেক। অনেক কষ্টে সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার পর ওর জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু ও কোন কথাই বলতে পারছিল না। কেবল মাতালের মত অর্দ্ধনমিত নেত্রে – এধার এক আধবার চেয়েই আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে যেতো। কিন্তু ঐ রাত্রে তার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে কোন উপায় ছিল না – তার কারণ, ঐ গ্রামটা পাকফৌজরা আক্রমণ করতে আসছে। সুতরাং মুক্তিফৌজদেরও ঐ ক্যাম্পটা এক্ষুনিই ত্যাগ করতে হবে এবং যারা ও যা কিছু আছে তা সবই সঙ্গে নিয়ে আবার তাদের কোন এক নির্ভরযোগ্য স্থানে আত্মগোপন করতে হবে।

পরেশ বারংবার ওকে ডাকতে লাগল। দিদি! ও-দিদি! উঠুন! আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। আর একদম সময় নাই, তাড়াতাড়ি উঠুন। এই অন্ধকারে-অন্ধকারে পালাতে না পারলে খুবই বিপদ ঘটে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি উঠুন – !

পরেশের বারংবার ডাকে মেয়েটি চোখ খুলে দেখেছিল–একটা ভাঙ্গা ঘরে, আধভাঙ্গা কালিপড়া কাঁচের ফাঁক দিয়ে হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় পাঁচ সাতটি সশস্ত্র তরুণ – । প্রত্যেকের চোখ মুখই কি যেন এক বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞায় থম্‌থমে। দেখলেই এক নিমেষে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না – যেন এক প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্ব্বাভাস।

মেয়েটি অতি কষ্টে বিছানাতেই আড়িমুড়ি ছেড়ে হাই তুলে বলল – আমার গা হাতে বড্ড বেদনা। আমি এখান থেকে এক পাও নড়তে পারব না। আপনারা বরং চলে যান।

মেয়েটির কথায় ছেলেগুলি পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন বলল, তাই কখনো হয় নাকি? এই অপরিচিত যায়গায় – এই ডামাডোলের দিনে আপনার থাকাটা মোটেই নিরাপদ হবে না। তা ছাড়া পাকফৌজরা এখন মারাত্মক হয়ে উঠে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে চলেছে। এখানে তরুণ এবং তরুণীদের নিরাপত্তা নাই একবিন্দুও। যে ভাবেই হোক, আপনাকে আমাদের সঙ্গে এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

ছেলেটির এই কথায় মেয়েটি দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে আলস্য ও ক্লান্তির সুরে বলল, অসম্ভব! আমি এখন একদম অচল হয়ে গেছি। আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি একদম চলতে পারব না; মরণ তো আমার হয়েই গেছে – তবু নতুন করে আর একবার মরতে ক্ষতি কি? বরং আপনারা এখান থেকে এখুনই চলে যান – কারণ, আপনাদের জীবনের দাম আছে, আপনাদের বাঁচার প্রয়োজন আছে, আপনাদের উপর আমাদের দেশের ও দশের ভবিষ্যৎ সর্বতোভাবে নির্ভর করছে। লক্ষ্মী ভাইয়েরা আমার, আমার অনুরোধ – আপনারা আর দেরী করবেন না – দেরী করবেন না –! এই বলে মেয়েটি মুখ তুলে ছেলেগুলির দিকে একবার সজলঘন চোখে চেয়ে আবার বলল, ভাইসব- – আপনারা আমার প্রাণ থেকেও প্রিয়তর। আপনারাই আমার মায়ের যোগ্য সন্তান। আপনাদের উপরই আমার দুঃখিনী মায়ের মান-ইজ্জত, ভবিষ্যৎ – সবই নির্ভর করছে। আপনাদের লোহার হাত যদি আজ ভেঙ্গে যায়-তবে আমাদের মা হবেন নির্যাতিতা, শৃঙ্খলিতা, অপমানিতা, অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা, নিপীড়িতা –; এককথায় আমাদের দেশ মাতৃকার অপমৃত্যু হয়ে যাবে। আর তার ফলে হবে সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালীর জীবন্ত সমাধি! উঃ –! আমি আর ভাবতেও পারছি না – বলতেও পারছি না, আর তার প্রয়োজনও নাই। আপনারা দয়া করে এখুনই এখান থেকে চলে যান! আমার ভাবনা ভাববেন না।

মেয়েটির এই কথায় ছেলেগুলো যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিরবে ঐ অপরিচিতার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে ভাবতে লাগল এখন কি করা যায় –!

মফিজুদ্দীন বলেছিল – অসম্ভব! আপনাকে ছেড়ে আমরা এখান থেকে একপাও নড়ছি না! আপনাকে রক্ষা করার জন্যে যদি আমাদের প্রাণটা যায় – তো যাক গে। তাও আমাদের মন বুঝবে – আমাদের এক দিদির ইজ্জত রক্ষার জন্যেই আমাদের জান চলে গেছে।

মফিজের কথায় সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, ঠিক –! মায়ের ইজ্জত বোনের ইজ্জত একই কথা।

মেয়েটি তখন বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে ছেলেগুলির মুখগুলো যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কালিপড়া ভাঙ্গা হ্যারিকেনের অস্পষ্টালোকে মুখগুলো যেন ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল না। তাই সে বারংবার দেখতে লাগল। ক্রমশঃ তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল দুই গণ্ডস্থল বয়ে। তার সেই নীরব অশ্রুবর্ষণ, সেই ভাঙ্গা ঘরটিকে যেন মুক্তা ঝরা মাধুরীতে মণ্ডিত করে তুলল। প্রতিটি তরুণ নিরবে, সজলঘন চক্ষে – হৃদয়ের

অন্তঃস্থলে সেই মেয়েটির মধ্যেই মাতৃরূপিনী বঙ্গমাতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলো। তারা নিরবে অবনতমস্তকে কি ভাবতে লাগল কে জানে –! মফিজুদ্দীন সহসা সেই মেয়েটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, দিদি! আপনাকে ফেলে রেখে আমরা কিছুতেই যেতে পারব না, যাব না, যাওয়া যায় না, যেতে বলবেন না। আমরা আপনার ভাই। এই ভাইদের যা করণীয় – যা কর্ত্তব্য সবই আপনি নির্দ্দেশ দিবেন, আপনাকেই দিতে হবে।

ছেলেগুলির কথায় মেয়েটি বলল, বেশতো! তোমাদের দিদি হতে পেলে আমার জীবনও ধন্য হয়ে যাবে ভাই! আল্লা যেন তাই করেন, আমি যেন জন্মে জন্মে তোমাদের দিদি হয়ে দেশের কাজ করতে পারি। এর বেশী আমার আর কোন কামনাই নাই যে ভাই – আর কোন কামনাও যেন না থাকে! তোমরা আমার সোনার ভাই, হৃদয়ের ভাই, স্নেহের ও প্রাণের ভাই – তোমাদের পেয়ে আজ আমি ধন্য, আজ আমি এ পৃথিবীর সব থেকে সুখী ও ধনী মানুষ। এ পৃথিবীতে যার এতগুলো হীরের টুকরো ভাই – তার থেকে ধনী ও সুখী কেউ আছে না কি? নাই – কখ্খনো নাই! আমার ভাইয়েরা আমার দুঃখিনী মায়ের জন্যে কাঁদে – আমার দুঃখিনী মায়ের ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে, তার শিকল ছেঁড়ার জন্যে, আমার যোগ্য ভাইয়েরা জান দিতে এসেছে – তারা সর্ব্বস্ব পণ করে আজ সেজেছে রণসাজে। তোমরা আমার মায়ের দামাল ছেলে। আর –? আমি তোমাদের দিদি! আজ অভাগিনী মা আমার শৃঙ্খলিতা! এখন তোমাদের সেবা যত্নের ভার যে আমাকেই নিতে হবে। চল –! আমাকেও যেতে হবে। তোমাদের যত্নের জন্যে, তোমাদের স্নেহের জন্যে, তোমাদের শুশ্রূষার জন্যে, তোমাদের জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার জন্যে – আমায় যেতেই হবে, আমায় আবার বাঁচতেই হবে। – ভাইসব, চল-আমরা এই রাতের অন্ধকারে বেড়িয়ে পড়ি!

ওরা অসুস্থ মেয়েটিকে নিয়ে চলছিল অজানা পথে রাতের আবছা অন্ধকারে-অনির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ের সন্ধানে। চলতে চলতে ওরা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। পাড়াগাঁয়ের মেঠো রাস্তা – গাছপালা, ঝাড় জঙ্গল, খানা ডোবা অন্ধকারে অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়; তবু ওরা চলছিল, তখন ওদের মুখে ছিল ক্লান্তি আর অবসাদের কাল মেঘ, আর মনে ছিল – বীরত্বব্যঞ্জক গরিমা আর প্রতিশোধের নেশা।

আমানুল্লার পায়ে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। স্পিড্‌বোট্ আক্রমণের সময় গুলি লেগে এফোঁর ওফোঁর হয়ে গেছে।। সে চিৎকার করে উঠল, মরে গেলাম –! বাবা-রে –!

আমানুল্লার চিৎকারে সকলেই আঁৎকে উঠল – সমস্বরে বলে উঠল, কি হ'ল? তাকে ধরাধরি করে তুলে দেখল ওর পা-টা খুব ফুলে উঠেছে। ঐ সময় যথা সম্ভব সেবা-শুশ্রূষা করে ওর পা-টা ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

আমানুল্লা বার তের বছরের ছেলে ও ছাত্র। তার পা-টা বোধ হয় নষ্ট হয়ে যাবে। সে যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল। তখন ঐ দলের দু'জন তাকে ধরাধরি করে নিয়ে চল্‌তে লাগল। ওধারে সেই মেয়েটিও আর যেন চল্‌তে পারছিল না। অসহ্য কষ্ট সহ্য করেও তাকে কোন রকমে তার শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত তার এমন অবস্থা হ'ল – আর চলাতো দূরের কথা, পা যেন আর নড়ছিলই না। মাতালের মত টলতে টলতে সেই মাঠের মাঝখানে আলপথের উপর থপ্ করে বসে পড়ল। মেয়েটির বসা দেখে সকলেই বসে পড়ল। এটা ওদের পক্ষে খুবই ভাল হ'ল।

অন্ধকারটা সূতিকা রোগগ্রস্তা নারীর মতই কেমন যেন ফ্যাকাসে পারা। দিগন্তের কপোলপ্রান্তে একফালি চাঁদ লুকোচুরি খেলার মতই যেন উঁকি ঝুঁকি মারছে। কয়েকটা পত্রহীন তরুশাখা তার বুক চিরে দিয়ে হয়তো আকাশে মিশে গেছে। ঐ মাঠ থেকে তা দেখে মনে হয়, কেউ হয়ত ঐ চাঁদটা ধরে তার উপর কালির আঁচড় কেটে ওকে কলঙ্কিত করে দিয়েছে। মাঠের মাঝখানে বসে সকলেই যেন ঐ সুন্দর দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। মেয়েটি সহসা বলে উঠল, কি সুন্দর –! চাঁদ যে এত সুন্দর হয় তা কোন দিনই জানতাম না।

ওর কথায় সকলেই মন দিয়ে চাঁদটা দেখতে লাগল। বলল, তাই তো! ফাইন্ –!

মেয়েটি আবার বলল-আজ আমরা সকলেই যেন আর পারছিনা। দোষই বা কি? পারারও তো একটা সীমা আছে! তবু এই পূর্যুদস্ত অবস্থায় আমাদের চোখেও ঐ আধখানা চাঁদটা যেন আরও বেশি সুন্দর লাগছে, নয়-? মনে হচ্ছে ঐ চাঁদটার সৌন্দর্য্য সহ্য করতে না পেরে, গায়ের জ্বালায় কে যেন ওর গায়ে কালির আঁচর কেটে দিয়েছে। কিন্তু তাতে ফল হয়েছে কি-? উল্টো। ওকে নোংরা করতে গিয়ে ওর সৌন্দর্য্য আরও যেন বেড়ে উঠেছে শতগুণ। যেমনি পাক জানোয়ারেরা শেষ করতে গিয়ে গড়ে দিয়েছে একটা নূতন জাতি। আমার মনে হয় এ যেন এক অনিবার্য নিয়ম।

মেয়েটির কথায় ছেলেগুলি যেন হক্চকিয়ে গিয়েছিল। তারা ভাবছিল, মেয়েটি শুধু গুণীই নয়, শিক্ষিতাও বটে। তার কারণ, একটা ভাঙ্গা চাঁদকে নিয়ে যে মেয়ে এত কথা বলতে পারে – তার মধ্যে অন্ততঃ কিছু না কিছু আছেই।

কার মধ্যে কি আছে না আছে – আর কে কি করতে পারে না পারে – তা নিয়ে বিচার আচার করার সময় এটা নয়। এটা এক দুস্তর দুর্গম মাঠের মাঝখানে রাত্রির শেষার্ধে প্রায় অসহায় ও অবসন্ন কয়েকটি মুক্তিফৌজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আশ্রয়ের সন্ধানে পথচলা। প্রত্যেকের মুখচোখে যেন অস্পষ্ট অবসাদের আস্তরণ। কিন্তু এখন অবসন্ন হলে চলবে না – পা না চললেও চলতে হবেই, কারণ চলতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত, আর মৃত্যু হলে – এই জাতিরও মৃত্যু হবে। তাই ওরা ভাঙ্গা চাঁদটা দেখতে দেখতে ক্ষণেকের জন্যে জিরিয়ে নিয়েই আবার চলতে লাগল।

আমানুল্লাকে নিয়ে মহা ভাবনা। ছেলেটা বড্ড তসু। আওতার ঘাস যেমনি সামান্য একটু রোদেই নুইয়ে পড়ে – ঠিক তেমনিই। দোষই বা কি? গুলিলাগা পাটা ফুলে যেন ব্যাঙ্ ফোলা হয়েছে। ও হয়তো এ সবের মধ্যে আদৌ আসতো না; এসেছে ওর চোখের সামনেই ওদের গোটা গ্রামটাকে শ্মশান করে – পাক বর্ব্বরেরা যে নৃশংসতা, ব্যাভিচার করে গেছে তা দেখেই – তা ভুলতে না পেরেই। ও আজও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, সেই সব বীভৎস দৃশ্যের স্বপ্ন দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। তখন ওর কৃশ তনুটা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে, গা মাথা হতে কল্ কল্ করে ঘাম বেরোয়। এটা স্বপ্ন না বাস্তব সত্য – তা যেন ও কিছুতেই ঠাহর করতে পারে না।

ছেলেটার পা-টা বোধ হয় কেটে বাদ দিতে হবে। ও যন্ত্রণায় যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্ছে, ওর যন্ত্রণা দেখে সকলেই খুব মর্ম্মাহত। মেয়েটি সর্ব্বদাই ওর পায়ে ও গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওদের সময়ের বড্ড অভাব। ভোর হবার আগেই আত্মগোপন করতে না পারলে ওদের কচি কচি জানগুলো চলে যাবে যে! তাই আবার ওরা চলতে লাগল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতে বাধ্য হ'ল। সুস্থ-অসুস্থ, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর – প্রত্যেকেই এক সঙ্গে চলতে লাগল।

এই ভাবে রাতের অন্ধকারে চলা – আর দিনের আলোয় আত্মগোপন করে ওরা চলে চলে পূর্ব নির্দ্দেশমত মহেশপুর ক্যাম্পে উপস্থিত হ'ল। তখন সকলেই যেন আধমরা হয়ে পড়েছ। আমানুল্লার পায়ের ব্যাথাটা আরও বেড়ে উঠেছে। এখন পা-টা খুবই ফুলেছে – প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে যেন আধপাগলা হয়ে উঠেছে। যখন তখন যা তা বলে, কাঁদে, সময় সময় মুক্তোফৌজদেরও গালাগালি দেয় – নিজের উপর ধিৎকারে আত্মহত্যা করতে যায়। এখন ওকে সামলানোই যেন এক দুরূহ ব্যাপার। সেই আধমরা মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও এখন বেশ খানিকটা সেরে উঠেছে – তবু তাকে সুস্থ বলা যায় না। আমানুল্লার সেবা শুশ্রূষার ভার সেই-ই নিয়েছে। শুধু আমানুল্লা নয়, আরও আহত মুক্তিফৌজদের ও-ই সেবাশুশ্রূষা করে, পথ্যাদি তৈরী করে দেয়, রোগের ঔষধ দেয় – এক কথায় এই মেয়েটি যেন এক সুশিক্ষিতা নার্সের মতই দশ হাতে ওদের সেবা যত্ন করে। তাই ঐ ক্যাম্পের সকলেই ওকে স্নেহ করে, ভক্তি করে, ভালবাসে, আবার ভয়ও করে। মুক্তিফৌজগুলোর কাছে ঐ মেয়েটি যেন প্রাণ। কিন্তু ওদের আফশোষ – ওরা কিছুতেই ওর পরিচয় জানতে পারে নাই, পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেই সে হেসে উড়িয়ে দেয়, কোন সময় কেঁদে ফেলে, এক এক সময় কাঁদতে কাঁদতে

ছুটে বেরিয়ে যায় – আবার কোন সময় বিমর্ষে যেন হতচেতন হয়ে পড়ে। ওর ঐ অবস্থা দেখে সকলেই অবাক হয়ে যায় – ওর পরিচিতি সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করতেই সাহস পায় না।

সকালের উঠন্ত রোদের দিকে পিঠ করে ছেলেরা সার বেঁধে বসে হাসি আর গল্পে মশগুল। একপাশে ডাঁই করা আছে নানা ধরণের দেশী বিদেশী হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র। তার মধ্যে চীনে প্রস্তুত কিছু স্বয়ংক্রিয় রাইফেল আর এল, এম, জি। থ্রি নট্ থ্রি একটি করে প্রত্যেকের পাশেই রাখা আছে। পূবদিকের কোণের বড় চালা ঘরটা থেকে একজন বড় একটা বালতিতে করে চা, অন্য হাতে একটা মগ নিয়ে এদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার পিছনে পিছনে এল একজন বড় একটা ডেক্‌চিতে করে হাতে গড়া গরম রুটি নিয়ে – প্রত্যেকের হাতে হাতে দু'খানা করে রুটি আর তোবড়ান আধভাঙ্গা গেলাসে চা ঢেলে দিয়ে তারা চলে গেল 'হাসপাতাল' লেখা চালা ঘরটার দিকে, আহত ও অসুস্থদের চা দেবার জন্যে।

রুটি দু'খানা এক সঙ্গে লম্বা করে জড়িয়ে নিয়ে কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতে এক এক ঢোঁক করে চা গিলে সকলে সকালের খাবার শেষ করল। সকলের মুখেই তৃপ্তির হাসি। দুঃখ শোক এদের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না – যেন বড় ভয় পায় এই দস্যি দামাল ছেলেগুলোকে।

এবার সবাই কাজে মন দেয় – অস্ত্রগুলো পরিষ্কার করার কাজে লেগে যায়। এর মধ্যে কিছু অস্ত্র গত রাত্রের সার্থক অভিযানের দরুন সংগৃহীত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসির হুল্লোড় ওঠে। দুলু মুখে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে বলল, কাসেম ভাই, গত রাতের শুভদৃষ্টিটা তুমিই ভাল মত করলে দেখছি! কনের চোখে চোখ পড়তেই একেবারে সোজা গুড়ুম! তাকে ছাদ্‌না তলায় বসার কষ্ট থেকে রেহাই দিলে।

কাসেম সহাস্যে জবাব দিল – 'আর কইস না, বেডীর বড় সাধ আছিল, লোহার টুপীর ঘোমডা দিয়া, এল. এম. জি'র হাসির ঝিলিক আইন্যা এ্যাক্কেরে কামাল কইরবো! তা দিছি থ্রি নট্ থ্রির বুলেটের ঘায়ে মালা বদল কইর্‌য়া!'

সবাই এক সঙ্গে প্রাণখোলা হাসিতে চারিদিকে ভরিয়ে তুলল।

হাসির মধ্যেই রহিমকে বলতে শোনা গেল – 'আরে আমাগো মিহিরদার বাসর জাগনের ব্যাপারডা তো অখনও শোনলাই না! সন্ধ্যার-থিকা বাসমতির খালের ধারে জঙ্গলডা একটু সাফ কইর্‌য়া জমির গাছের নিচে আমরা দশজন চুপ কইর্‌য়া বইস্যা আছি – আমাগো নাগর কখন আসে হ্যের আশায়! মশার কি কামড় – রে ভাই! সারা শরীলডা য্যান্ জ্বইল্যা গেল। হগলের মনডাই কেমন হতাস। বিরহিনী প্রিয়ারে শ্যাষকালে নিরাশ করে নাকি নাগর? অখনও পর্য্যন্ত দেহা নাই যে! হগ্‌গলের মনডাই কেমন আন্‌চান আন্‌চান করতে আছে। কিন্তু না – নাগর আমাগো রসিক জন! তাই প্রিয়ারে একটু দুঃখ দিয়া তবে কাছে আসে। দূর থিকা দ্যাখ্‌লাম – নিরলগাছির সড়ক ধইর্‌য়া সারবন্দী গাড়ী আইতে আছে। মিলনের আশায় আমরা এ্যাক্কেরে মাইত্যা উঠ্‌লাম। মাইনগুলান ঠিক মতই বসান হইছে। এবার আমাগো যা কিছু উপচার সামগ্রী আছে তাই দিয়াই বঁধুরে আলিঙ্গন করতে অইব।'

কথার ফাঁকে জলিল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল – 'আরে হেকি যা-তা আলিঙ্গন? এ্যাক্কেবারে পরাণ ঠাণ্ডা করা প্রেমালিঙ্গন! আমরা হগ্‌গলে হামাগুড়ি দিয়া ঠিক জায়গায় গিয়া হাজির হইছি। দ্যাখলাম পরথমের দুইডা গাড়ী মাইনের গুঁতায় পঁচিশ তিরিশ হাত দূরে যাইয়া খান্ খান্ হইয়া পড়ল।'

কলিমুদ্দিন বলে উঠল – 'আমি আর নরেন পিছনের গাড়ী তাক্ কইর্‌য়া দিলাম হ্যাণ্ডগ্রেনেড ছুঁইড়্যা। হ্যার পর আরম্ভ হইল পুষ্প বৃষ্টি! সে কি পুষ্পবৃষ্টি রে ভাই! থ্রি নট্ থ্রির যে এত গুণকইর্‌য়াতা কি বলুম্। আমাগো রসিক নাগরেরা পরাণের ডরে দিল দৌড়। গাড়ী খুইজ্যা যা কিছু টুকি টাকি পাইলাম উড়ায়ে লয়ে আমরাও তাড়াতাড়ি দিলাম চম্পট।'

আবার হাসির বন্যা বয়ে গেল।

এমন সময় দক্ষিণ দিকের ছোট চালাঘরটা থেকে লায়লাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। সকলেই বেশ একটু সপ্রতিভ হয়ে বসল।

চারদিকে ঘিরে কতকগুলো লম্বা লম্বা চালাঘর – বাঁস আর উলুখড়ের তৈরী। তেমন মজবুতও নয় – যেন দু'চার দিনের প্রয়োজনের জন্যেই। অফিস, কিচেন, হাসপাতাল, এবং সকলের বিশ্রামের জন্যে জায়গা সব কিছু ভাগ করে দেওয়া আছে।

রান্নাঘরে তখন রান্নার জোগাড় হচ্ছে মহা উৎসাহে। আজ সোনাদিঘি গ্রামের লোকেরা লুকিয়ে কিছু মাছ আর চাল দিয়ে গেছে। তাই ভোজনের উৎসাহে সবাই খুসী। এক একদিন শুধু চাপড়া-রুটি আর গুড় দিয়েই এদের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শেষ করতে হয়, তা-ও কোন দিন জোটে – কোন দিন বা জোটে না। তবে তার জন্যে এদের খুসীর জোয়ারে টান পড়ে না। রান্না চালার এক পাশে গোটা পাঁচ-ছয় হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে পরিস্কার করছে একজন। অফিস ঘরের মেঝেয় চাটাই বিছিয়ে দু'জন বসে কি যেন পড়ছে আর লেখালেখি করছে। হাসপাতালের চালা থেকে মাঝে মাঝে কাৎরানি আর গোঁঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে।

লায়লা আস্তে আস্তে এসে এদের সামনে ঘাসের উপর বসে পড়ল। সমস্ত ক্লান্তি ছাপিয়ে তার মুখে উঠল এক পরম প্রশান্তির হাসি। আব্বাস সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল-সেদিন রাতের অভিযানের সময়। জলে ভেসে যেতে দেখা তাদের এই বোনটিকে উদ্ধার করার সব বিবরণ দিয়ে সকলের চোখে মুখে একটা চাপা প্রশ্ন লায়লাকে যেন ঘিরে ধরল।

সকলের চোখে মুখে একটা চাপা প্রশ্ন লায়লাকে যেন ঘিরে ধরল। কি করে নদীর জলে পড়েছিল-স্বেচ্ছায় না কোন দুর্ঘটনায়; আত্মরক্ষার জন্যে – না আত্মবিসর্জনের জন্যে; কোথায় বাড়ী, কি নাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। লায়লা খুবই বুদ্ধিমতী। সে ওদের সকলের চোখ মুখের ভাব দেখেই তা বুঝতে পারল। সে ধীর শান্তকণ্ঠে বলল – আপনারা সকলেই আমার ভাই। আপনারা আমার জীবন বাঁচিয়েছেন – হয়তো আমার দ্বারা কোন কাজকর্ম্ম হতেও পারে। যাই হোক, যতটা সম্ভব আমি আপনাদের সেবা আর সহযোগিতা করে যাব। কিন্তু আমার অনুরোধ, আমার সম্বন্ধে কোন কিছু জানবার কৌতুহল আপাততঃ আপনাদের দমন করতেই হবে।

লায়লার এই কথা শুনে সকলেই আশাহত হলেও মুখে কিছু বলার উৎসাহ পেল না।

"আল্লাহ্ রসুল" – বলে একটা ভিখারী এসে দাঁড়াল একেবারে উঠোনের মাঝখানে। সকলেই বেশ সচকিত হয়ে উঠল। পরনে একটা বড় বড় চেকের ছেঁড়া ময়লা লুঙ্গি, গায়ে একটা ময়লা গেঞ্জি – পিঠের দিকে তার আধখানা নেই, মাথায় ফেট্টি বাঁধা একটা রং ওঠা মলিন গামছা, সারা মুখে বড় বড় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এত বেশী পান খেয়েছে যে কস দিয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ে দাড়ির কিছুটা জায়গা লাল করে তুলেছে, সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই এক বিন্দুও।

ভিক্ষের ঝুলিটা গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে অফিস ঘরের দিকে তাকে এগিয়ে যেতে দেখে সবাই যেন একটু চম্‌কে উঠল। আরে, আমাদের নীলু না? খাসা মেক-আপ নিয়েছিস শালা – কার বাপের সাধ্যি তোকে চিনতে পারে! নীলু সহাস্যে সকলের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। অর্থাৎ খবর আছে। কিন্তু সে সব খবর এদের সকলের কাছে বলার নিয়ম নেই। যা কিছু সংবাদ সব অফিসেই জানাবে। অফিস যেটা এদের জানাবার দরকার মনে করবে তা জানিয়ে দেবে।

খবর এসেছে দুটো। অত্যাচারী মেজর জিয়াস খাঁ গুলির আঘাতে নিহত হয়েছে। তবে কিভাবে যে নিহত হ'ল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যদিও পাক সামরিক দপ্তর থেকে সন্দেহ করা হচ্ছে এটা মুক্তিফৌজের কাজ। কিন্তু মুক্তিফৌজের

সদর দপ্তর তা মানতে পারছে না। কারণ, অমন একটা জমকালো কাজের কৃতিত্বের দাবী কোন ক্যাম্পই করছে না। সুতরাং খবরটা নিঃসন্দেহে আনন্দের হলেও ওর মধ্যে মস্ত বড় একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কে এই অসম্ভব কাজ করল – কি ভাবে করল?

দ্বিতীয় খবর হচ্ছে – হীরাকান্দি গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও মুসলীম লীগের চাঁই আজাহার সেখ, পাক মিলিটারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুক্তিফৌজের কাজের বাধা সৃষ্টি করছে, দুজন আওয়ামী লিগ সদস্যকে ধরিয়ে দিয়েছে – এবং কয়েকজন রাজাকারের সাহায্যে গ্রামের নিরীহ লোকদের ওপর অকথ্য নির্য্যাতন করছে। সুতরাং তাকে সরাতে হবে। আজ সন্ধ্যায় তার বাড়ীতে কয়েকজন রাজাকারকে নিয়ে একটা মজলিশ ও খানাপিনার আয়োজন হয়েছে – সেই সুযোগে তাকে সদলে খতম করা চাই।

নীলু খবর দিয়ে আবার ভিক্ষের ঝুলিটা বাগিয়ে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল গ্রামের রাস্তায়। তার অনেক কাজ। গ্রামে, হাটে-গঞ্জে ভিক্ষে করতে হবে, সেই সুযোগে হালচাল সব জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংগঠনের কাজ চালাবে, যেখানে যা খবর দেবার তা দেবে, যা নেবার তা নেবে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে গঞ্জে গিয়ে রহমত পালিশওয়ালার সঙ্গে দেখা করবে। রহমত ছোকরা ভাল। সে কোমর থেকে গামছা খুলে নিয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে খানদের জুতোর ধূলো কাদা ঝেড়ে মুছে দেয়, জুতো পালিশ করে দেয়। তাদের ফেলে দেওয়া জলন্ত সিগারেটের টুকরোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গর্বের সঙ্গে টান মেরে মুখ দিয়ে নাক দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ে আর দু-চার পয়সা যা পায় সেলাম জানিয়ে সযত্নে থলিতে রাখে। মহামান্য 'খান'দের পদরজ পরিষ্কার করতে পেলে আর তাদের ধারে কাছে একটু থেকে তাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পেলেই সে কৃতার্থ।

রহমত ছোকরা সত্যিই খুব ভাল। নীলু জানে রহমত অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল। কিন্তু চুলোয় গেল লেখা পড়া! এখন যে লেখা পড়ার চেয়ে এটাই সবচেয়ে বড় কাজ।

সে সব যাই হোক, নীলু রহমতের সঙ্গে দেখা করবে, তার কুঁড়েতে বসে একটু জিরিয়ে নেবে কিম্বা তার হাঁড়িতে যদি কিছু পান্তা ভাত থাকে খাবে, তারপর মৌজ করে একটা বিড়ি ধরাবে। দরকার মনে করলে একটু ঘুমিয়েও নিতে পারবে। তারপর একটু গা-ঢাকা অন্ধকার হলে পূবদিকের বড় খালটা পেরিয়ে যাবে জহুর আলীর কাছে। সে ট্রেনে পান-বিড়ি সিগারেট ফিরি করে বিক্রি করে। এখন যাত্রীবাহী গাড়ী বিশেষ নেই বললেই চলে। তাই সে অনেক সময় বাজারের রাস্তায় অথবা ইষ্টিশানে এসে বসে থাকে। ইষ্টিশনের মাষ্টারবাবুরা পান সিগারেট নেয়, চার পয়সার জায়গায় দু'পয়সা দিলেও বিশেষ কিছু অনুযোগ করে না – কারণ, হুজুরদের সন্তুষ্ট না রাখলে এ ব্যবসা চালানোর পক্ষে অসুবিধা।

জহুর আগে ছিল ই. পি. আর এর একজন ক্যাপ্টেন। পাক সাঙ্কেতিক ভাষাগুলো তার বিশেষভাবে জানা। হাঙ্গামা শুরু হবার পর থেকেই সে নিখোঁজ। পান বিড়ি সিগারেটের পসরা নিয়ে জহুর অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে যায়। দরকার মত ইষ্টিশানে নামে, মাষ্টারবাবুদের পান সিগারেট খাওয়ায়, তারপর আবার সময় মত নিজের ডেরায় ফিরে আসে। তাই এই জহুরের সঙ্গেও দেখা করা নীলুর খুব দরকার।

ষোল

অসুস্থ আমানুল্লাকে নিয়ে লায়লা খুব ব্যস্ত। গুলিটা তার দাবনা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে গেছে তবু ভাল, কিন্তু রক্ত পড়া এখনও বন্ধ করতে পারা যাচ্ছে না। ছেলেটার মলিন মুখ আর কাৎরানি দেখে লায়লার চোখের দু'কোন দিয়ে জল গড়িয়ে গাল বেয়ে ঝড়ে পড়ছে। আহা! দুধের ছেলে, ভারি সুন্দর কচি নধর মুখখান। আজ কিসের যাদুমন্ত্রে এই সর্বনাশা রক্তাক্ত পথে পা দিয়েছে। ধন্য এ দেশ – ধন্য এ দেশের গর্ভধারিণীরা। লায়লা আর স্থির থাকতে পারল না। সে উপুর হয়ে ছেলেটার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমানুল্লা বিহ্বল ভাবে তার দিকে চেয়ে থেকে হাত দুটো উপরে তুলে – দিদি বলে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু মুখে তার কথা জোগালো না।

লায়লা বলল, সোনামণি ভাইটি আমার। বড্ড কষ্ট হচ্ছে – না?

সে বলল – আগে হচ্ছিল কিন্তু তুমি থাকলে একদম কষ্ট হয় না। লায়লা আকুল হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল।

ওদিকে পাশের বিছানায় অলক জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে শুরু করেছে। ক'দিন ক্রমাগত বৃষ্টিতে ভিজে ওর প্রবল জ্বর। লায়লা আস্তে আস্তে উঠে তার কাছে গিয়ে কলসী করে জল নিয়ে এসে খুব যত্ন করে তার মাথাটা ধুয়ে দিল, তারপর কপালে জলপটী দিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগল।

ধীরে ধীরে জ্বর কমে এল। অলক চোখ মেলে চাইল। বড় করুণ ভাবে তাকাল স্নেহময়ী এই দিদির মুখের দিকে। ছল ছল চোখে বলল, দিদি! কবে আমি ভাল হয়ে যাব বল না! আমার খালি মনে হয় কি জান? আমার যদি জ্বর না হ'ত, তাহলে এতদিন অন্ততঃ আরও পাঁচ সাত জন খান সেনাকে তো মারতামই!

লায়লা মিষ্টি হেসে বলল, কিচ্ছু ভেবো না অলক, যত শিগ্‌গির পারি আমি তোমাকে সারিয়ে তুলব। তারপর তোমার হাতে মেসিনগান তুলে দিয়ে পাঠাব তোমায় খানদের খতম করার জন্যে। তোমার মত বীর ভাইরা থাকতে আমরা কি কিছুতে ভয় পাই?

অলকের চোখে মুখে এক নতুন উদ্দীপনা ফুটে উঠল। জ্বরের কথা ভুলে গিয়ে সে উঠে বসতে গেল; লায়লা তাকে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিয়ে বলল – এখন শোও ভাই, যখন ওঠার সময় আসবে, আমি নিজেই তোমায় হাত ধরে তুলে দেব।

অলক শুয়ে পড়ে বলল – দিদি, তুমি আমায় ছেড়ে যেন কোনখানে চলে যেও না!

লায়লা মৃদু হেসে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, পাগলা ভাই আমার; আমি তোমায় ছেড়ে কি কোথাও যেতে পারি?

দক্ষিণ দিকে বাঁশঝোপের ওধারে কাঁঠাল গাছে চড়ে খালের ওপারের দিকে নজর রাখছিল অর্থাৎ পাহাড়া দিচ্ছিল কামাল। সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিনের কাছে জানাল, খালের ওপাড়ের সড়ক দিয়ে পাঁচজন সশস্ত্র রাজাকার কুমারডাঙ্গার দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মহিউদ্দিন বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিল – কাসেম! তোমার গ্রুপের দশজন তৈরি হয়ে নাও। রাজাকার ক'টার লাস আমার সামনে এনে হাজির করবে।

খবরটা শুনতে পেয়ে হাসপাতাল ঘর থেকে লায়লাও ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল এদের মাঝে। এবার সে এদের তাড়াতাড়ি তৈরি হবার ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগল এবং দরকারি অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি এদের হাতে জুগিয়ে দিল। তারপর মৃদু অথচ ধীর কণ্ঠে বলল – মহিউদ্দিন ভাই! রাজাকারগুলোকে প্রাণে না মেরে বন্দী করে আনতে পারলে মনে হয় আরও ভাল হ'ত।

লায়লার এই কথায় ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন যেন বিদ্যুৎপৃষ্টের মতই চম্‌কে উঠল। সে এতক্ষণ লায়লার কাজকর্ম সবকিছু মন দিয়ে দেখছিল, আর মনে মনে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ভাবছিল, এ মেয়ে তো যে সে মেয়ে নয় – নিশ্চয়ই এর ভিতরে কোন রহস্য আছে! এবার লায়লার কথা শুনে চম্‌কে না উঠে উপায় ছিল না। তাই সে বেশ কিছুক্ষণ লায়লার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, বেশ তাই হবে। তারপর কাসেমকে বলল, চল কাসেম, আমিও তোমাদের সঙ্গী হ'ব।

ওরা সবাই দ্রুতপদে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে খালটার বাঁকের মুখে এগিয়ে গেল। তারপর খালের জলে ডোবানো দু-খানা নৌকো টেনে তুলে দ্রুত হাতে দাঁড় টেনে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ওপারে উঠল। তারপর খালের নিচে দিয়ে কিছুটা হেঁটে গিয়ে আস্তে আস্তে উপড়ে উঠে সড়কের ধারে একটা বাঁকের মুখে বাঁশঝোপের আড়ালে ছ'জন – আর পাঁচজন একটু পিছনে গিয়ে ছোট ঝোপের নীচে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল।

কয়েকটা মিনিট মাত্র। রাজাকার পাঁচজনার খোস গল্প ও জুতোর শব্দ একেবারে কাছে চলে এসেছে। সকলেই প্রস্তুত। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন লাফ মেরে বাঁশঝোপের আড়াল থেকে সড়কের উপর এসে দাঁড়াল। পিস্তল উঁচিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলল, হাত উপরে তুলে দাঁড়াও শয়তানের বাচ্চারা! না হলে কুকুর মারা করব।

বাকী দশজন তখন রাইফেল উঁচিয়ে এদের একেবারে ঘিরে ফেলেছে। আচম্‌কা এই ব্যাপারে ভ্যাবাচ্যেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল রাজাকাররা। চারিদিক তাকিয়ে অবস্থা বেগতিক বুঝে নিরুপায় হয়ে হাত তুলে দাঁড়াল। কাসেমরা দশজন মিলে এদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে হাত দুটো পিছমোড়া করে কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। তারপর সকলে মিলে নৌকোয় এসে উঠল।

এত সহজে কাজ হাসিল হওয়ায় সকলেই খুব খুসী। ক্রমে তারা ক্যাম্পে এসে পৌঁছাল। লায়লা তখন অলককে সাগু খাওয়াচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন ডাকল – কই বোনটি! তোমার কথামত আসামীদের বন্দী করেই এনেছি – এই নাও। এবার এদের যা করবার তুমিই কর।

লায়লা সাগুটা অলককে খাইয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল এদের বাঁধন খুলে দাও।

বাঁধন খুলে দেওয়া হল।

এদের দেখে লায়লার মুখটা আরক্তিম হয়ে উঠল। রাগে সে ঠক্‌ঠক্‌ করে যেন কাঁপছে আর ফুলছে। যেন এখনই এদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল – 'বেইমানের দল! তোমরা না বাঙ্গালী? বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নিয়ে-বাংলার বুকে মানুষ হয়ে, কি করে এমন ঘৃণ্য পশু হতে পারলে? তোমাদের বিবেককে কি করে বিক্রি করে দিতে পারলে তুচ্ছ দুটো টাকার বিনিময়ে? দু'দিনের সুখের লোভে তোমরা সারা দেশের এতবড় সর্ব্বনাশ করে করতে পারছ? লক্ষ লক্ষ লোকের ওপর এমন নৃসংশ অত্যাচার করতে সাহায্য করছ কেমন করে? তোমাদের শিরা উপশিরায় কি

মানুষের রক্ত নেই? শয়তানের দল! এখন তোমাদের কে বাঁচাবে? কোথায় তোমাদের সেই সুখের স্বপ্ন? তোমাদের এই কালা মুখ দেখাও পাপ! তোমরা দেশের কলঙ্ক-জাতির কলঙ্ক – গর্ভধারিণী মায়ের কলঙ্ক! উঃ! আমি চিন্তা করতেও পারি না – আজ যেখানে লক্ষ লক্ষ যুবক, কিশোর, দুধের ছেলে, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, নারী, পুরুষ সবাই যেদেশের মুক্তির জন্যে জীবন সর্ব্বস্ব পণ করে-বিদেশী পশুশক্তির বর্ব্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে বুকের তাজা রক্তে মাটিকে ভিজিয়ে তুলছে, আর সেই দেশেরই মানুষ হয়ে – তোমরা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই বিদেশী তস্করের পশুশক্তিকে মদত দিয়ে করছ সেই দেশেরই মা ভাই বোনদের উপর অকথ্য অত্যাচার। ধিক তোমাদের প্রবৃত্তি আর বিবেক বুদ্ধির! রক্ত মাংসের গড়া মানুষের শরীর নিয়ে সমাজে বাস করে কেউ যে এমন জঘন্য নোংরা কাজ করতে পসারে তা আমার বিশ্বাস করতেও ঘৃণায় গা-টা রি রি করে ওঠে! আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই – তোমরা আজ কত নীচে নেমে গেছ! তোমরা ভেবেছিলে এমন সুখের দিন চিরকাল থাকবে, দেশের লোকের ওপর নির্য্যাতন আর অত্যাচার চালিয়ে, লুঠপাট আর নারী ধর্ষণ করে জীবন কাটিয়ে দেবে – না –?’

উপস্থিত সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে লায়লার কথাগুলো শুনছিল। রাজাকার পাঁচজনও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে লায়লার কথা শুনছিল আর মাঝে মাঝে যেন অস্থির হয়ে উঠছিল। এবার সবাই লক্ষ্য করল রাজাকারদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গাল বেয়ে মাটিতে পড়ছে টপটপ করে। এদের মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ পেটের নিচে লুকিয়ে রাখা একটা ছোরা বার করে নিজের বুকের সামনে উঁচিয়ে ধরে লায়লাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল – ‘বোনটি! আর লজ্জা দিও না। আমরা দেশদ্রোহী পশু! আমাদের কলঙ্কিত এ জীবন আর রাখতে চাই না। তোমার সামনেই বুকের কল্‌জে উপড়ে দিয়ে এই পাপ জীবনের শেষ করে দিচ্ছি।’ এই বলে সে ছোড়াটা বুকের উপর তুলে ধরতেই বাকী চারজনও দেখাদেখি তাদের লুকানো ছোরা বার করে প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল – হ্যাঁ, বোনটি – আমরা আমাদের এই পাপ জীবন আর রাখব না!

হঠাৎ এই ঘটনায় সকলেই চম্‌কে উঠল। উৎকণ্ঠিত হয়ে সকলে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। লায়লা আর মহিউদ্দিন যুগপৎ ছুটে এসে ওদের বাধা দিল এবং আরও কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে ছোরাগুলি কেড়ে নিল।

লায়লা তাদের বলল – পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি করতে হয় তবে এভাবে কাপুরুষের মত নয় – উপযুক্ত উদ্দেশ্য এবং যোগ্য কাজের বিনিময়েই জীবন বিসর্জন দেওয়া উচিত। সুতরাং তোমাদের যা বলছি মন দিয়ে শোন –

তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে এতদিন যে ভুল ও অন্যায় করেছ তা এখন বুঝতে পেরেছ এবং তার জন্যে তোমরা মনে প্রাণে অনুতপ্ত। সুতরাং তোমাদের আমরা ক্ষমা করলাম। এখন তোমাদের আমি একটা প্রশ্ন করছি, বেশ ভেবেচিন্তে উত্তর দাও।

তোমরা কি এই সব ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাক বর্বরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে?

সকলেই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ – পারব! আমরা জীবনপণ করে পাক বর্বরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। দয়া করে শুধু একবার মাত্র সুযোগ দিয়ে দেখুন – কিভাবে আমরা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। যা করেছি তা ক্ষমা করে শুধু একবার মাত্র আমাদের সুযোগ দিন।

বেশ! মনের সমস্ত গ্লানি দূর করে, সুস্থ মনে নতুন প্রেরণা নিয়ে তোমরা এই ভাইদের সঙ্গে কাজ করবে, ক্যাপ্টেনের নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। জানবে, যে কোন মূল্যে দেশকে শত্রুমুক্ত ও অত্যাচার মুক্ত করতেই হবে।

তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে লায়লা শান্ত কণ্ঠে বলল – মহিউদ্দিন ভাই! আপনি এদের পাঁচজনকে নিয়ে যান। এরা কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল জেনে নিন। তারপর আরও যেসব পাক গোপনীয় খবর এরা যা জানে সব ভাল মত শুনে নিয়ে – যেমন ভাল বুঝবেন সেই মত কাজের প্রোগ্রাম করবেন, আর এদের কাজে লাগাবেন।

এতক্ষণ ক্যাম্পের সবাই চুপ করে গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে যেন দম বন্ধ করে সব কিছু দেখছিল এবং শুনছিল। এবার সবাই যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

লায়লা আসার পর আজ সকাল থেকে যেন ক্যাম্পের উপর দিয়ে একটা নতুন উদ্দীপনার ঝড় বয়ে চলছিল। বিভিন্ন ঘটনার স্বার্থকতায় সকলেই বেশ আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করছিল। হঠাৎ দুলু হাসতে হাসতে বলে উঠল – 'আইজ হগাল থিকা খুসীর বান বইতে আছে। আমাগো এই দিদিডা খুব পয়মন্ত!'

দুলুর কথায় সবারই আনন্দ যেন উপচে পড়তে লাগল। লায়লাও হেসে দুলুর দিকে তাকিয়ে মৃদু ভ্রুকুটি করে সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে হাসপাতাল ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার আচরণে ক্যাম্পের সকলেই যেন লায়লার খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিল। তার অপরিসীম স্নেহে ও মধুর ব্যবহারে সকলেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ। এমনভাবে আপন করে নেওয়া ব্যবহার ক্যাম্প জীবনে কেন, হয়তো বাড়ীতে মা বোনের কাছেও অনেকের ভাগ্যে জোটে নি। তাই সকলেই লায়লার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় মুখর।

সম্পূর্ণ অজানা এবং অপরিচিত এক পরিবেশের মধ্যে – জাতি, ধর্ম, বয়সের তারতম্য ভুলে গিয়ে, মনের সবকিছু জড়তা ও কুণ্ঠাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, এক সঙ্গে এত জনকে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ভালবাসা; অপরিসীম স্নেহে সকলকে অতি আপনজন করে নেওয়া – নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না। তাই লায়লা এই ক্যাম্পের সকলের কাছেই এক মহিমাময়ী আদর্শ নারী। তার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলার ও শোনার ইচ্ছাও নেই – প্রয়োজনও নেই।

সতের

অমাবস্যার রাত্রি। চারিদিকে অন্ধকারের সুগভীর প্রলেপ। একমাত্র নিশাচররাই এই অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতে পারে। যে দিকেই চোখ ফেরাও – যেন জমাট বাঁধা কালো পাহাড় গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে এস পড়ছে। নীরব নিশীথিনী যেন আজ তার অনন্ত অপরিমেয় কালো কেশরাশি ধরণীর বুকে বিছিয়ে দিয়ে মনের সুখে নিদ্রামগ্ন। এই কালো গভীর আস্তরণ ভেদ করে এগিয়ে চলা বড় দুঃসাধ্য কাজ। তবুও ওরা চলছে, ওরা বাংলার মুক্তি পাগল দামাল ছেলে মুক্তি ফৌজ – ওরা ঠিকই চলবে। ওদের চোখে যে আজ বন্য শ্বাপদের জলন্ত দৃষ্টি, কণ্ঠে আজ ওদের মুক্তির অদম্য পিপাসা, মনে আজ ওদের বহ্নিবন্যার উদ্দামতা, শরীরে আজ ওদের মত্তহস্তীর বল। সুতরাং আজ ওদের বাধা দেয় সাধ্য কার?

মাথার উপর দিয়ে একটা রাতচরা পাখী সাঁ করে উড়ে গেল। ডান দিকের একটা অনুচ্চ গাছ থেকে ডানা ঝাপটে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। বিপ্লব নির্ভিক মনে এগিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে তার একশত মুক্তি সেনা। হঠাৎ বাঁ দিক দিয়ে কি যেন একটা জানোয়ার ছুটে চলে গেল। হয়তো শিয়ালই হবে – অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না। বিপ্লবের বাঁ চোখটা দু'বার নেচে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিপ্লব! না –! সমস্ত জড়তা আর কুসংস্কার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিপ্লব সঙ্গীদের নিয়ে বীর দর্পে এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর জহুর আলী অর্থাৎ ভূতপূর্ব; পি, আর-এর একজন ক্যাপ্টেন এবং বর্তমানের পান বিড়ি ওয়ালা – বিপ্লবকে উদ্দেশ্য করে বলল – এই খানেই আমাদের পজিশন নিলে ঠিক হবে। দুটো ষ্টেশনের ঠিক মাঝামাঝি জায়গা। রেল লাইনের দু'পাশে প্রায় একশো ফুট করে চওড়া নিচু খাদ। তার পাশেই টিলার মত উঁচু কিছুটা জায়গা রেল লাইনের দু'ধারেই রয়েছে। টিলার উপর গোটা পাঁচ ছয় বড় বড় কি সব গাছ অন্ধকারে চেনা যাচ্ছেনা, বাকী জায়গাটায় ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গলে ভর্ত্তি। সুতরাং পজিশন নেবার মত জায়গাই বটে। লড়াই করার উপযুক্ত স্থানই পাওয়া গেছে।

আবার বেগতিক বুঝলে – দু'ধারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গল,খাল, কাঁদর, বিল, মাঠ, বাঁশ বাগান উত্যাদি রয়েছে, তারই আড়ালে আড়ালে দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে অনেক দূর চলে যাওয়া যেতে পারবে। এর ধারে কাছে কোথাও বাঁধা সড়ক বা রাস্তা নেই। যদি দরকার হয় তো পশ্চিমে সাত মাইল পাড়ি দিয়ে মহেশপুরে মহিউদ্দিনদের ক্যাম্পে যাওয়া যাবে; আর এধারে পূর্ব্বদিকে পাঁচ মাইল হাঁটলে বিপ্লবদের মেইন ক্যাম্পেও যাওয়া যাবে।

সুতরাং সম্পূর্ণ নিরাপদ ও উপযুক্ত এই জায়গাটা এরা বেছে নিয়ে আসন্ন লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। জহুর আলী হুকুম দিল – সলিল, জিতেন, সমর আর নাসের, তোমরা চার জনে মাইনগুলো নিয়ে রেল লাইনের ধারে চলে যাও। ঠিকভাবে পুঁতে দিয়ে চলে এস; খুব সাবধান কিন্তু!

ওরা নীরবে অভিনন্দন জানিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলো খুব সাবধানে গুছিয়ে নিল। তারপর চারজন প্রায় এক হাঁটুর উপর জল ভেঙ্গে রেল লাইনের উপর এসে উঠ্‌ল।

নাসের বলল – নে, চট্‌পট কাজ সেরে ফেলি।

জিতেন বলল – একটু আড়াল করে দাঁড়া মাইরি, আগে একটা বিড়ি খেয়ে নি – পেট যেন ফুলে উঠেছে।

সলিল রাগত ভাবে বলল – তোকে এই জন্যেই গাল দিতে ইচ্ছে করে; কাজের সময় এসব ফ্যাঁকড়া খুব খারাপ কিন্তু!

তখন সমর বলল – দুত্তোরি। একটা বিড়ি খাবে তার জন্যে এত কথা কিসের? নে, তাড়াতাড়ি ধরিয়ে নে – আমরা আড়াল করে দাঁড়াচ্ছি; যদি মরেই যাস্ – কেন প্রাণের সাধটা থেকে যায়!

ওরা খুব সন্তর্পণে নিখুঁতভাবে কাজ সেরে আস্তে আস্তে জল ভেঙ্গে আবার ফিরে এল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিপ্লব বলল – এখনও প্রায় এক ঘণ্টা দেরী। সুতরাং আমাদের ঠিকভাবে তৈরি হয়ে নিতে হবে। জহুর ভাই, আপনি তা হলে পঞ্চাশ জনকে নিয়ে ওপারে গিয়ে ঠিক ঠিক প্লেস্ 'চয়েস' করে সকলকে পজিশন নেবার জন্যে বলে দিন। আমি এপারে বাকী পঞ্চাশ জনকে নিয়ে তৈরী হচ্ছি। তারপর মুচকি হেসে আবার বলল – আপনার খবর অনুযায়ী ওরা যদি আসে – তবে একটা জবরদস্ত লড়াই হবে, কি বলেন?

ক্যাপ্টেন জহুর আলী সহাস্যে জবাব দিল, কি জানি, সাঙাতরা কি করবে – আসবে না ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে!

খুব বড় রকমের আক্রমণের সময়ই জহুর আলী ও বিপ্লব নেতৃত্ব দেয়। অন্যথায় জহুর আলী নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করে দেয় – আর পান বিড়ি ফিরি করে, অর্থাৎ সাঙ্কেতিক ভাষায় পাঠানো পাক সামরিক গোপন খবরগুলো সংগ্রহ করে। বিপ্লব অফিসের কাজে বিশেষ করে সরবরাহ আর সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত থাকে। দায়িত্বশীল লোক এখনও এদের খুব কম। তাই একজনকেই বেশ কয়েকটা কাজের ঝামেলা সামলাতে হয়।

এপারে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বিপ্লব অতি নিপুণভাবে ব্যূহ সাজিয়েছে। আর ওপারে অর্থাৎ পশ্চিম দিকের অধিনায়ক জহুর আলী একজন পাকা ক্যাপ্টেন। দু'ধার থেকেই যুগপৎ আক্রমণ করা হবে এবং শত্রু নিধনপর্ব শেষ হলে যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি পাওয়া যাবে নিয়ে সরে পড়বে।

বিপ্লব অস্থির হয়ে বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এগারটা পঁচিশ হয়ে গেল, এখনও ট্রেণের পাত্তা নেই – ব্যাপার কি? ওপারের ওরাও নিশ্চয়ই অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে – দেখতে না পেলেও অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না বিপ্লবের। ঠিক সাড়ে দশটায় ট্রেণখানা এখান দিয়ে পাশ করে যাবার কথা – সে জায়গায় সাড়ে এগারটা বাজল। কিন্তু উপায়ই বা কি! এইভাব অন্ততঃ আরও প্রায় দু'ঘণ্টা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে।

ক্রমে এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ! ঐ তো ইঞ্জিনের আলো দেখা যাচ্ছে! সকলের চোখে মুখে এক আনন্দ ও উত্তেজনার আলোড়ন সৃষ্টি হল। ক্রমশঃ ইঞ্জিনটা এগিয়ে আসছে। এবার আরও স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে। সকলে যেন দম বন্ধ করে প্রস্তুত হয়ে আছে – নির্দ্দেশের অপেক্ষায়।

ক্রমে এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সবাই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ! ঐ তো ইঞ্জিনের আলো দেখা যাচ্ছে! সকলের চোখে মুখে এক আনন্দ ও উত্তেজনার আলোড়ন সৃষ্টি হল। ক্রমশঃ ইঞ্জিনটা এগিয়ে আসছে। এবার আরও স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে। কলে যেন দম বন্ধ করে প্রস্তুত হয়ে আছে – নির্দ্দেশের অপেক্ষায়।

বুম্-বুম্-বুম্ করে একসঙ্গে কয়েকটা মাইন বিস্ফোরণের শব্দে চারি দিক কাঁপিয়ে তুলল। রেলের ভারী ইঞ্জিনটা পশ্চিম ধারে কাত হয়ে পড়ল। ঝন্ ঝন্ শব্দে ইঞ্জিন সংলগ্ন তিনটি খালি ওয়াগন লাইন চ্যুত হ'ল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীর বাকী বগীগুলো থেমে গেল। বগীর ভিতরে যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল তাদের অবস্থাও সঙ্গীন! প্রবল ধাক্কা খেয়ে কারুর মাথা ফাটল, কেউ ছিটকে পড়ে হাত পা ভাঙল! যারা সজাগ ছিল – তারা এই অবস্থাটা কোনমতে সামলে নিয়ে তড়িৎ বেগে নেমে পড়ে পাশের বগী থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে গাড়ীর নিচে ঢুকে পড়ে পজিশন নিল।

এদিকে তখন বিপ্লবের নির্দ্দেশে গুলিবর্ষণ সুরু হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজন পাক সেনা ভূমি শয্যা গ্রহণ করল। খুব শিগ্গিরই দু'পক্ষের গুলি বিনিময় আরম্ভ হ'ল।

বুদ্ধিমান জহুর আলী বুঝে নিল ঐ বগী দু'টোতেই ওদের যা কিছু হাতিয়ার আছে। তাই এবার হুকুম দিল – ভবেশ, ইমাম আর সামসুদ্দিন তোমরা এই মাঝখানের বগী দুটো লক্ষ্য করে গ্রেণেড্ চার্জ্জ কর।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে মাঝের বগী দুটোকে তাক্ করে গ্রেণেড্ বর্ষণ হতে লাগল।

এবার পাকফৌজ রীতিমত বেকায়দায় পড়ল। আর তার আগেই এদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। অর্থাৎ প্রায় অধিকাংশ সৈন্যই বগী দুটোর থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি সব বার করে নিয়ে এসে আক্রমণের জন্যে তৈরী হয়ে গেছে!

এদিকে ওদের দেখাদেখি বিপ্লবও অনুরূপ নির্দ্দেশ দিল। সুতরাং দু'ধার থেকে গ্রেনেড বৃষ্টি হবার ফলে দু'টো বগীতে আগুন লেগে গেল। আগুন ক্রমশঃ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। অমাবস্যার রাতের অন্ধকার ঘুচে গিয়ে এবার দিনের আলোর মত সব স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। পাক সৈন্যরা এবার দারুণভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হতাহতও হচ্ছে প্রচুর। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে এবার তারা শেষ কামড় দেবার জন্যে সর্ব্বশক্তি দিয়ে দু'ধারেই নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে লাগল।

এদিকে বিশেষ সুবিধা হচ্ছেনা দেখে জহুর আলী উঠে দাঁড়িয়ে সামনের রাইফেলধারীদের নির্দ্দেশ দিল – সিরাজ! সুলতান! তোমরা সকলকে নিয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ গজ বাঁদিকে সরে গিয়ে পজিশন নিয়ে গুলিবর্ষণ কর।

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটি গুলি এসে জহুরের বুকটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চলে গেল। জহুর আলী 'আল্লা' বলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে গেল।

কিন্তু এখন আর এসব দেখার সময় নয়। তাই ওরা ওদের ক্যাপ্টেনের শেষ নির্দ্দেশ পালন করে বুকে হেঁটে বাঁদিকে সরে এসে বিপুল বিক্রমে গুলি বর্ষণ সুরু করল।

এধারে কি ঘট্‌ছে বিপ্লবরা কিছুই জানতে পারছে না। রাইফেল আর মেসিনগান থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ করে যাচ্ছে। কিন্তু পাক সৈন্যরা গাড়ীর নিচে পজিসন নেবার দরুণ ওদের পক্ষ্যে স্থির করে কাজ করা খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। এলোপাথাড়ি ভাবে বেশ কিছু গোলাগুলি বাজে খরচ হল। ফল বিশেষ কিছুই হচ্ছে না দেখে বিপ্লব আবার হুকুম দিল–গ্রেনেড্‌ চার্জ কর।

উপর্য্যুপরি কতকগুলো গ্রেনেড্‌ রেল লাইন ও গাড়ীর বগীর উপর এসে পড়ল। পাকিস্তানী সৈন্যরা রীতিমত প্রমাদ গুন্‌ল। আবার বেশ কিছু পাক সৈন্য হতাহত হ'ল।

পাক ফৌজের অধিনায়ক কর্ণেল মুজফ্‌ফর অয়্যারলেসে এই বিপদের খবর অনেক আগেই পাঠিয়েছে – সাহায্যের জন্যে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। দু'পক্ষই গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করছে।

এধারে পশ্চিম দিকের মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা জহুর আলী মারা যাবার পর বেশ দমে গেছে। বিপ্লবদের দিকে কি ঘটেছে না ঘটেছে এরা তার কিছুই জানতে পারছিল না। তারপর আরও দু'জন গুরুতর আহত হ'ল। জহুর আলী মারা যাবার পর ইলিয়াস এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সে এবার অবস্থা সুবিধার নয় দেখে মৃত জহুর আলীকে ও আহত দু'জনকে তুলে নিয়ে সবাইকে পিছু হটে পালাবার নির্দ্দেশ দিল। কেবল ইলিয়াস ও সৌমেন দুটো মেসিনগান নিয়ে গুলিবর্ষণ করে যেতে লাগল – পাক আক্রমণকে ঠেকিয়ে রেখে দলের সবাইকে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবার সুবিধা করে দেবার জন্যে।

বিপ্লবদের ওধার থেকে যখন গ্রেনেড্‌ চার্জ হ'ল, এরা তা বুঝতে পারল – তখন এরাও যদি এধার থেকে গ্রেনেড্‌ চার্জ করতে পারত তাহলে অবস্থা খুবই আয়ত্বে আসত। কিন্তু এখন আর তার কোন উপায় নাই। সবাইকে পালিয়ে যাবার নির্দ্দেশ দেওয়ায় তারা এখন অনেক দূরে চলে গেছে।

রাতের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে চার পাঁচটা স্যাবার জেটকে দূর থেকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ব্যাপারটা ইলিয়াসের আর বুঝতে বাকী রইল না। সে তৎক্ষণাৎ গুলিবর্ষণ বন্ধ করে দিয়ে সৌমেনকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সরে পড়ল।

ব্যাপারটা বিপ্লবেরও বুঝতে বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি। সেও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের সবাইকে পিছু হটে পালিয়ে যাবার নির্দ্দেশ দিল। কিন্তু পাক সৈন্যরা বুঝতে পেরেছে – তাই তারা এবার গাড়ীর নিচের থেকে বেরিয়ে এসে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বসল। বিপ্লব বিপদের পরিমাণ বুঝতে পেরে অস্থির হয়ে উঠল। সে আরও তিন জনকে নিয়ে খানিকটা এগিয়ে এল। এবার চার জনের চারটে মেসিনগান এক সঙ্গে গর্জে উঠল। সবাই তখন পিছন হটে দ্রুতগতিতে পালাতে আরম্ভ করেছে। চারটে মেসিনগান এক সঙ্গে নব্বুই ডিগ্রি এ্যাঙ্গেল করে সমানে অগ্নিবর্ষণ করে চলেছে।

ইত্যবসরে সঙ্গীরা অনেক দূর চলে যেতে পেরেছে। পাকফৌজ আবার গাড়ীর নিচে আশ্রয় নিয়েছে। এ দিকে স্যাবারজেটগুলো একেবারে মাথায় উপরে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে। পাক্‌বাহিনী সিগন্যাল দেখিয়ে নিশানা দিচ্ছে।

হঠাৎ একি সর্বনাশ! সমস্ত গুলি ফুরিয়ে গেছে। আর কিছু ভাববার সময় নেই। বিপ্লব ওদের তিনজনকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার নির্দ্দেশ দিল। ওরা তিনজন তখন মেসিনগান ফেলে রেখেই পিছন ফিরে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছে। বিপ্লব এল, এম, জিটা কাঁধে তুলে দৌড়বার উপক্রম করতেই হঠাৎ একটা গুলি এসে ওর দাবনার নিচে দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। ওরা তিনজন তখন বেশ কিছুটা দূরে দূরে। এসব কিছু দেখবার বা জানবার অবকাশ এদের ছিল না।

আঠার

গঞ্জের বড় ইস্কুল বাড়ীটা দখল করে পাক মিলিটারী ব্যারাক হয়েছে। একজন কর্ণেল শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে এসে সামনের দোকানগুলোর দিকে পা বাড়াল। রহমত পালিশওয়ালাকে সামনে দেখতে পেয়ে পায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করল। রহমত থপ্ করে ধুলোর উপর বসে পড়ে গদ গদ ভাবে তার জুতোর ধুলো ঝেড়ে দিতে পাগল। এমন সময় একজন ক্যাপ্টেন সে দিকে আসতেই ওদের দু'জনার মধ্যে কিছু কিছু কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে ইংরাজীতে বলতে লাগল সেদিনের রাতের লাইনধারের হামলার খবর। একশো একাত্তর জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে। দু'শো পঁচিশজন আহত হয়েছে – তার মধ্যে নব্বুই জনের অবস্থা খুবই সাংঘাতিক। সম্ভবতঃ বাঁচবে না। বিপ্লব নামে একজন প্রথম শ্রেণীর গেরিলা নায়ককে তারা গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। আর পেয়েছে তাদের পরিত্যক্ত কয়েকটা মেসিনগান। বিপ্লবকে বন্দী করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই সব গেরিলা আক্রমণের জন্যে পাক সৈন্যরা খুবই ভয় পেয়েছে – তাদের মনের জোর একেবারে ভেঙে পড়েছে। বেশ যেন ঘাব্ড়ে গেছে কিছু অফিসারও।

অনার্সের ছাত্র পালিশওয়ালা রহমত উৎকর্ণ হয়ে এদের ইংরাজী কথাবার্ত্তাগুলো শুনছিল। একটা গোটা সিগারেট মজুরী পেয়ে সেটা কানে গুঁজে নিয়ে ধীরে ধীরে গঞ্জের শেষ প্রান্তে নিজের কুঁড়েতে এসে সে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

আজ মহেশপুর ক্যাম্পে সকাল হয়েছে করুণ কান্নার মধ্যে দিয়ে। আহত আমানুল্লা ভোররাত্রে মারা গেছে। আপ্রাণ চেষ্টা-অসীম স্নেহ, আর নিখুঁত সেবা যত্ন করেও ওকে বাঁচানো গেল না। রক্ত পড়া বন্ধ করতে পরা যায় নি। এখানে উপযুক্ত ওষুধ ও ডাক্তারের যথেষ্ট অভাব তবু লায়লা চেষ্টা করেছিল গঞ্জের থেকে যতটা সম্ভব ওষুধ আনিয়ে আর গঞ্জেরই একজন কোয়াক ডাক্তারের সাহায্যে ওকে সুস্থ করে তোলার। কিন্তু ভোর রাত্রে লায়লার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে – তার অসীম স্নেহের নাগপাশ ছিন্ন করে সে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে। ক্যাম্পের সকলেই শোকাচ্ছন্ন। সকলের ছোট বলে এই ছেলেটাকে সবাই স্নেহের চোখে দেখত। তাই কারুর মুখেই কোন সান্ত্বনার বাণী নেই। সবাই গভীর শোকের বোবা কান্নায় স্তব্ধ।

বেলা ক্রমশঃ গড়িয়ে যাচ্ছে। কারুর কোন কাজেই যেন গা নেই। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন নিজেও মনে বেশ আঘাত পেয়েছে ছেলাটার মৃত্যুতে। এই দুধের ছেলেটা কি নিদারুণ প্রেরণা আর দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক রকম জোর করেই যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের সুখী আদুরে ছেলে। ইস্কুলে ক্লাস সেভেন এ পড়ত। বাপ মায়ের নিষেধ অমান্য করে ইস্কুলে আসার পথে সোজা চার মাইল পথ হেঁটে চলে এসেছিল এদের ক্যাম্পে। খবর পেয়ে বুড়ো বাবা একদিন লুকিয়ে এখানে এসেছিল দেখা করতে। ছেলেটার মুখে সর্ব্বদাই অফুরন্ত হাসির জোয়ার। হাসি মুখের আব্বাকে বলেছিল – তুমি কিছু চিন্তা কোর না, আমি এখানে খাসা আছি।

বৃদ্ধ পিতা সজল চোখে মহিউদ্দিনের হাত দুটো ধরে বলেছিল – 'বাপজান', ও যখন এই-ই চায় – তখন আমি আর কি করব! দেশের কাজে তোমার হাতেই ওকে তুলে দিলাম। আজ থেকে তুমি ওর 'অভিভাবক।'

মহিউদ্দিনের নিজেরও কোন কাজে মন বসছিল না। কিন্তু এ পথ বড় নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীনের পথ। এ পথে মৃত ভাইকে কাপড় ঢাকা দিয়ে রেখেও রাইফেল নিয়ে যে ছুট্তে হবে শত্রুর মোকাবিলা করতে। এ পথে শোক আর স্নেহ প্রকাশের অবকাশ নেই।

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন নির্দ্দেশ দিয়েছে, যথাযোগ্য সামরিক মর্য্যাদায় একে সমাহিত করার জন্যে। সবাই তারই আয়োজন করছে মলিন মুখে। ওদের চোখের জল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে – এখানে কাঁদা চলবে না। তবু জোর করে বাগমানানো অন্তরটা বারংবার খান খান হয়ে সব কিছু ছাপিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে দুর্দ্দমনীয় অশ্রু।

বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে – এমন সময় নীলু ধীরে ধীরে এসে উপস্থিত হ'ল। একটু বসে হাঁফ ছেড়ে এক গ্লাস খাবার জল চাইল। জল খেয়ে আস্তে আস্তে রহমতের কাছে শোনা হত পরশু রাতের লাইন ধারের ঘটনা সব জানাল। আরও বলল – আজ রাত্রে গঞ্জের মিলিটারী ব্যারাক আক্রমণ করার নির্দ্দেশ আছে। পাশাপাশি পাঁচটা ক্যাম্পের সমবেত শক্তি রাত দশটায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সঙ্গে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে আক্রমণ করে পাক মিলিটারী ব্যারাক সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতেই হবে। আর কোনও রকম গড়িমসি নয় – একেবারে মরিয়া হয়ে আমাদের কাজে নামতে হবে। খবর পাওয়া গেছে ব্যারাকের অফিসার ও সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। সুতরাং এই সুযোগে ওদের মেরে একেবারে শেষ করে দিতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে একটার পর একটা ঘাঁটি দখল করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং ঠিক সন্ধ্যার পরই মহিউদ্দিনকে সদলে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ে গঞ্জের উত্তর ধারের বাগানে অপেক্ষা করতে হবে। সেখানেই তাদের আরও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারে নির্দ্দেশ দেওয়া হবে। একদল রাত ঠিক সাড়ে ন'টায় সমস্ত টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দেবে।

খবর দিয়ে নীলু চলে গেল। লায়লা যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল। তার অন্তঃকরণে সেই ছোট্ট ছেলেটার হাসিমাখা মুখটা বারংবার উঁকি ঝুঁকি দিয়ে কেবলই বলছিল – দিদি আমি কবে সেরে উঠব? কিন্তু সারল না – তার সেই সোনার চাঁদ ছোট্ট ভাইটা ও জীবনের মত চলে গেল। আর কোন দিনই তার মাথায় লায়লা হাত বুলোতে পাবে না, আদর করতে পাবে না-শুশ্রূষা করতে পাবে না। লায়লা শত চেষ্টা করেও কয়েকঘন্টার পরিচিত সেই ছোট্ট ভাইটির শোক দমন করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কিন্তু কাঁদা তার চল্‌বে না। তাই সে সহসা কান্না থামিয়ে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার ভাঙা অন্তঃকরণটা আজ যেন কিছুতেই জোর মানছিল না। মনের পর্দ্দায় সেই ছেলেটার মৃতদেহটার ফাঁকে ফাঁকে নীলুর কথাগুলো ছিটে ফোঁটা তার কানে জোর করেই ঢুক্‌ছিল। তাই সংঘাতপূর্ণ অবিন্যস্ত অন্তরে নীলুর বলা – "আহত বিপ্লব বন্দী হয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টে" – এই কথাগুলো বারংবার ঘা মারছিল। লায়লা যেন সেই আঘাত আর সহ্য করতে পারছিল না। তাই সে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে নীলু চলে যাবার পরই তার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সবাই কি হ'ল – কি হ'ল, বলে ছুটে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে বাতাস করতে লাগল। একটু পরে ধরাধরি করে ঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। দুলু ভাল করে জল ঢেলে ওর মাথাটা ধুয়ে দিল – তারপর চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর লায়লা একটু সুস্থ হয়ে উঠল। দুলুর দিকে তাকিয়ে একটু খাবার জল চাইল। কাসেম ছুটে গিয়ে একগ্লাস জল এনে দিল। দুলু যত্নের সঙ্গে একটু একটু করে লায়লার মুখে জল ঢেলে দিল। মহিউদ্দিন নিজে এক গ্লাস গরম দুধ যোগাড় করে নিয়ে এসে দুলুর হাতে দিল এবং ধীরে ধীরে লায়লাকে খাইয়ে দেবার জন্যে বলল।

গরম দুধটা খেয়ে লায়লা বেশ সুস্থ হয়ে উঠে বসল, তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে সলজ্জভাবে বলল, তোমরা এখন যাও ভাই – আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দাও।

কেবল দুলু লায়লার কাছে দুপ করে বসে রইল। বাকী সবাই তখন আমানুল্লাকে নিয়ে গেল কবর দেবার জন্যে। কারণ, সময় তাদের হাতে বড়ই অল্প। ফিরে এসে সন্ধ্যার পরই তাদের সবাইকে বেরোতে হবে রাত্রের অভিযানে – গঞ্জের মিলিটারী ব্যারাক আক্রমণ করতে।

উনিশ

লায়লা ঘরের ভিতর থেকে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। পড়ন্ত রোদের মদির অবসন্নতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তার মনেও তখন ক্লান্তিকর চিন্তার সমাবেশ! দুলু মুক্তি আন্দোলনের একটা বুলেটিন নিয়ে মন দিয়ে পড়ছে। লায়লা দাওয়ার উপর ঠেসান দিয়ে বসে পড়ল।

বিপ্লব – তার জীবনের যতকিছু ধ্যান ধারণার পটভূমি, বিপ্লব আজ পাক পশুদের হাতে বন্দী! মাত্র বার তের মাইল দূরে বিপ্লব ছিল, অথচ সে তার কিছুই জানতো না। যদিই বা জানতে পারত – তাহলে সে কি বিপ্লবের সঙ্গে দেখা করতে যেত? না – তা পারত? না – লায়লা তার পারত না। আবার পর মুহূর্ত্তেই ভাবে – না হয় একবার শুধু দূর থেকে চোখের দেখাই দেখে আসতাম! বিপ্লবকে একবার দেখবার জন্যে কতদিন থেকে তার মনটা যে ছট্‌ফট্‌ করছে।

প্রতিজ্ঞাপালন করতে গিয়ে – প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে সে জলন্ত আগুনে বিনা দ্বিধায় লাফিয়ে পড়েছিল। ফলে প্রতিজ্ঞা সে পালন করেছে ঠিকই – কিন্তু তার দেহের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে দলদলে ঘা হয়ে গেছে। এ ঘা এ জীবনের মত যে আর সারবার নয়।

কিন্তু তাতে ক্ষতিই বা কি? মনে তো তার বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগেনি! তবে এই তুচ্ছ দেহটার পবিত্রতা নিয়ে অনর্থক ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে কেন? মনই তো সব। তার এ মন তো আর বদলায় নাই! আর বিপ্লব তো চিরকালই তার; আমরণ তারই।

লায়লার চিন্তা আবার অন্য দিকে মোড় নিল। বিপ্লব ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী। আহা বেচারা! পাক জানোয়ারগুলো তার উপর না জানি কত নির্যাতনই করছে! সে কি সহ্য করতে পারবে ঐ সব নৃসংস নির্যাতন? ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের নিষ্ঠুর নির্যাতন ও পৈশাচিক অত্যাচারের ভয়ংকর ছবি তার মনে পড়তেই ক্ষোভে, আতঙ্কে ও ঘৃণায় তার মনের মধ্যে এক অসহ্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ল। সে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল; দাঁতে দাঁত চেপে ধরে পায়চারি করতে লাগল।

হ্যাঁ, তাকে যেতে হবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে – সেই ভয়ঙ্কর নরকে তাকে যেতেই হবে; যে কোন মূল্যে, যে কোন উপায়ে – বিপ্লবকে ঐ পাক নরপিশাচদের কবল হতে মুক্ত করে আনতে।

তখনই আবার ভাবে – কিন্তু বিপ্লব কি এখনও ওদের অত্যাচার সহ্য করে বেঁচে আছে? নিশ্চয়ই আছে! তার মন বলছে বিপ্লব বেঁচে আছে। কারণ, পাক পশুরা যতবড় হৃদয়হীন অত্যাচারীই হোক – তারা একেবারে নির্ব্বোধ নয়। তারা জানে একজন প্রথম শ্রেণীর গেরিলা নেতাকে জীবন্ত বন্দী করে রাখার প্রয়োজন ও মূল্য অনেক।

কিন্তু! ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আবার সে যাবে? যে নরক থেকে কেউ কোন দিন মুক্তির আশাই করে না; আর যদি কেউ দৈবক্রমে মুক্তি পায়ই – তবে আর সেখানে যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কিন্তু তার আর যেন কোন উপায়ই নাই। এ কাজের দায়িত্ব আর কারুর উপর ছেড়ে দিয়ে সে স্বস্তি পাবে না। তা হলে সে দম আটকে মারা যাবে যে – সুতরাং তাকে যেতেই হবে।

দিনের আলো ফুরিয়ে এল। পশ্চিমের রক্ত রাগ ধীরে ধীরে আঁধারের কোলে মুখ লুকোল। যেন কার হাতছানিতে সন্ধ্যা এগিয়ে এল তার গাঢ় অন্ধকার বসন পরিধান করে।

হ্যারিকেনগুলো জ্বেলে ফকির ঠিক ঠিক জায়গায় সেগুলো রেখে এল। এরা আর দেরী না করে যে যার তৈরি হয়ে বেড়িয়ে পড়ল গঞ্জের উত্তর দিকের বাগানের উদ্দেশ্যে। কেবল দুলু, ফকির আর লায়লা ক্যাম্পে রইল। অলকের খুব জ্বর – সে যেন ধুঁকছে। লায়লা এসে অলকের মাথার কাছে বসল।

ক্রমশঃ রাত বাড়তে লাগল। কেরোসিন তেল এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। যা একটু পাওয়া যায় তাও আবার খারাপ। হ্যারিকেনের পলতেগুলো দিয়ে ক্রমাগত কালো ধোঁয়া উঠে উঠে কাঁচগুলো ভুষোকালির আস্তরণে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। কিছুই ভাল মত দেখা যাচ্ছে না। লায়লার একবার ইচ্ছে হল হ্যারিকেন গুলোকে নিবিয়ে দেয়। কিন্তু ক্যাম্পের তা নিয়ম নয়। সারারাত ধরে ঐ আলো জ্বলবে। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঘোমটা ঢাকা হ্যারিকেনগুলো দেখে লায়লার আবার বড় হাসি পেল।

দুলু আর ফকির পশ্চিম দিকের চালাঘরের দাওয়ায় বসে বসে ঢুলছে। তাদের সামনে চালের বাতার সঙ্গে ঝোলানো একটা মসীকৃষ্ণ হ্যারিকেনও যেন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢুলছে। একটু পরেই হয়তো পরিপূর্ণ অন্ধকারের গহ্বরে ঘুমিয়ে পড়বে।

যেমন দূরে থেকে ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, ঠিক তেমনিই ইচ্ছে করলেও তারাও পাঁচ হাত দূরের কোন কিছু দেখতে পাবে না।

উঃ! অলকের গা-টা কি গরম! এ ও হয়তো বাঁচবে না। নাঃ! ও কিছুতেই বাঁচতে পারে না – । এমন সোনার চাঁদ ছেলে বাঁচবে কেন? ও যদি খারাপ হ'ত, দেশদ্রোহী হ'ত, তাহলে বাঁচত। আমানুল্লাও চলে গেল – অলকও চলে যাবে। তারপর-? আর কে থাকবে? কেউ বেঁচে থাকবে না, কিছুই বাকী থাকবে না। আচ্ছা এতক্ষণ তো আমানুল্লাকে মাটি দেওয়া সারা। আমানুল্লা এখন কি করছে? মানুষ মরে গেলে – তারপর কি হয়? কি আবার হয়? মরে গেলেই ফুরিয়ে গেল। কিন্তু মানুষ যে বলে মরে গেলেও তার আত্মাটা নষ্ট হয় না-তবে? আমানুল্লার আত্মাটা নিশ্চয়ই এখনও বেঁচে রয়েছে এবং কোথাও না কোথাও রয়েছে। আচ্ছা এমন কি কোন বই আছে – যাতে বেশ পরিষ্কার করে বলে দেওয়া আছে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার আত্মাটা আবার জন্মগ্রহণ করবে না। অন্ততঃ কিছুদিন সে আকাশে বাতাসে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তাই যদি সত্যি সত্যি হয় – তা'হলে তার আত্মাটা এখন কোথায়? সে কি আমায় দেখতে পাচ্ছে? যদি পায়-তা হলে ও নিশ্চয়ই আমায় খুব ভাল বাসবে। কারণ, আমি যে তাকে ভালবাসি – আমানুল্লা বড় ভাল ছেলে। ঐ রকম আমার যদি একটা ছেলে হয়? খুব ভাল হয়।

এই সব হাবি জাবি ভাবতে ভাবতে লায়লার মনে পড়ে গেল তার পেটেও রয়েছে একটা বাচ্চা – সে কেমন হবে কে জানে! তা বললে তো হবে না – ভাল না হলে চল্‌বে না; আমার বাচ্চা ভাল হতেই হবে। কিন্তু লোকে যে বলে – মা বাবা ভাল না হলে, ছেলেও ভাল হয় না। তা যদি সত্যি হয় তা হলে তার পেটের বাচ্চাটা কেমন হবে তা বলা মুস্কিল। কারণ, ওর বাবাটা যে কে তার কোন ঠিক ঠিকানাই তো নাই!

দুত্তোরি! তা ওসব মনে করার দরকারই বা কি? এসব হাবর হাটি না ভাবাই ভাল। ভেবে কি লাভ? এ পৃথিবীটা বড্ড নোংরা। যে সব প্রিয়জন ছিল তারা চলে গেল-কত প্রিয় জন এলো, তারাও হারিয়ে গেল। আমানুল্লা – আহা! কি সুন্দর ছেলেটা –! এমন সুন্দর ছেলে কেন মরল? এখন সব থেকে ভাল হয় – আমি যদি মরে যাই, বিপ্লবও যদি মরে যায়। আমানুল্লা, আমি, বিপ্লব – তিনজনায় মিলে বেহেস্তে গিয়ে কেমন মেলা মেশা করে থাকব। কেমন সুন্দর হবে!

আমার সোনার চাঁদ বিপ্লবের শরীরে গুলিটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে – তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রেখেছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে! তার উপর কত অত্যাচারই না করছে! যেমনি করেছিল আঙ্গুরের উপর, যেমনি করেছিল সেই বৌটার উপর, যেমনি করেছিল হাজার হাজার মা-ভাই বোনদের উপর।

বেহেস্ত আনন্দের জায়গা! সেখানে খালি সুখ আর সুখ – ভালবাসা আর ভালবাসা, প্রেম আর প্রেম!

লায়লা যখন এই সমস্ত ভাবছিল – তখন যেন কোন দূর দূরান্ত থেকে একটা শেল ফাটার শব্দ ভেসে এল। ওর চিন্তাজাল সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ও আপন মনে বলে উঠল – দুৎ-তারি! এ কি সব ভাবছি! এর কোন মানে হয়?

আমার উপর এখন অনেক দায়িত্ব! আমানুল্লা মরে গেছে তো কি হয়েছে? আবার নতুন আমানুল্লা খুঁজে বার করতে হবে – বিপ্লবকে মুক্ত করে আনতে হবে। এমন সময় অলক প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে লায়লার গায়ে একখানা হাত তুলে দিয়ে বলল – দিদি! তুমি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও না! অলকের এই কথায় লায়লা নিজের মন থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অলকের শুশ্রূষায় মেতে উঠল।

কিন্তু যে মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছে – নিজের দেহ মন ও প্রাণকে লুঠেরারা লুঠ করে নিয়েছে; তার বিচার বুদ্ধি এবং বিবেক যে টিকে থাকবেই এ নিয়ম তো এ পৃথিবীতে নাই! তাই লায়লা অলকের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কথাটা মনে পড়ে যেতেই যেন পাগল হয়ে গেল।

সেই ঢাকা – যে ঢাকায় অত্যাচার, অনাচার, বীভৎসতা, পাগলামি, নোংরামী সবকিছু মিলে মিশে আকাশ বাতাস মাটি পচিয়ে তুলেছে – সেখানে বিপ্লবকে বন্দী করে রেখেছে? অসম্ভব! বিপ্লবকে আমায় উদ্ধার করতেই হবে। তা যদি নাই পারি তাহলে আমার এ জীবনের কোন দামই নাই! আজ পর্য্যন্ত যা কিছু করেছি না করেছি সবই বৃথা হয়ে যাবে যে!

তাছাড়া আমি কি নিয়েই বা বাঁচব? আমানুল্লা চলে গেছে – বিপ্লবও যেতে বসেছে। যা গেছে তা গেছে – যা যায় নাই, তাকে আর যেতে দিলে চলবে না। কিন্তু আমি ঢাকায় গিয়ে যদি দেখে বিপ্লব মরে গেছে? তা হলে?

বিপ্লবই আমার সব; আমার যা কিছু সব বিপ্লবকে নিয়েই। এই বলেই সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ছোট একটা চিরকুটে লিখল –

“আমার মুক্তি পাগল ভাইয়েরা! তোমাদের সকলের প্রতি রইল আমার অসীম শ্রদ্ধা আর আন্তরিক স্নেহ। তোমাদের নিষ্ঠাই তোমাদের জয়ী করবে। আজ ঘটনার সংঘাতে তোমাদের কাছে থেকে লুকিয়ে বিদায় নিচ্ছি। তোমরা আমাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা না করলেই আমি সবচেয়ে বেশী সুখী হব ও শান্তি পাব।”

চিরকুটটা অফিস ঘরের মেঝেয় বিছানো চাটাইয়ের উপর রেখে তার উপর কালিপড়া হ্যারিকেনটা চাপা দিয়ে লায়লা আস্তে আস্তে নেমে উত্তর পশ্চিম দিকের রাস্তাটা ধরে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

*****সমাপ্ত*****